১০ জানুয়ারি ১৯৯০ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ সাত টাকা

আনন্দমেলা

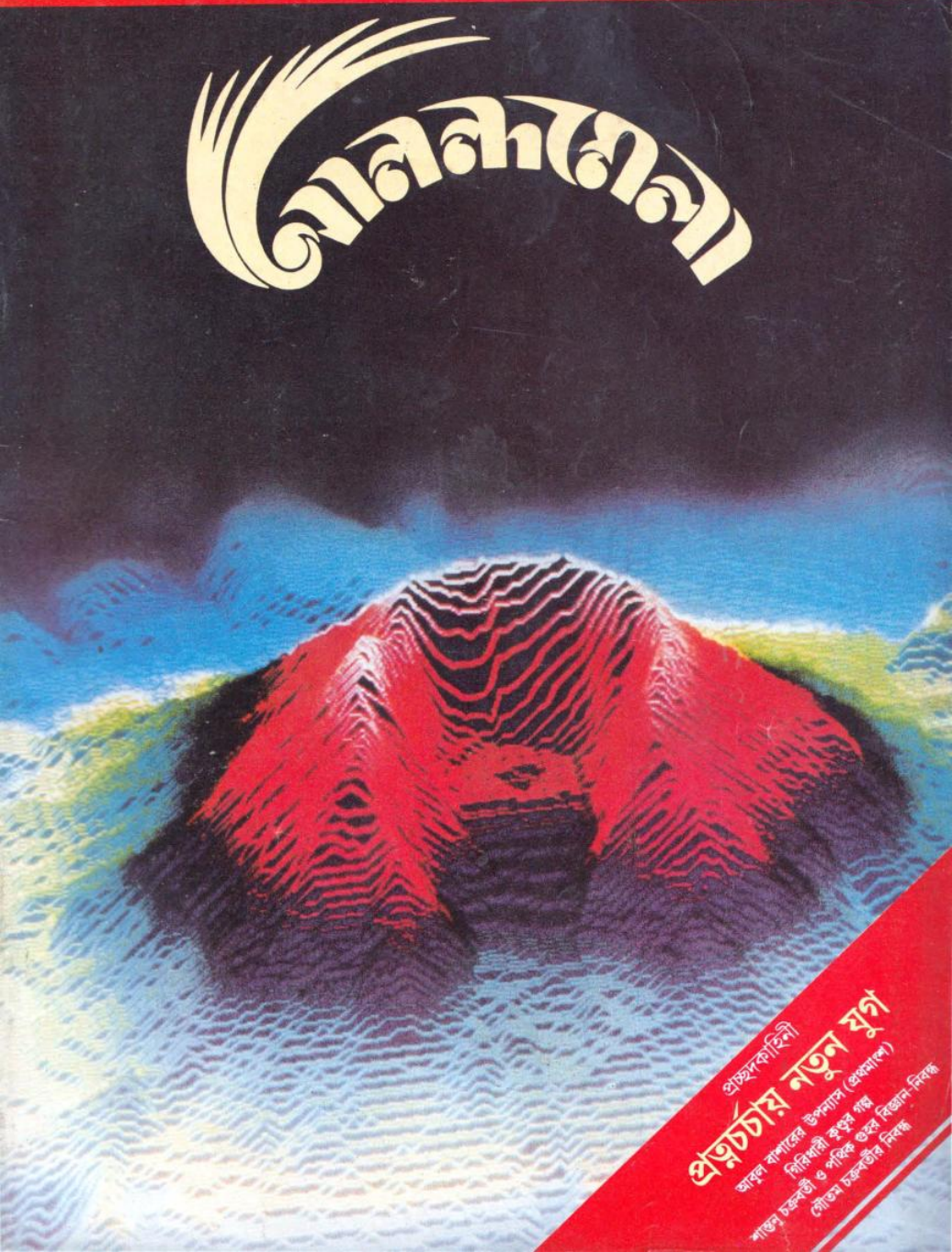

প্রচ্ছদকাহিনী

প্রত্নচর্চায় নতুন যুগ

আবুল বাশারের উপন্যাস (প্রথমাংশ)

গিরিধারী কুণ্ডুর গল্প

শান্তনু চক্রবর্তী ও পথিক গুহর বিজ্ঞান-নিবন্ধ

গৌতম চক্রবর্তীর নিবন্ধ

জীবনের নানা ওঠাপড়া যেন সহজে গায়ে না লাগে...

তাই হাত বাড়ালেই বোরোলীন

সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম

শুষ্ক ত্বক ও সাধারণ কাটাছড়ায় অসাধারণ কাজ দেয়

ষাট বছর আগে প্রথম আজও প্রথম

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস
কলকাতা ৭০০০৫৩

বোরোলীন প্রসাধন সামগ্রী নয়

Response 1035

এক বৎসর

২৬ সংখ্যার জন্য ১৮২ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ১৫৫ টাকা

দুই বৎসর

৫২ সংখ্যার জন্য ৩৬৪ টাকার বদলে
এখন দিতে হবে মাত্র ৩০০ টাকা

বিদেশের গ্রাহক

বার্ষিক ২৬ সংখ্যার জন্য
৩৯ ডলার অথবা ২১ পাউন্ড

আপনি যদি গ্রাহক হতে চান তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার নাম ও
সম্পূর্ণ ঠিকানা অবিলম্বে আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের
অনুকূলে চেক অথবা ড্রাফট সহ নীচের ঠিকানায় পাঠান :

সারকুলেশন ম্যানেজার (ইউ)
আনন্দ বাজার পত্রিকা লিঃ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলিকাতা-৭০০ ০০১

কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রযোজ্য নয়

CLARION C-ABAMD-1

Disproportionate
Returns for
SMALL
INVESTMENTS
&
What more &
Old age Pension too.

INVEST in your CHILD'S STUDIES.

In doing so:

1) You have done your duty to your child.
2) You have assured him good future too.
3) You have insured your future too.

What steps You have to take?

ADMISSION TO TURNING POINT SCHOOL

Can be a TURNING POINT in the life of your child.

* **An Exclusively English Medium Boarding School**

Admission open from Class I to VII.
One class will be added each year till Class X.
(CBSE syllabus)
It is a SCHOOL Sponsored & run by

LINKMAN INSTITUTE

52/B Rash Behari Ave Jn.
(Lane opp. Gurudwara)
Calcutta 700 026
Mon-Sat: 6 am—8 pm. Sun: 12 noon—6 pm

Enquiries: Phone: 46-5137.

* The School is within greater Calcutta.

সূচীপত্র ২৫ পৌষ ১৩৯৬ □ ১০ জানুয়ারি ১৯৯০ □ ১৫ বর্ষ ১৯ সংখ্যা

আনন্দমেলা

সম্পূর্ণ উপন্যাস (প্রথমাংশ)
হালুম হলেই বাঘ হয় না আবুল বাশার ৭০
গল্প
বুদ্ধিমান ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য ৩২
ঘুম পাহাড়ে ধুম গিরিধারী কুণ্ডু ৬১
প্রচ্ছদকাহিনী
প্রত্নচর্চায় নতুন যুগ শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায় ১৪
ধারাবাহিক উপন্যাস
উদাসী রাজকুমার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৯
সোনার গণপতি হিরের চোখ ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৯১
বিশ্ববিচিত্রা
কেম্যান ওয়ালের আশ্চর্য জগৎ জয় সেনগুপ্ত ১২
কমিকস
টারজান ৩১, রোভার্সের রয় ৩৯, গাবলু ৬৯, টিনটিন ৮৭, ব্যাটম্যান ৮৯
কবিতা
এসে গেল নতুন বছর আনন্দ বাগচী ৭
বিজ্ঞানবিচিত্রা
বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে অনুসন্ধানী ১১
কোথায় খুঁজে পাই শান্তনু চক্রবর্তী ১৭
বিজ্ঞান : নব্বইয়ের দশকে পথিক গুহ ২৫
বিশেষ নিবন্ধ
আশার দশক নব্বই গৌতম চক্রবর্তী ১৯
বিদ্যালয়-পরিচিতি
কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় নীরদ রায় ৮৪
কেরিয়ার গাইড
মাউন্টেনিয়ার হতে হলে অমর দাশ ৫৫
অ্যাডভেঞ্চার
পাহাড়ে চড়ার মূল কথা সাহস তনুকা ভৌমিক ৫৮
ভ্রমণ
মেঘ-বৃষ্টির শহর পেরিয়ে সুজাতা পাখী সরকার ৫২
খেলাধুলো
কারা হবেন নব্বইয়ের সেরা সন্দীপ বসু ৪১
লিলি যাঁর ঈশ্বর মানস চক্রবর্তী ৪২
ফাস্ট বোলার তৈরির কারখানা সমীর চৌধুরী ৪৩
গ্যালারি থেকে ৪৪
ওয়াকার ইউনুসকে বলা হচ্ছে··· অনুপ সেন ৪৫
মাঝমাঠের লড়াই গৌতম সরকার ৪৬
খেলার খবর আশিস উপাধ্যায় ৪৭, শচীন তেন্ডুলকর ৪৯
নিয়মিত বিভাগ
চিঠিচাপাটি ৬, কুইজ ৮, হাতে-কলমে ৩৬, চেনা না-চেনা ৩৮, কিওকুশিন ক্যারাটের ক্লাস ৪৮, শব্দসন্ধান ৭৩, আকাশে ওড়ার কথা ৭৯, নিজের হাতে বানাও ৮৩, কে প্রথম ৯৪, বাইরের জানালা ৯৫, নানারকম ৯৬, বইয়ের খবর ৯৮

সহকারী সম্পাদক □ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদকীয় বিভাগ □ সিদ্ধেশ্বরনাথ ভার্মা, সাধনা মুখোপাধ্যায়, শ্যামলকান্তি দাশ, রতনতনু ঘাটী, বাদল ঘোষ, বিমলকুমার পাল
শিল্প নির্দেশক □ অমিয় ভট্টাচার্য
সহযোগী □ প্রবীর সেন, দেবাশিস সেনগুপ্ত

৫২

পাহাড়-কাটা কালো রাস্তা বেয়ে গুয়াহাটি থেকে বাসে বা ট্যাক্সিতে ঘণ্টাতিনেকের পথ। দু' ধারে বাঁশবন আর ঘন সবুজের মিছিল। বরাপানি লেকের স্তব্ধ, স্বচ্ছ

১৪

মানুষের অতীত ইতিহাসের অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেন পুরাতাত্ত্বিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকরা। খেয়ালখুশি অনুযায়ী যেখানে-সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করলেই অতীতের পাথুরে প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজটি রীতিমত বিজ্ঞানসম্মত। এবং এই কাজটি করতে গিয়ে পুরাতাত্ত্বিকদের দুর্গম নানা জায়গায় অভিযান চালাতে হয়। আবার আগ্নেয়গিরির লাভা ও ছাইয়ের নীচে, কিংবা গভীর অরণ্যে লুপ্ত সভ্যতার এমন সব নজির ঢাকা পড়ে আছে যে, সেগুলির খোঁজখবর পাওয়া খুবই কঠিন। আশার কথা, বিমান কিংবা উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত বীক্ষণযন্ত্র এই খবরটি দিতে পারবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। অস্থায়ী সম্পাদক অভীক সরকার। দাম সাত টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

জলের পাশে ফুটে আছে বেগুনি রঙের জারুল। গ্রানাইটের বিশাল পাথর ফুঁড়ে নেমে এসেছে ঝিরঝিরে ঝরনা। এসব দেখতে-দেখতেই এসে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শেষের কবিতা'র শহর শিলং। এবারের ভ্রমণ মেঘ-বৃষ্টির এই শহর ছাড়িয়ে।

৪১

খেলাধুলোর জগতে নব্বইয়ের দশকে নিশ্চয় বহু প্রতিভার আগমন ঘটবে। কিন্তু এখন থেকেই যাঁরা যথেষ্ট সম্ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের কথাই লেখা হল একটি নিবন্ধে। এঁদের মধ্যে আছেন শচীন তেন্ডুলকর, সঞ্জয় মঞ্জরেকর, জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি ও আরও কয়েকজন।

১৯

ইতিহাসের পাতায় নব্বইয়ের দশকটি ঘটনাবহুল বলেই চিহ্নিত হবে। কারা এই দশকটিতে সারা বিশ্বের নজর কেড়ে নেবেন, কারা এখনই সবার নজর কেড়ে নিয়েছেন, সে-বিষয়ে প্রকাশিত হল একটি আলোচনা।

৭০

বুড়ো বয়সে সিধু গুন বাঘ হতে চেয়েছিল। দারুণ সব কাণ্ডকারখানা। আবুল বাশারের উপন্যাস 'হালুম হলেই বাঘ হয় না'।

আগামী সংখ্যায়

প্রচ্ছদকাহিনী

বইমেলা

আবুল বাশারের উপন্যাস (শেষাংশ)

হালুম হলেই বাঘ হয় না

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও অনীশ দেবের গল্প

কবিতা রায়ের ভ্রমণ

অপরূপা মাভু

গৌতম ঘোষদস্তিদারের বিদ্যালয়-পরিচিতি

সেন্ট টমাস গার্লস' স্কুল

সৌরমন্ডলের দশম গ্রহটির নাম ভালকান নয়, এক্স

আমি 'আনন্দমেলা'র একজন নিয়মিত পাঠক। ১ নভেম্বর, ১৯৮৯ সংখ্যায় বিমল বসুর অত্যন্ত সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ প্রচ্ছদকাহিনীটি পড়ে নেপচুন ও ভয়েজার-২ সম্বন্ধে অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। তবে যতদূর জানা আছে, রোমক সমুদ্র-দেবতার নামেই গ্রহটির নামকরণ হয়েছে, কিন্তু লেখক বলেছেন নেপচুন হল রোমক সূর্যদেবতার নাম।

কৌশিক ভৌমিক,
শেওড়াফুলি, হুগলি

আনন্দমেলা পড়ে শুধু আনন্দিতই হই না, রোমাঞ্চিতও হই। দেশ-বিদেশের খেলা, খেলোয়াড়, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী, বন ও বন্যপ্রাণী ইত্যাদির খবরই শুধু এতে পাওয়া যায় তা' নয়, মহাকাশেও বিচরণ করে বেড়ায় 'আনন্দমেলা'। তবে ১ নভেম্বর সংখ্যায় বিমল বসুর 'নীল গ্রহ নেপচুন' সবকিছুকেই ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে গেল। আমরা জানি, সৌরমন্ডলে গ্রহের সংখ্যা দশটি। দশম গ্রহটির নাম ভালকান। ১৯৭২ সালে গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়। বিমলবাবুর লেখায় এর উল্লেখ নেই কেন? লেখাটিতে আছে, সূর্যের কেন্দ্রে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২ কোটি ৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত হতে পারে। বলা নেই, এই তাপমাত্রা সেন্টিগ্রেড না ফারেনহাইট। যতদূর জানি, সৌর-কেন্দ্রের তাপমাত্রা প্রায় ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

পুলক সরকার,
জোড়াদিঘি, পশ্চিম দিনাজপুর

আনন্দমেলায় ১ নভেম্বর সংখ্যায় বিমল বসুর 'নীল গ্রহ নেপচুন' পড়ে অনেক তথ্য জানতে পারলাম। কিন্তু লেখক সৌরমন্ডলের বিভিন্ন গ্রহের পরিচয় দিতে গিয়ে তাদের উপগ্রহগুলিকে 'চাঁদ' বলে উল্লেখ করেছেন। একমাত্র পৃথিবীর উপগ্রহটিকেই চাঁদ বলা হয়, অন্যান্য গ্রহের বেলায় শুধু 'উপগ্রহ' লেখাই ঠিক নয় কি?

দেবদ্যুতি বকসি
বাগীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

লেখকের বক্তব্য : রোমক সমুদ্র-দেবতার নামেই নেপচুনের নামকরণ হয়েছে। আমার লেখায় সমুদ্রের জায়গায় সূর্য-এর উল্লেখ অনবধানে ঘটে যাওয়া ভুল। পুলক সরকারের চিঠিতে যে দশম গ্রহের কথা বলা হয়েছে সেটির অস্তিত্ব এখনও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়নি। গ্রহটি প্লুটো থেকে বহু-বহু দূরে এবং আকারেও অনেক ছোট। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'এক্স'(x), 'ভালকান' নয়। ভালকান হল বুধের থেকেও সূর্যের নিকটবর্তী একটি গ্রহ, একসময় যার অস্তিত্ব ছিল বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান, এখন আর সেটি নেই। আলোচ্য নিবন্ধে এসব নিয়ে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলে মনে করিনি। সূর্যের কেন্দ্রীয় তাপমাত্রা হবে ২ কোটি ৭০ লক্ষ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এই তাপমাত্রা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তৃতীয় চিঠির উত্তরে জানাই, যে-কোনও প্রাকৃতিক উপগ্রহকেই 'চাঁদ' বলা হয়ে থাকে। পৃথিবীর উপগ্রহই একমাত্র চাঁদ নয়। বৃহস্পতি, শনি, নেপচুনের নতুন নতুন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্যাদিতে সেগুলিকে চাঁদ বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, একটি তথ্য জানানো দরকার। 'নীল গ্রহ নেপচুন' প্রবন্ধে 'আরও অনুসন্ধান' শীর্ষক অংশে বৃহস্পতি-সন্ধানী যান 'গ্যালিলিও'র ৪ অক্টোবর '৮৯ উৎক্ষেপণের কথা ছিল। আসলে ১৮ অক্টোবর মহাকাশফেরি আটলান্টিস থেকে গ্যালিলিওও মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ছ' বছরের দীর্ঘ যাত্রাপথে, যানটি এখন পৃথিবী থেকে বহু লক্ষ মাইল দূরে।

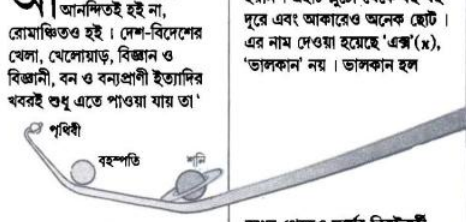

পৃথিবী থেকে নেপচুনের দিকে ভয়েজার—২

কাঁথি হাই স্কুল প্রসঙ্গে

আনন্দমেলা ১৩ ডিসেম্বর সংখ্যার 'বিদ্যালয়-পরিচিতি' বিভাগে 'কাঁথি হাই স্কুল' নিয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমি এই স্কুলে নবম শ্রেণীতে পড়ি। অষ্টম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে আমি নবম শ্রেণীতে উঠেছি। আমার নাম মিত্রজিৎ মল্লিক, ভুল করে মিত্রাজিৎ মল্লিক লেখা হয়েছে।

মিত্রজিৎ মল্লিক
নবম শ্রেণী, কাঁথি হাই স্কুল,মেদিনীপুর

কুলিক পক্ষিনিবাস

আমি নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি। ২৯ নভেম্বর সংখ্যায় নীরদ রায়ের 'এই দেশ এই বিশ্ব' বিভাগে 'কুলিক পক্ষিনিবাস' লেখাটি পড়লাম। ভীষণ ভাল লেগেছে এই লেখাটি। কুলিক পক্ষিনিবাসে গিয়ে একদিন বা দু'দিন থাকা যায় বা থাকার ব্যবস্থা আছে তা আমরা আগে জানতাম না। লেখক এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। এর ফলে যাঁরা দূর থেকে এই পক্ষিনিবাস দেখতে আসবেন, তাঁদের ভীষণ উপকার হবে।

নরেশ দাশ
দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি

সঙ্গীত নিয়ে

নিয়মিত 'আনন্দমেলা' পড়ি আমি। 'কেরিয়ার গাইড' বিভাগটি সত্যিই বেশ ভাল। এই বিভাগে সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা সম্পর্কে কোনও পরামর্শ প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি 'বিশ্বভারতী' এবং 'রবীন্দ্রভারতী'—এই দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের আর কোথায়-কোথায় সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে, সেখানে পড়তে গেলে নিয়মকানুন কী, ইত্যাদি বিষয়ে যদি একটি পরামর্শ ছাপেন খুব ভাল হয়।

সৈকত নাগ
২ নং গভঃ কলোনি, মালদা

এসে গেল নতুন বছর

আনন্দ বাগচী

কাদামাখা গায়ে ছাতা যেন কোন মান্ধাতা আমলের মোগলাই মোহরে
লেগে আছে তিনশোটি বছরের সুতানুটি ইতিহাস-স্বপ্নের মোহ রে !
দাদু আর দিদিমার মুখে শোনা মজাদার শহরের বহরের গল্প
বড়দিন, নিউ ইয়ার ইংরেজ-দুনিয়ায় মোচ্ছব হয়নিকো অল্প !
ইন্ডিয়া কম্পানি ঠোকাঠুকি লাল পানি গড়ে বাজে ব্যান্ডের বাদ্যি
সাহেবরা টেরিকেটে ছোটে নিউ মার্কেটে আজ শুধু টাকার ছেরাদ্দি।
মুনশির হাতে হুঁকো, ময়দানে লালমুখো গোরাদের কেরদানি কাণ্ড
সঙ সেজে ফুটো ভাঁড় দেখি দশ অবতার ব্রিটিশের এই ব্রহ্মাণ্ড !
আতসবাজির খই, হইহই রইরই নীলাকাশ ছয়লাপ বেলুনে,
আরি বাস ! সাব্বাশ ! থেমে যায় নিশ্বাস মেমেরাও চুল ছাঁটে সেলুনে।
চিৎপুর ঠনঠনে জাগে ভুসো লণ্ঠনে, ভোর-ভোর ছেলেবুড়ো তৈরি
যেন এই দস্তুর বড়দের হাতে ক্ষুর শুধু বাকি আছে হওয়া ক্ষৌরি।
ঠাণ্ডায় হিহিহুহু ! বিছানাও শীত-কাবু রাত্তিরে কম্বল-লেপ চায়
টুপি-মোজা-পুলওভার বেচে-কেনে এন্তার শস্তায় ভুটানি ও লেপচায়।

এক্সমাসে হিরেচুনি পান্নার জ্বেলে টুনি বুড়ো এসে উপহার রাখলে,
কেক-টেক রকমারি দিয়ে হয় ভোজ ভারী, এর সাথে পিঠেপুলি থাকলে
পোষ সংক্রান্তির স্বাদ-ভোলা-বাঙালির বড়দিন হত জম্পেশ তো
পেটে খেলে পিঠে সয় বটেই তো, মিছে নয় ট্যাঁকে যদি টেকসই রেস্ত !
নতুন বছর এল সব করে এলোমেলো বাঙালি সায়েব জাগে হর্ষে,
শুধু নেই উত্তর চোখে দেখি, ধুত্তোর ! ধুতরোর ফুল আর সর্ষে !
উননব্বই সাল আজ হল গতকাল, দেয়ালে নতুন ক্যালেন্ডার
কেনাবেচা তুলে লাটে পুজো শেষ, ধুধু মাঠে ভেরেন্ডা ভাজেনাকো ভেন্ডার !

গজ ফিতে হাতে নিয়ে কেপ্পন গজানন ঘনঘন রোদ মাপে উঠোনে
মেপে দেখে বড়দিন কতটা লম্বা হল কতটা বা কোঁচকাল দু' কোণে !
ছায়ার মাদুরখান হয়ে আছে টানটান জটিল অঙ্ক তার মগজে
হাতে নেয় গোলদাঁড়ি কোন পাল্লা যে ভারী দিন হয় রাত্তির ক' গজে ?
এসে গেল জানুয়ারি গজানন পাতে আড়ি আকাশে কি সময়ের শব্দ
স্লেট পেন্সিলে এঁকে জেট প্লেন গেছে বেঁকে, ভুলে যায় এটা কোন অব্দ !
বসে আছে বিশুখুড়ো দাঁতে গুড়াকুর গুঁড়ো, চুপচাপ গালে হাত দাওয়াতে
কুয়াশায় চোখ কানা, বুনো শীত দেয় হানা হিমেল পাখির শিস হাওয়াতে।
কারো বুঝি পোষ মাস কারো-বা সর্বনাশ এ-কথাই লিখেছিল পাঁজিতে
সব নিল কলকাতা, কই গেল হালখাতা, হাতে মাথা কাটে কোন কাজিতে !
ভুলে গেছি বনভোজ পিকনিক দিল খোঁজ আমাদের হাল-কেতা ফুর্তির
ছেলেবুড়ো দঙ্গল বোঝে না এ-খুড়ো-কল শেষ নেই এ-দৌড় পূর্তির !
ব্যামো-কে যে ভাবে ব্যাম, ইংলিশ মিডিয়াম, পঁঞ্জিকা ভুলে নেয় ডাইরি
সব হল গুবলেট হয়েছে কি বেশি লেট ? ইংরেজিপনা হোক জাহির-ই
নেই কারো ফুরসুত নতুন যুগের দূত গ্রিটিংয়ে ইটিংয়ে সব ব্যস্ত
উঁচু তলা নিচু তলা সবাই মিলিয়ে গলা শুভদিন হল সাব্যস্ত।

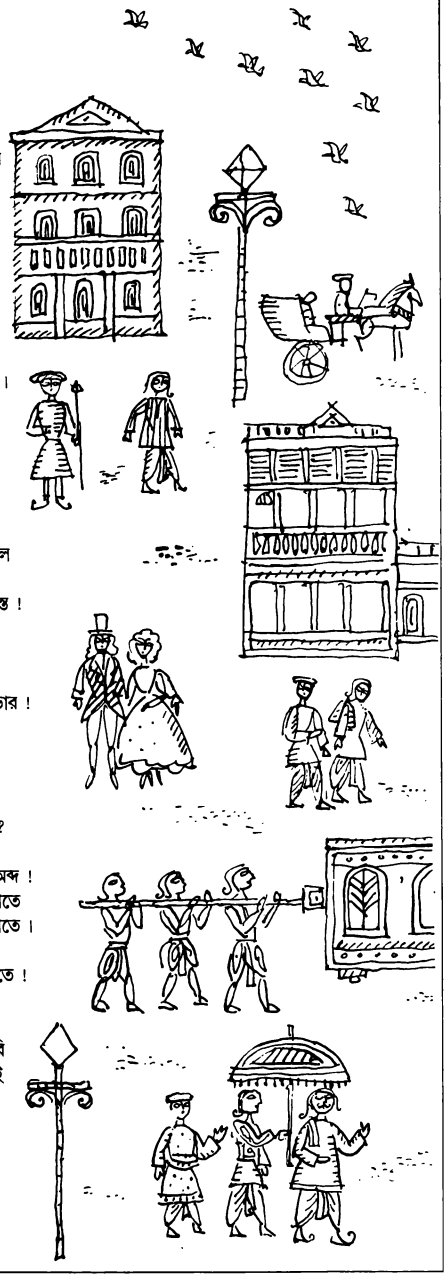

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

কুইজ?

নিল ও'ব্রায়েন

জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে

টাইকো ব্রাহে তখন শিশু। তাঁকে তাঁর পিতার দুর্গ থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর কাকা। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। টাইকো ব্রাহেকে তিনি অত্যন্ত বিলাসব্যসনের মধ্যে মানুষ করেছিলেন। ডেনমার্কের রাজপুরুষরা সচরাচর যেভাবে জীবনযাপন করেন তার চেয়েও অনেক ভাল অবস্থায়। এর ফলে টাইকো কিছুটা খামখেয়ালি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাকা চাইতেন, টাইকো একদিন মানগণ্য রাষ্ট্রনীতিক হয়ে উঠুক। কিন্তু টাইকোর ধ্যানজ্ঞান ছিল অঙ্ক। শোনা যায়, ছাত্রাবস্থায় অঙ্ক নিয়ে এক বিরোধের মীমাংসার জন্য পিস্তল নিয়ে তাঁকে দ্বৈতসমরে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তাতে তাঁর নাকের কিছুটা অংশ উড়ে যায়। সোনা ও রুপো দিয়ে তিনি সেই নাক মেরামত করে নিয়েছিলেন। পকেটে নস্যির কৌটোয় রাখতেন পালিশ করার মালমসলা। মাঝেমধ্যেই সোনা-রুপোর নাক পালিশ করে নিতেন। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে পড়ার শেষ দিকটায় তিনি আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখেছিলেন। ততটা মুগ্ধ হননি, তবে সূর্যগ্রহণের সঠিক ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপারটাকে তিনি 'স্বর্গীয়' বলে ভেবেছিলেন। তিনি তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বিশ্বের সবচেয়ে বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবেন। এদিকে, টাইকোর কাকা তাঁর জন্য রাষ্ট্রনীতির এক শিক্ষক নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু শিক্ষক ঘুমিয়ে পড়লেই বইয়ের মলাটের আড়ালে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়তেন টাইকো।

ইউরোপের সেরা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পর তিনি একদিন জানালেন, তাঁর লেখাপড়া শেষ হয়েছে। তিনি ডেনমার্কে ফিরে আকাশ পর্যবেক্ষণে মন দিলেন। তাঁর শিক্ষক দেখলেন, ছাত্রকে আর রাষ্ট্রনীতিক করা গেল না। তিনি হাল ছেড়ে দিলেন। টাইকোর কাকাও ইতিমধ্যে মারা গেলেন নিউমোনিয়া রোগে। ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ডুবে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাঁচানোর জন্য সেতু থেকে ঝাঁপ দেন টাইকোর কাকা। তারপরই তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। ১৫৭২ সালের ১১ নভেম্বর রাত্রে আকাশে একটি তারা দেখতে পান টাইকো। তারাটি আগে ওখানে ছিল না। কয়েকদিনের মধ্যেই সারা ইউরোপের নজর পড়ল সেই উজ্জ্বল আলোর বিন্দুর দিকে।

টাইকো ব্রাহে : প্রাচীন চিত্র

মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আমাদের এই পৃথিবী—টলেমির এই তত্ত্ব সারা খ্রিস্টান দুনিয়ায় গৃহীত হয়েছিল। নতুন তারার অস্তিত্ব অসম্ভব। যাবতীয় পরিবর্তন বিশ্বের সবচেয়ে কাছের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। তাই ধরে নেওয়া হল, টাইকো হয়তো পুচ্ছহীন একটি ধূমকেতুই দেখেছেন, অথবা অন্য কিছু। তবে এটাও সবাই স্বীকার করলেন যে, নতুন আলোর বিন্দুটিই প্রমাণ করে দেবে সে আসলে কী। এক জায়গায় স্থির থাকলে বুঝতে হবে সেটি তারা। ইউরোপের সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সেরা যন্ত্রপাতি নিয়ে আলোর বিন্দুটি পর্যবেক্ষণ করেও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। টাইকো বিশ্বাস করতেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ নিখুঁত হতে বাধ্য। তা হলেও তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এগোলেন, বুঝতে পারলেন তিনি একটি নতুন তারা আবিষ্কার করেছেন,। নিজের ধনসম্পদ দিয়ে সেরা সব যন্ত্রপাতি কিনে টাইকো তাঁর বাকি জীবন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আকাশ দেখেই কাটিয়েছেন। ডেনমার্কের রাজসভার জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বিশ্বের প্রথম মানমন্দিরটি তৈরি করেছিলেন কোপেনহেগেনের কাছে একটি দ্বীপে। তার নাম রেখেছিলেন 'উরানিয়েনবর্গ' বা 'স্বর্গের দুর্গ'। আকাশে উল্লেখযোগ্য কিছু দেখলেই তিনি তা লিখে রাখতেন। সমস্ত তথ্য থাকত সুরক্ষিত। তাঁর মৃত্যুর পর এইসব তথ্য হাতে পেলেন তাঁর সহকারী যোহান্‌স কেপলার। টাইকোর নিখুঁত সব তথ্য, বিশেষ করে মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার কাজে লাগিয়ে কেপলার প্রমাণ করে দেন, ২০০০ বছর ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যা বলে আসছেন তা ঠিক নয়। ঠিক বৃত্তাকারে গ্রহগুলি ঘোরে না, ঘোরে উপবৃত্তাকারে।

কুইজ

প্রশ্ন

(১) বেন জনসন সোল ওলিম্পিকে কোন গ্রুপের ড্রাগ নিয়েছিলেন ? **কমল সিওয়া,** জলপাইগুড়ি ।

(২) কিউই পাখি কোন দেশের প্রতীক চিহ্ন ? **শুভব্রত চট্টোপাধ্যায়,** হিন্দু স্কুল ।

(৩) মুসলিম রাজত্বে ঢাকার নাম কী ছিল ? **সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়,** কোন্নগর ।

(৪) 'অর্জুন' পুরস্কার কত সালে শুরু হয়েছিল ? **অনির্বাণ বর্ধন,** এ বি এল স্কুল, বর্ধমান ।

(৫) গত মরসুমে রবি শাস্ত্রী ইংল্যান্ডের কোন কাউন্টির হয়ে খেলেছেন ? **সম্রাট সেনগুপ্ত,** ত্রিপুরা ।

(৬) 'মুনওয়াক' কার আত্মজীবনী ? **তাতাই সেনগুপ্ত,** মেদিনীপুর ।

(৭) CAD-র পুরোটা কী ? **শাশ্বতকুমার,** পাঠভবন, শান্তিনিকেতন ।

(৮) ওয়েস্ট ইন্ডিজের বৃহত্তম দ্বীপের নাম কী ? **সেখ আজিম,** বর্ধমান রসুলপুর বি এম হাই স্কুল ।

(৯) C in C-র পুরোটা কী ? **অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়,** মুর্শিদাবাদ ।

(১০) এ-বছরের 'ফুটবলার অব দ্য ইয়ার' কে নির্বাচিত হয়েছেন ? **অনিক রায়,** কলকাতা-৪৫ ।

(১১) বঙ্গোপসাগর অতীতে কী নামে পরিচিত ছিল ? **রিন্টু সাঁই,** বর্ধমান ।

(১২) কোন রাজ্যকে 'ভারতের সুইজারল্যান্ড' বলা হয় ?

(১৩) কবি নজরুল ইসলামের জন্মস্থান কোথায় ? **সুজাতা সাঁই,** বারাসত ।

(১৪) নিজেদের শততম টেস্টে কোন দু'জন ক্রিকেটার শতরান করেছেন ? **ডোডো দাশগুপ্ত,** কলকাতা-১৪ ।

(১৫) 'উইকেট কিপিং' বইটির লেখক কে ? **সেখ আব্বাস আলি,** বর্ধমান ।

(১৬) 'ঝাঁসীর রানী' বইটি কার লেখা ? **সম্রাট ও সপ্তর্ষী,** সোনামুখি ।

(১৭) স্পেনের জাতীয় খেলা কী ? **সঞ্জয় ও কেকা মালাকার,** পলাশি ।

(১৮) মাইক টাইসনের বর্তমান 'প্রোমোটার'-এর নাম কী ? **সৈকত শী,** হাওড়া-৪ ।

(১৯) ভুটানের জাতীয় ভাষার নাম কী ? **রাণা বসু,** জুলিয়েন ডে স্কুল ।

(২০) 'ট্রেন টু পাকিস্তান' কার লেখা ? **সেখ আবদুর রব,** বর্ধমান ।

(২১) শ্যামদেশ বলতে বর্তমানে আমরা কোন দেশকে বুঝি ? **সৌম্যেন্দু মজুমদার,** দুর্গাপুর ।

গত সংখ্যার উত্তর

(১) ইসরো ।
(২) কুস্তির একটি প্যাঁচ ।
(৩) মিসিসিপি মিসৌরি ।
(৪) পিলাভুলাকান্দি থেকে-পারমবিল উষা ।
(৫) ১৯৩০ সালে ।
(৬) তুজুক-ই-বাবরি ।
(৭) দ্বিতীয় নিকোলাস ।
(৮) অ্যালবিয়ান ।
(৯) ময়ূর সিংহাসন ।
(১০) শংকর ।
(১১) চণ্ডীগড় (পঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজধানী) ।
(১২) সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ।
(১৩) অ্যানিরয়িড ব্যারোমিটার ।
(১৪) জিয়স ।
(১৫) মহম্মদ বিন তুঘলক ।
(১৬) সরোজিনী নাইডু ।
(১৭) সুইডেন ।
(১৮) মনীশ ঘটক ।
(১৯) ভিক্টর হুগো ।
(২০) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

শংকর

সরোজিনী নাইডু

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

বিষয় : ১৯৮৯

প্রশ্ন

(১) বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হয়ে প্রথম কোন দেশ সফর করেছিলেন ?

(২) দ্বাদশ ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব আগের উৎসবগুলির চেয়ে আলাদা। কোন অর্থে ?

(৩) ম্যান্ডেলা ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব কী ?

(৪) 'টিপু সুলতান' সিরিয়ালের শুটিং চলার সময় মহীশূরের কোন স্টুডিওতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল ?

(৫) কোন মুসলিম দেশের মেয়েরা প্রথম ভোট দিয়েছেন ?

(৬) কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত ভারতের অধিনায়ক হওয়ার পর কোন মন্দিরে রুপোর পাত্র অর্পণ করেছেন ?

(৭) ভারতের প্রথম কোন শহরে শতকরা একশোজনই সাক্ষর হয়েছেন ?

(৮) 'গণতন্ত্রের দেবী' কে ?

(৯) ইংল্যান্ডের পুরাতাত্ত্বিকেরা শেকসপিয়রের একটি থিয়েটারের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। এই থিয়েটারের নাম কী ?

(১০) দশটি নির্বাচন জিতে তাঁর নাম ইতিমধ্যেই 'গিনেস বুক অব রেকর্ডস'-এ স্থান পেয়েছে। সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনেও তিনি সবচেয়ে বেশি ভোটে জিতেছেন। তাঁর নাম কী ?

(১১) ২৭-তম কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?

(১২) আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতে ভারতের কোন বিচারপতি নির্বাচিত হয়েছেন ?

(১৩) নেহরু কাপ ফাইনালে ডেসমন্ড হেন্‌স সর্বোচ্চ রান (১০৭ নট আউট) করেছেন। ওই ম্যাচে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন কে ?

(১৪) কলকাতার রাজভবনে ইন্দিরা গান্ধীর একটি প্রতিকৃতি উন্মোচন করা হয় গত জুন মাসে ? ছবিটি কোন শিল্পী এঁকেছেন ?

(১৫) বিশ্বের কোন দেশে মাথাপিছু আয় সবচেয়ে বেশি বলে ঘোষণা করা হয়েছে ?

(১৬) পাঁচ বছর বয়সী শীতল পান্ডা একটি দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কী সেই কৃতিত্ব ?

(১৭) এয়ার ইন্ডিয়ার যে বোয়িং ৭৪৭ বিমানটিতে সূর্যের নতুন প্রতীক প্রথম চালু করা হয়েছে, তার নাম কী ?

(১৮) কোন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীকে কেন্দ্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে ?

(১৯) এঁরা ছিলেন সংবাদের শিরোনামে। এঁদের নাম কী (পাশের ছবিতে) ?

(খ)

(গ)

(ক)

উত্তর : (১) সৌদি আরব। (২) এই উৎসব প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। (৩) রাস্তার কিছু ছেলে, যারা উইনি ম্যান্ডেলার বাড়িতে থেকে তাঁর দেহরক্ষীর কাজ করে। (৪) প্রিমিয়ার স্টুডিও। (৫) জর্ডান। (৬) কেরলের গুরুভায়ুর-এর শ্রীকৃষ্ণ মন্দির। (৭) কেরলের কোট্টায়াম। (৮) বেজিংয়ের তিয়ানানমেন স্কোয়ারে বিক্ষুব্ধ চিনা ছাত্ররা 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' গড়েছিলেন। সেই মূর্তিকেই তাঁরা 'গণতন্ত্রের দেবী' বলেছিলেন। (৯) রোজ থিয়েটার। আর একটি থিয়েটারেরও ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এটি হয়তো প্রসিদ্ধ গ্লোব থিয়েটার। (১০) রামবিলাস পাসোয়ান। (১১) কুয়ালালামপুরে। (১২) আর. এস. পাঠক। (১৩) ইমরান খান নিয়েছিলেন তিনটি উইকেট। (১৪) বিকাশ ভট্টাচার্য। (১৫) সুইজারল্যান্ড। (১৬) দিল্লি থেকে বোম্বাই সে স্কেটিং করেছে। (১৭) সম্রাট রাজেন্দ্র চোল। (১৮) এম. জি. কে. মেনন। (১৯) ক) আন্দ্রেই শাখারভ। খ) স্নুকার খেলোয়াড় ইয়াসিন মার্চেন্ট। গ) এরিখ হোনেকার (পূর্ব জার্মানি)।

শরীর ঠাণ্ডা রাখতে অভিনব পোশাক

নাম 'মার্ক-সেভেন মাইক্রোক্লাইমেট সিস্টেম'। এর মধ্যেই রয়েছে শরীর ঠাণ্ডা রাখার বিশেষ ব্যবস্থা। এই পোশাকের ভিতরে রয়েছে অতিরিক্ত চাপে ভরা শীতল তরল। এই তরল প্রবাহিত হচ্ছে জ্যাকেট ও টুপির মধ্যে দিয়ে। মহাশূন্যে 'পায়চারি' করার সময়ে 'অ্যাপোলো কুলিং স্যুট' নামে একরকম বিশেষ পোশাক 'নাসা' সংস্থা মহাকাশচারীদের ব্যবহার করতে দিয়েছিল। মার্ক-সেভেনও অনেকটা সেই ধরনের। তবে এর ব্যবহারকারীরা মহাকাশচারী নন, মোটর-দৌড় প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী। বিখ্যাত অটো রেসার রিচার্ড পেটি, ডেল আর্নহার্ট থেকে শুরু করে প্রায় তিনশো মোটর-দৌড় প্রতিযোগী এই অভিনব পোশাক ব্যবহার করে সুফল পেয়েছেন। এই পোশাক তৈরি করেছে আমেরিকার 'লাইফ সাপোর্ট সিস্টেম'। দাম এক হাজার থেকে আড়াই হাজার ডলার পর্যন্ত।

নতুন ইলেকট্রনিক ক্যামেরা : টেলিভিশন

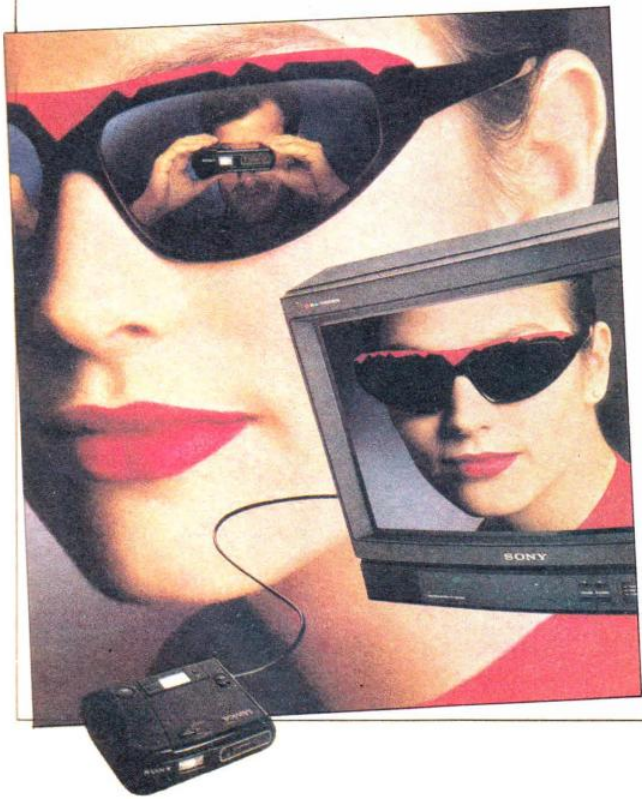

না, রঙিন ফোটোগ্রাফ আর হাতে নিয়ে দেখতে হবে না। দ্যাখো টিভির জীবন্ত পরদায়। এই আশ্চর্য রূপকথাকে বাস্তবে নিয়ে এসেছে সনি কর্পোরেশনের নতুন ক্যামেরা 'সনি মেভিকা'। এই ক্যামেরা হল সাধারণ ক্যামেরা আর ভিডিও ক্যামেরার মাঝামাঝি : স্টিল ভিডিও ক্যামেরা। যে-কোনও জিনিসের রঙিন ছবি এই ক্যামেরা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বন্দী করে রাখে তার দু'ইঞ্চি মাপের 'মেভিপ্যাক' ডিস্কে। একটা ডিস্কে মোট পঞ্চাশটি ছবি তোলা যায়। এ ছাড়া একই ডিস্ক বারবার ব্যবহার করা যায়। ছবি তোলার পর ক্যামেরা এবং তার অনুষঙ্গী যন্ত্র প্লে-ব্যাক কন্ট্রোলার যে-কোনও টিভি-র সঙ্গে জুড়ে দিলেই হল। রঙিন স্থিরচিত্র ফুটে উঠবে টিভি-র পরদায়। মেভিকা মাপে ও ওজনে সাধারণ ক্যামেরার মতোই। ফলে এটি চিত্রসাংবাদিকদের কাছেও প্রিয় হয়ে উঠেছে।

অনুসন্ধানী

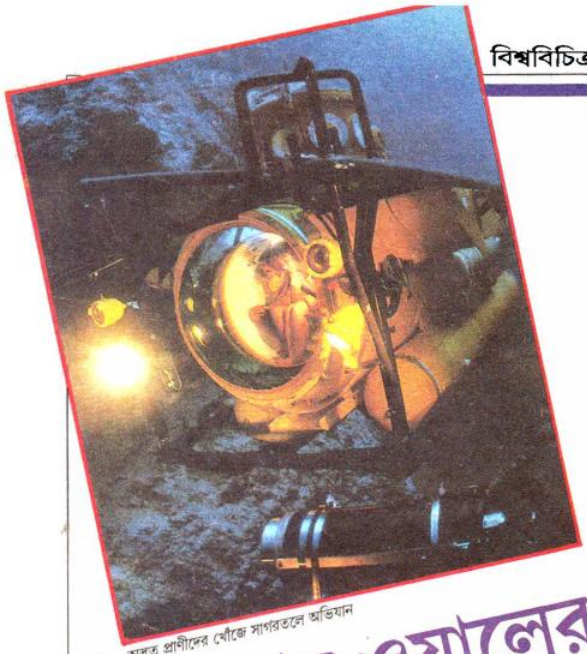

অদ্ভুত প্রাণীদের খোঁজে সাগরতলে অভিযান

কেম্যান ওয়ালের আশ্চর্য জগৎ

জয় সেনগুপ্ত

'সাবমার্সিবল' যান

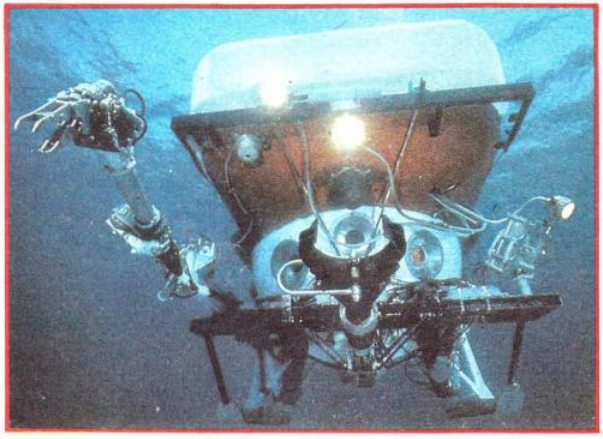

জামাইকার ১৪০ থেকে ২০০ মাইল উত্তরপূর্বে ক্যারিবিয়ান সাগর। এখানে রয়েছে তিনটি প্রবাল দ্বীপ—গ্র্যাণ্ড কেম্যান, লিট্‌ল কেম্যান এবং কেম্যান ব্রাক। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ হল গ্র্যাণ্ড কেম্যান। এই গ্র্যাণ্ড কেম্যানের একটা অংশ, সমুদ্রগর্ভস্থ একটা ঢল কেম্যান ওয়াল নামে পরিচিত। গ্র্যাণ্ড কেম্যানের পশ্চিম দিকের অগভীর জল থেকে উপকূলের তিন মাইল দূরে ৩২০০ ফুট পর্যন্ত এটা প্রসারিত।

এই কেম্যান ওয়ালে বহু বিজ্ঞানী, গবেষক এবং ফোটোগ্রাফার দীর্ঘদিন ধরে বহু অভিযান চালিয়েছেন। তাঁদের এইসব অভিযান যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই চমকপ্রদ।

মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন ক্লার্ক মেরিন বায়োলজিস্ট। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি সমুদ্রের মধ্যে কেম্যান ওয়ালে কাটিয়েছেন। কখনও কখনও ৩২০০ ফুট গভীরেও থেকেছেন 'সাবমার্সিবল পিস্‌কাস-২'তে করে। এখানে ক্লার্ক বিভিন্ন গভীরতায় নানা ধরনের নতুন প্রজাতির সামুদ্রিক জীবের সন্ধান পেয়েছেন। এই প্রাণীরা তাদের স্বাভাবিক বাসস্থানে কীভাবে থাকে তা দেখারও সুযোগ এই প্রথম পেলেন তিনি।

কেম্যান ওয়ালকে মোট চারভাগে ভাগ করা হয়। (১) রিফ, (২) ওয়াল, (৩) হেস্ট্যাক,এবং (৪) ডিপ। জলের নীচে ২০০ ফুট পর্যন্ত রিফের সীমানা। প্রচুর পরিমাণে সূর্যের আলো পৌঁছয়। এখানে বাস করে প্রবাল কীট, ব্যারাকুডা, প্যারট ফিস, গার্ডেন ইল ইত্যাদি প্রাণী।

২০০ থেকে ৬০০ ফুট পর্যন্ত হল ওয়াল। এখানে সূর্যরশ্মি খুব বেশি পৌঁছয় না। এখানকার বাসিন্দা হল বিভিন্ন ধরনের স্পন্জ। যেমন টিউব, এলিফ্যান্ট ইয়ার, সিংকগো-লিক, রোপ এবং ব্যারেল।

৬০০ থেকে ১০০০ ফুট পর্যন্ত হল হেস্ট্যাক। এ-জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছয় আরও কম। এখানে থাকে হাঙর, স্টারফিস এবং ছাতার মতো দেখতে সামুদ্রিক প্রাণী—ক্রিনয়েড।

১০০০ ফুটের পর থেকে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত হল ডিপ এলাকা। সূর্যের আলো পৌঁছয় না এখানে। অদ্ভুত প্রজাতির সব প্রাণীর বাস এ-জায়গায়। এদের নামও তেমনই অদ্ভুত। যেমন, কুকি-কাটার হাঙর, কফিন ফিস, ট্রিপড ফিসএবং জেলি ফিস।

কেম্যান ওয়ালের এই আশ্চর্য জগৎ দেখবার জন্য সমুদ্রের তলায় সাবমার্সিবল করে ভ্রমণ একটা দারুণ চমকপ্রদ ব্যাপার।

সমুদ্রের বাসিন্দা স্পনজ

শুধুমাত্র বিজ্ঞানীরাই নন, ইদানীং ট্যুরিস্টরাও এই অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ পেতে চাইছেন।

এইরকম একটা সাবমার্সিবল হল 'আটলান্টিস-১'। আঠাশজন যাত্রীকে নিয়ে ১৫০ ফুট গভীরে ঘন্টাখানেক থাকতে পারে এটি। এই অভিযান এখন এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে, ছেচল্লিশজন যাত্রী ধরে এমন একটা সাবমার্সিবলকে বারবাডোজ এবং ভার্জিন আইল্যাণ্ডে ট্যুরিস্ট বাসের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে।

ট্যুরিস্টদের দেখবার মতো কতরকম প্রাণী যে এখানে আছে, তার ইয়ত্তা নেই। যেমন, কেম্যান ওয়ালের একেবারে ওপর দিকে অগভীর জলে ঘুরে বেড়ায় গোবিডি পরিবারের কাঁটাযুক্ত পাখনার মাছ গোবি। দারুণ দেখতে এই মাছগুলো।

আর-এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী হল একিনোডারমাটা প্রজাতির ক্রিনয়েড। কেম্যান ওয়ালের ৮০০ ফুট গভীরে এদের বাস করতে দেখা যায়। এদের অবশ্য সি লিলিও বলা হয়। কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত লম্বা হয় এরা। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল—খোলা ছাতার মতো দেখতে এই প্রাণীগুলো তেইশ কোটি বছর আগে যেরকম ছিল, এখনও সেইরকমই আছে। তবে কেম্যান ওয়ালের সবচেয়ে মজাদার বাসিন্দা হল কফিন ফিস। অদ্ভুত আকৃতির এই মাছগুলো ২৬০০ ফুট জলের নীচে সামনের দিকের পাখনায় ভর দিয়ে বসে থাকে।

ফোটোগ্রাফার ডেভিড ডুবিলেট সাবমার্সিবলে চড়ে বেশ কয়েকবার কেম্যান ওয়ালে অভিযান চালিয়েছেন। একবার তিনি এক মজার দৃশ্য দেখলেন। ৪০ ফুট গভীরে, অর্থাৎ রিফের এলাকায় ঘুরছিলেন ডুবিলেট। হঠাৎ দেখলেন কারাংক্স হিপো প্রজাতির ছোট আকৃতির পুরুষ মাছ ক্রেভাল-এর একটা দল বিরাট আকৃতির একটা ব্যারাকুডাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ব্যারাকুডাদের দেখতে অনেকটা বাণমাছের মতো, আর এদের প্রকৃতিও বেশ হিংস্র। ব্যারাকুডারা সাধারণত সন্ধেবেলা শিকার ধরতে বেরোয়। কিন্তু এই ব্যারাকুডাটা দুপুরবেলা বেরিয়েছিল শিকারের খোঁজে। ওই সময় ক্রেভাল মাছেরা দল বেঁধে ঘোরাফেরা করছিল।

কোর্টনি প্যাট একজন নামকরা ডুবুরি। রিসার্চ সাবমার্সিবলের হয়ে দু'হাজার বার তিনি ডুব দিয়েছেন সমুদ্রে। একদিন সাবমার্সিবলে চড়ে স্ত্রী কোজিকে নিয়ে ২৫০ ফুট নীচে একটা 'এলিফ্যান্ট ইয়ার' স্পনজের ছবি তোলেন তিনি। হাতির কানের মতো দেখতে বলে এর নাম এ্যালিফ্যান্ট ইয়ার স্পনজ। এটি ছিল প্রস্থে প্রায় ১৫ ফুট। কোর্টনি বলেন, "আজ পর্যন্ত যত এলিফ্যান্ট ইয়ার স্পনজ আমরা দেখেছি, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়।"

৮০০ ফুট গভীরে আলোছায়ার মধ্যে 'কার্ক প্রাইড' নামে একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। ১৯৭৬ সালে ঝড়ে জাহাজটা ডুবে যায় এখানে। কিন্তু ১৯৮৫ সালের আগে এর খোঁজ কেউ জানতে পারেনি। রিসার্চ সাবমার্সিবল লিমিটেডের চালক স্টুয়ার্ট মেইলার ওই সময় একটা অভিযান চালাতে গিয়ে জাহাজটা আবিষ্কার করেন।

কেম্যান ওয়ালের তলায়, গভীরতম অঞ্চলে ইউজিন ক্লার্ক তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মাঝে-মাঝে সাবমার্সিবল করে ডুব দিতেন ছয় কানকোওলা হাঙরদের ছবি তোলবার জন্য। হাঙরদের আকৃষ্ট করবার জন্য তাঁরা করতেন কি, পাঁচ ইঞ্চি লম্বা উজ্জ্বল লাল রঙের গভীর জলের চিংড়িমাছ একটা কাপড়ের ব্যাগে প্রচুর পরিমাণে ভরে অব্যর্থ টোপ হিসেবে নিখুঁতভাবে সাবমার্সিবলের আর্ম'-এর সঙ্গে আটকে দিতেন। সাবমার্সিবলের হালকা উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে, একস্টেনশন আর্মের সঙ্গে বেট-ব্যাগ লাগিয়ে একদিন জলের নীচে চুপচাপ অপেক্ষা করছিলেন ইউজিন ক্লার্ক এবং এমোরি ক্রিস্টক। হঠাৎ মনে হল বিরাট আকৃতির কী-একটা এসে আড়াল করে দিল সাগরযানের জানলাটা। সঙ্গে-সঙ্গে জোরাল ফ্লাডলাইট জ্বেলে দিলেন ইউজিন। কী দেখলেন ? ছয় কানকোওলা হাঙর, যার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা। সঙ্গে-সঙ্গে হাঙরটার একটা ছবিও তুলে নিলেন তিনি।

নতুন তথ্যের সন্ধানে

ফোটো : 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক'-এর সৌজন্যে

বিমান কিংবা মহাকাশে পাঠানো কোনও উপগ্রহের সঙ্গে যুক্ত অত্যাধুনিক বীক্ষণযন্ত্র প্রত্নচর্চায় ব্যাপক এক বিপ্লব আনতে চলেছে। পঞ্চাশের দশকে 'রেডিও-কার্বন ডেটিং'-এর পর, নব্বইয়ের দশকে প্রত্নচর্চায় আর এক বিপ্লব আনতে চলেছে 'রিমোট সেন্সিং' পদ্ধতি।

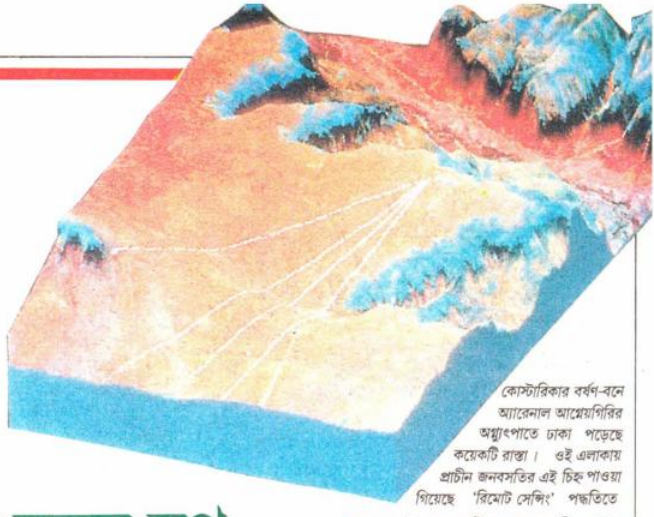

কোস্টারিকার বর্ষণ-বনে অ্যারেনাল আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে ঢাকা পড়েছে কয়েকটি রাস্তা। ওই এলাকায় প্রাচীন জনবসতির এই চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে 'রিমোট সেন্সিং' পদ্ধতিতে

প্রত্নচর্চায় নতুন যুগ

শান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৮৮'র ফেব্রুয়ারি মাসে একটি গেট্স লিয়ারজেট-২৩ বিমান উড়ে চলল কোস্টারিকার বর্ষণ বনের দিকে। সেখানে লুকিয়ে আছে এক আগ্নেয়গিরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নাসা' থেকে পাঠানো এই বিমানটির উদ্দেশ্য সেই অঞ্চলের হাজার বছর আগে বিলুপ্ত জনবসতির কোনও চিহ্ন খুঁজে বার করা। অবশ্য এই অ্যারেনাল আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে নাসা-র এটাই প্রথম অনুসন্ধান অভিযান নয়। এর আগে আরও দু'বার অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। কিন্তু এই তৃতীয়বারেই, যে মুহূর্তে গহন অরণ্য ভেদ করে বিমানের মাল্টিস্পেক্ট্রাল স্ক্যানারে ধরা পড়ল বিলুপ্ত জনবসতির চিহ্ন, সেই মুহূর্তে প্রত্নতত্ত্বের জগতে ঘটে গেল এক যুগান্তকারী আলোড়ন। আর কোদাল-বেলচা নয়, প্রত্নতত্ত্বের কাজও এবার চলবে মহাকাশ থেকে।

১৯৮৪ সালে নাসা-র প্রত্নতাত্ত্বিক টম সিভার আকাশ থেকে তাঁর প্রথম অনুসন্ধান শুরু করেন 'লিডার' নামের একটি যন্ত্রের সাহায্যে। তাঁর দ্বিতীয় অনুসন্ধান অভিযান চলে 'কনভেয়ার ৯৯০' বিমান থেকে একটি এল-ব্যান্ড রেডারের মাধ্যমে। লিডার এবং এল-ব্যান্ড রেডার, এই দুটি যন্ত্রেরই আশ্চর্য ক্ষমতা আছে গভীর জঙ্গল ভেদ করে ভূমিরূপের নিখুঁত ছবি বার করে আনার। এ ছাড়া অন্যান্য বীক্ষণযন্ত্র, যেমন থার্মাল ইনফ্রারেড মাল্টিস্পেক্ট্রাল স্ক্যানার, ভূ-প্রকৃতির উপাদান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে। আরও বলে দিতে পারে এক ডিগ্রির ভগ্নাংশের তারতম্যে ভূমি গঠনকারী বিভিন্ন বস্তুর থেকে কী পরিমাণ তাপ বিকিরণ হচ্ছে এবং কত হারে তাপ কমছে।

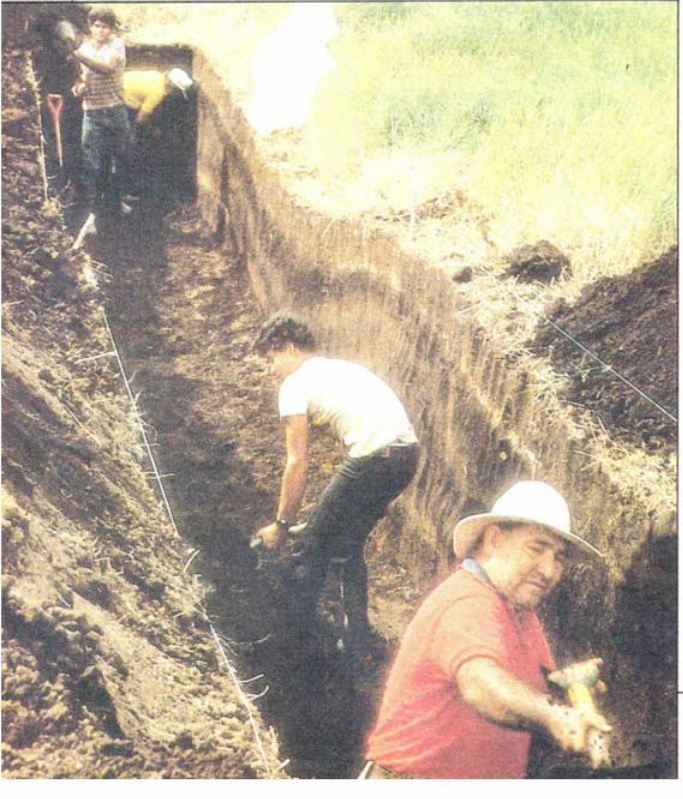

সাবেক প্রথায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য

সিভারকে বলা হয় নাসা-র ইন্ডিয়ানা জোন্‌স। কিন্তু তিনি নিজেকে নিছক 'অ্যাডভেঞ্চারার' বলতে একদম নারাজ। তিনি শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে এই কথাটাই জানাতে চান যে, উপগ্রহ কিংবা বিমানের সঙ্গে সংযুক্ত কোনও অত্যাধুনিক বীক্ষণযন্ত্র যা কাজ করতে পারে তা অন্য কোনওভাবেই করা অসম্ভব। তাঁর মতে, '৫০-এর দশকে 'রেডিও কার্বন ডেটিং' পদ্ধতি প্রত্নচর্চায় যে বিপ্লব এনেছিল', '৯০-এর দশকে 'রিমোট সেন্সিং' পন্থাও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে সেরকমই অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, আর এক বিপ্লব এসে পড়ল।

১৯৮৫-র এপ্রিলে সিভার আবার অ্যারেনাল অঞ্চলে ফিরে যান তাঁর দ্বিতীয় অভিযানের সংগৃহীত তথ্যকে প্রাচীন ইতিহাস উদ্‌ঘাটনের কাজে লাগানোর জন্য। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্যেসন শিট্‌স। শিট্‌স অ্যারেনাল অঞ্চলে কাজ করছিলেন ১৯৮১ সাল থেকে, তাঁর এক সহকর্মী প্রাগৈতিহাসিক যুগের কয়েকটি মৃৎপাত্রের টুকরো খুঁজে পাওয়ার পর।

অ্যারেনাল আগ্নেয়গিরি গত চার হাজার বছরে ন'বার লাভা উদ্গিরণ করেছে। শিট্‌সের অনুসন্ধানের বিষয় ছিল কবে কোস্টারিকায় গ্রামীণ জীবন শুরু হয়েছিল আর কীভাবে তার ক্ষতি হয়েছিল এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে।

সিভার যখন এসে পৌঁছলেন, শিট্‌স তখন সমস্ত অঞ্চলটিতে পায়ে হেঁটে অনুসন্ধান শুরু করে দিয়েছেন। চলার পথে প্রায় প্রতিদিনই এসে ছেঁকে ধরছে অসংখ্য জোঁক। এ ছাড়াও আছে আরও অনেক ঝামেলা। কিন্তু তখনও তিনি বিশ্বাস করছিলেন তাঁর হাঁটাপথের পরিশ্রমের সঙ্গে সিভারের প্লেনে লাগানো আধুনিক যন্ত্রপাতি কোনওভাবেই এঁটে উঠতে পারবে না। তাঁর মতে, রিমোট সেন্সিং-এর পক্ষে কোস্টারিকা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে জঘন্যতম জায়গা। ৪৫ মিটার উঁচু গাছের ঘন জঙ্গল, আকাশটা পর্যন্ত ভালভাবে দেখা যায় না। এরই মধ্যে ছড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক জনজীবনের সামান্য কিছু নিদর্শন। তাও অধিকাংশই ঢেকে গেছে অ্যারেনালের বারবার অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। শিট্‌স তাই জোরগলায় এ-কথা বললেন, এখানে যদি রিমোট সেন্সিং পদ্ধতি সফল হয়, তা হলে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গাতেই একে কাজে লাগানো যাবে।

সিভার শিট্‌সকে দেখালেন, ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় অভিযানের সময় কনভেয়ার থেকে

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক প্যেসন শিট্‌স (বাঁয়ে), এবং 'নাসা'-র প্রত্নতাত্ত্বিক টম সিভার

নেওয়া বিভিন্ন ছবি। প্রযুক্তিগত পরিভাষায় এদের বলা হয় 'ইমেজারি'। সেই ইমেজারির মধ্যে এক জায়গায় শিট্‌স লক্ষ করলেন, একটি কালো রেখা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এটা তারের বেড়া হতে পারে। সিভারকে তিনি জানালেন কথাটা। কিন্তু সিভারের মনে হল তারের বেড়া নয়, আঁকাবাঁকা কালো দাগটা নিশ্চয়ই কোনও রাস্তা হবে। কথাটা শুনে, শিট্‌স সেদিন মনে মনে হেসেছিলেন।

যাই হোক, সিভারের দিক নির্দেশ অনুযায়ী শিট্‌স এগিয়ে চললেন তারপর। খননকার্য শুরু হল। এবং দেখা গেল সিভারের বলা 'রাস্তা' বাস্তবিকই কোনও এক হারানো শহরের 'ফুটপাথ'। প্রায় হাজার বছরের পুরনো এই ফুটপাথ আগ্নেয়গিরির ছাই, লাভা এবং মাটির স্তূপের তলায় চাপা থাকার ফলে এতদিন ভূমিক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছে। কিন্তু এর যেটুকু ক্ষয় এবং পরিবর্তন হয়েছে তার ফলে ওপরে জমতে থাকা মাটির মধ্যে চারপাশের তুলনায় উপাদান ও আর্দ্রতাগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। তাই, এই মাটির ওপর বেড়ে ওঠা গাছপালা যে অতিলাল রশ্মি বিকিরণ করেছে তার তল ঠিক পাশের উদ্ভিদ ও অন্যান্য গাছের থেকে বিকীর্ণ হওয়া অতিলাল রশ্মির তলের চেয়ে আলাদা। বীক্ষণযন্ত্রে এই পার্থক্যটুকু ধরা পড়ল। আর তাই সিভার ও শিট্‌সের পক্ষেও সম্ভব হল মাটির নীচে চাপা পড়া ফুটপাথ খুঁজে পেতে। এক কথায়, ফিরে পাওয়া গেল ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যাওয়া একটি সভ্যতাকে।

এর পর শিট্‌স ও তাঁর সহকর্মীরা নতুন উৎসাহে এগনো শুরু করলেন। দেখা গেল সমস্ত অঞ্চলটি জুড়ে ছড়িয়ে আছে এই ফুটপাথ। অনেক ছোট-ছোট গ্রামের নিদর্শন পাওয়া গেল—পরস্পরের সঙ্গে এই ফুটপাথ দিয়ে সংযুক্ত।

শিট্‌স অবশেষে মানতে বাধ্য হলেন, রিমোট সেন্সিং পদ্ধতি ছাড়া এই ফুটপাথগুলো তাঁর পক্ষে খুঁজে বার করা অসম্ভব ছিল। তিনি স্বীকার করলেন, রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া এই ইমেজারি প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত সঠিক।

এবার সিভারের কথায় আসা যাক। রিমোট সেন্সিং-এর ব্যাপারে শিট্‌সকে প্রথম জানালেন, তিনি নিজে কিন্তু মোটেই শিক্ষানবিশ গোছের কিছু ছিলেন না। ততদিনে তাঁরও হাতেনাতে কিছু অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে আকাশ থেকে নিউ মেক্সিকোর চ্যাকো ক্যানিয়নে কিছু ভূ-গর্ভস্থ রাস্তা খুঁজে

বার করে। সেই অঞ্চলটি ছিল অ্যানাসাজি ইন্ডিয়ানদের এককালের বাসভূমি। জায়গাটি অনেকদিন ধরেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। ১৯২৯ সালের জুনে চার্লস লিন্ডবার্গ প্লেন থেকে কিছু সাদা-কালো ছবি তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে কিছু বার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপর, '৩০ ও '৪০-এর দশকে স্থানীয় লোকরা ছাগল ভেড়া চরিয়ে সামান্য যা কিছু নিদর্শন খুঁজে পাবার সম্ভাবনা ছিল, তাও নষ্ট করে দিয়েছিল। অনেক পরে, ১৯৭১-এ চ্যাকো ক্যানিয়ন ন্যাশনাল পার্কের রেঞ্জাররা লিন্ডবার্গের ছবি থেকে মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া কিছু রাস্তার আভাস পান। প্রত্যেকটিরই দু'পাশে গাছপালার চিহ্ন ছিল। এর ফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমি সংরক্ষণ সংস্থা থেকে দশজন বিজ্ঞানী চ্যাকো ক্যানিয়নে পাঠানো হয় এ-বিষয়ে আরও কিছু অনুসন্ধানের জন্য। কিন্তু এই দলটি তিন বছর ঘুরে ঘুরে কোনওকিছুই পেলেন না, এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, লিন্ডবার্গের ছবির লম্বা কালো দাগগুলো আসলে অ্যানাসাজির সাধারণ পাকা রাস্তা।

১৯৭৮-এ সিভার এলেন স্টেনিস সেন্টারে কাজ নিয়ে (তখন সেন্টারটির নাম ছিল ন্যাশনাল স্পেস টেকনোলজি ল্যাবরেটরিজ), যদিও তিনি ঠিক তখনও রিমোট সেন্সিং পদ্ধতির ব্যাপারে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নন। তারপর তিনি ভূমিসংরক্ষণ সংস্থার তিন বছরের একটি কোর্স করেন। এবং তা কাজে লাগান ১৯৮২-তে। দু' সপ্তাহ ধরে নাসা-র একটি লিয়ারজেটে চড়ে থার্মাল ইনফ্রারেড মাল্টিস্পেক্ট্রাল স্ক্যানারের সাহায্যে খুঁজে বার করেন চ্যাকো ক্যানিয়নের মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা পুরনো দিনের সত্যিকারের রাস্তা।

চ্যাকো ক্যানিয়নে এই বিশাল সাফল্যের পর, নাসা বিশেষভাবে 'এরিয়েল আর্কিওলজি' বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করল। সিভার ও মেতে উঠলেন নতুন উদ্যমে।

শুধু মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটই নয়, এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মে হারিয়ে যাওয়া নিদর্শন ও খুঁজে বের করা সম্ভব। ১৯৮১-র নভেম্বরে মহাকাশ থেকে চালিত এক বিশেষ ধরনের বীক্ষণযন্ত্র এস আই আর (শাট্‌ল ইমেজিং রেডার) মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে দেখিয়েছে মরুভূমির বালিতে ঢেকে- যাওয়া নানা প্রাকৃতিক নিদর্শন। এস আই আর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বালির নীচে

শুধু মানুষের তৈরি ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাটই নয়, এই পদ্ধতির সাহায্যে প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মে হারিয়ে-যাওয়া নিদর্শনও খুঁজে বের করা সম্ভব। ১৯৮১-র নভেম্বরে মহাকাশ থেকে চালিত এক বিশেষ ধরনের বীক্ষণযন্ত্র এস আই আর (শাট্‌ল ইমেজিং রেডার) মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে দেখিয়েছে মরুভূমির বালিতে ঢেকে-যাওয়া নানা প্রাকৃতিক নিদর্শন।

নদী খাতের। ১৯৮৪-র নভেম্বরে এস আই আরটি এই ইঙ্গিতকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করে। এমনকী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরের প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেই জায়গায় খনন করে প্রাচীন জীবনযাত্রার অনেক নিদর্শন পেয়েছেন। পাওয়া গেছে ২৫০,০০০ বছরের পুরনো পাথরের কুঠার।

প্রথমে কথা ছিল এস আই আর-এর এই গবেষণা শুধু প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যের জন্যই ব্যবহৃত হবে। সেইরকমই বলেছিলেন জেট প্রোপালশন ল্যাবরেটরির অধিকর্তা চার্লস এলাচি। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল এস আই আর থেকে পাওয়া ইমেজারি প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছেও বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে, তখন ঠিক করা হয়েছে '৯১ ও '৯২ সালে এস আই আর-সি, সাহারার ভূ-গর্ভস্থ নদীখাতের মানচিত্র তৈরির জন্য দুটো অনুসন্ধান চালাবে।

বর্তমানে আরও উন্নত মানের যন্ত্রপাতি তৈরি হচ্ছে আরও বিস্ময়কর কাজকর্মের জন্য। সিভার চিন্তা করছেন এমন একটি স্ক্যানারের কথা, যা মাটিতে লুকিয়ে থাকা ফসফেট জাতীয় দূষণকারী পদার্থের হদিস দিতে পারবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সাহায্যে।

অবশ্য এই স্বপ্নের যন্ত্রটি ছাড়াই, সিভারের রিমোট সেন্সিং পদ্ধতিটি উৎসাহীদের নজর কেড়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিনশো ব্যবসায়ী ও শখের প্রত্নতাত্ত্বিক, যাঁরা নোয়ার আর্ক কিংবা মঙ্গলগ্রহে প্রাণিজীবন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে তলিয়ে যাওয়া ডুবোজাহাজের সন্ধানে নামতে বদ্ধপরিকর, সিভারকে অনুরোধ জানিয়েছেন তাঁদের কাজে সাহায্যের জন্য।

সিভার নির্দেশিত নাসা-র এই রিমোট সেন্সিং-এর গবেষণার জন্য বর্তমানে বেছে নেওয়া হয়েছে উত্তর-পূর্ব পেরুর রায়ো অ্যাব্‌সিও প্রদেশ, প্যেসন শিট্‌সের মতে যা পৃথিবীর অন্যতম দুর্লঙ্ঘ্য অঞ্চল। ৩০০০ মিটার উঁচু হিমবাহ উপত্যকা পার হয়ে যেতে হয় এখানে। স্পেনের বিজয়ের পর প্রায় পাঁচশো বছর হতে চলল, মানুষের পা এখানে পড়েনি বললেই চলে।

রায়ো অ্যাব্‌সিও অভিযাত্রী দলের নেতা টম লেনন (বোল্ডার-এ অবস্থিত কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) এখানে রিমোট সেন্সিং পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন অঞ্চলটির একটি বিশদ মানচিত্র তৈরির জন্য। এই অভিযাত্রী দলের উদ্দেশ্য হল ইমেজারির মাধ্যমে ইন্‌কা-পূর্ব যুগের পাথরের রাস্তা, পাথরের বাড়ি এবং পাহাড়ের গায়ে চাষাবাদ সম্পর্কে আরও পরিষ্কারভাবে জানা।

বর্তমানে মিসিসিপির একটি অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউট ফর টেকনোলজি ডিভেলপমেন্ট পরিচালিত স্পেস রিমোট সেন্সিং সেন্টারের প্রত্নতাত্ত্বিক স্কট মার্ডি এই পদ্ধতির সাহায্যে এক-এঞ্জিন বিশিষ্ট একটি 'সেস্না-১৭২' বিমান নিয়ে ফ্রান্সের বার্গান্ডি অঞ্চলের ছবি তুলে চলেছেন সেল্টিক এবং রোমান ধ্বংসাবশেষ খোঁজার আশায়।

এ ছাড়া মার্ডি '৮৪ সালে এস আই আর-বিতে ব্যবহৃত ক্যামেরার সাহায্যে পেরুর উপকূলে প্রচুর ভূ-গর্ভস্থ খাল এবং ইন্‌কা সভ্যতার অন্যান্য নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন।

অবশ্য ঐতিহ্যবাদী শিট্‌স মনে করেন, এই পদ্ধতির ব্যবহার সত্ত্বেও বহু বিপদ এবং অন্যান্য অসুবিধার কথা থেকেই যায়, যেহেতু কাজটা শুধুমাত্র চেয়ারে বসে বোতাম টেপার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। আকাশ থেকে কোনও কিছুর সন্ধান পাওয়ার পর মাটিতে নামতেই হয় তা খুঁড়ে বার করার জন্য। আসল ঝঞ্ঝাট তখনই। যেমন কোস্টারিকায় কাজ করার সময় তাঁকে পিটভাইপারের ছোবল খেতে হয়েছে। ভাগ্য ভাল, বেঁচে উঠেছিলেন সে-যাত্রায়। আর-একবার তাঁরই এক সহকর্মীকে ঘুমের মধ্যে কামড় বসিয়েছিল বিষাক্ত কাঁকড়া বিছে। অর্থাৎ, প্রত্নতত্ত্ব যে শেষ বিচারে খোঁড়াখুঁড়িই, এ-কথা তাই উপেক্ষা করা যায় না।

ফোটো : 'স্প্যান' পত্রিকার সৌজন্যে

কোথায় খুঁজে পাই

শান্তনু চক্রবর্তী

ধাতুর ব্যবহার আদিম মানুষকে এগিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি। 'তারাখসা' থেকে সে পেয়েছিল লোহা, তামার আকরিক থেকে বের করেছিল তামা, পরে তামা-টিনের মিলন ঘটিয়ে তৈরি করেছে ব্রোঞ্জের মতো শক্ত সঙ্কর ধাতুও। প্রয়োজনের তাগিদই মানুষকে চিরকাল ঠেলে দিয়েছে নিত্যনতুন আবিষ্কারের দরজায়—এই ধারা আজও অব্যাহত, কেননা এ স্রোতই সভ্যতার ধর্ম। মৌলিক ধাতু নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সঙ্কর ধাতুর সৃষ্টি ও প্রচলিত সঙ্করগুলির ভৌত ধর্মাবলীর (যেমন তাপ ও চাপ সহ্য করার ক্ষমতা, ঘর্ষণ-জনিত ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা—এইসব) উন্নতি করার নিরলস চেষ্টা সারা বিশ্বের মতো আমাদের দেশেও চলেছে।

কিন্তু ধাতু বা ধাতুর আকর মিলবে কোথায়? মাটির নীচে অন্ধকারে কোথায় যে লুকিয়ে আছে সোনা-রুপো-টিন বা দস্তা-নিকেল-কোবাল্টের মূল্যবান সম্ভার—মানুষ বুঝবে কী করে? কে তার কাছে হদিস পৌঁছে দেবে? যুগে-যুগে মানুষ তাই খুঁজেছে নিশ্চিত কোনও লক্ষণ, যা দেখে মাটির ওপর থেকেই বোঝা যাবে তলায় কী রয়েছে বা থাকতে পারে। কখনও কোনও বিশেষ রঙের মাটি, পাথর বা পাথরের গায়ে ধাতুবাহী শিরার চিহ্ন, কখনও উষ্ণপ্রস্রবণের জলের চরিত্র, কখনও তৈলকূপের সহাবস্থান—আবার কখনও বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের অবস্থিতি, এক-এক জায়গায়

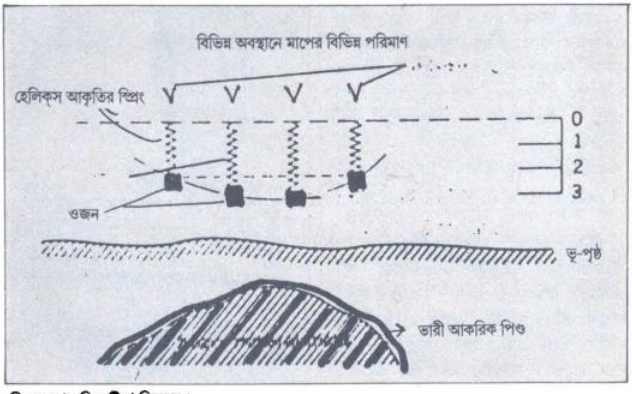

চিত্র ১ ॥ 'গ্রাভিমেট্রিক' বিস্ফোরণ

এক-এক রকম সূত্র ধরে মানুষ মৃত্তিকার রহস্য উন্মোচনে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে।

বিজ্ঞান বা বিশেষরূপ জ্ঞানের ধর্মই এই যে, সহস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে তত্ত্ব বা তথ্য উঠে আসে, তা স্থান-কাল- পাত্র নির্বিশেষে বারংবার সত্য প্রমাণিত হয়। পুনরাবৃত্তিতে তার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়, সন্দেহের অবকাশ ক্রমেই কমে আসে। মাটির তলার সম্পদ-অনুসন্ধানের ব্যাপারেও এ-কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

কেমন করে কী পরিস্থিতিতে মাটির গভীরে এক-একটা বিশেষ ধরনের স্তর গড়ে

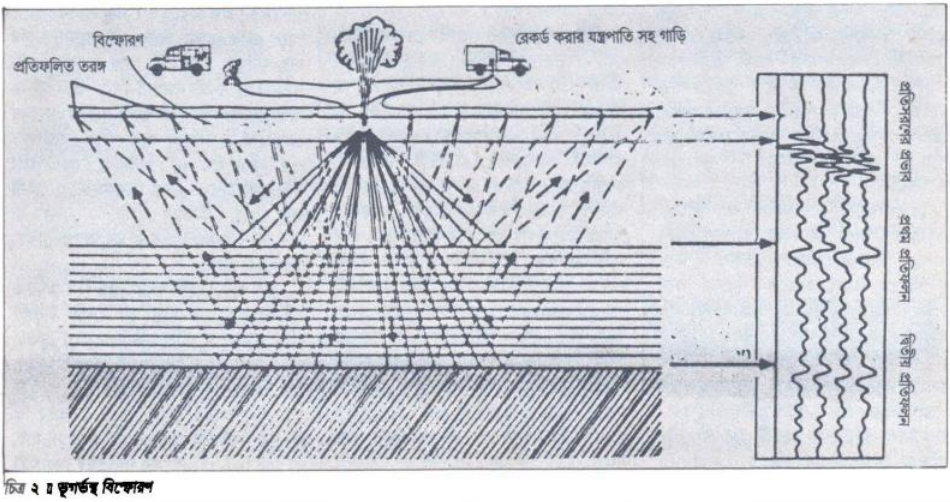

চিত্র ২ ॥ ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণ

ওঠে, কী জাতীয় জীবাশ্ম কী ধরনের স্তর নির্দেশ করে এবং সেই স্তরের বিশেষ ধর্মাবলী কী কী হতে পারে—এই শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে বৈজ্ঞানিকেরা এসব কথাবোঝার চেষ্টা করে অনেকটাই সফল হয়েছেন। প্যালিওজিওগ্রাফি নামে ভূবিজ্ঞানের এই শাখাটির উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে খনিজ সম্পদ অন্বেষণের ব্যাপারে আজকের সভ্যতা এগিয়েছে অনেক দূর। আজ যেসব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে ফলিত ভূবিজ্ঞানীরা মাটির তলায় কোনও বিশেষ ধাতুর আকরিকের অস্তিত্বের কথা বলতে পারছেন তাদের মধ্যে আছে মাধ্যাকর্ষণ, চৌম্বকশক্তি ও তড়িৎ-বিভবের তারতম্য এবং 'শক-ওয়েভ্স'-এর বিস্তার-ধরন (pattern of propagation of Shock-Waves)।

স্থান-বিশেষে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি বা চৌম্বক-শক্তির তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এ-কথা আমাদের জানা। মাধ্যাকর্ষণের শক্তির এই তারতম্য (অর্থাৎ প্রচলিত যে মানটির সঙ্গে আমরা বেশি পরিচিত—তার সঙ্গে প্রভেদ) মাপবার জন্য যে এককটি ব্যবহার, করা হয়, নাম 'মিলিগ্যাল': এককটি বড়ই নগণ্য বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বললে অত্যুক্তি হয় না। অভিকর্ষজ ত্বরণ যদি প্রতি বর্গ সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটারের হাজার ভাগের একভাগ পালটায় তবেই মিলিগ্যালের কাউন্টারে '১' ফুটে উঠবে। ঘটনাটা কাজে লাগে তাঁদের, যাঁরা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে অভিকর্ষ-জরিপের কাজ করেন। যে যন্ত্রটা তাঁরা কাজে লাগান, তার মধ্যে থাকে একটি পেন্ডুলাম-জাতীয় ওজন একটি 'কোয়ার্টস ফিলামেন্ট' বা একটি 'হেলিক্যাল স্প্রিং' থেকে সেটি ঝোলে। চৌম্বক-শক্তি মাপক যে যন্ত্রটির সাহায্যে ভূত্বকের তলার চৌম্বক-পদার্থবাহী স্তরের অস্তিত্ব সহজেই ধরা পড়ে সে-যন্ত্রের নাম 'লোক্যাল ভ্যারিওমিটার'।

বৈজ্ঞানিকদের তূণে আরও অস্ত্র আছে। শুধু মাটির কাছে থেকে নয়, আকাশ থেকে নেওয়া আলোকচিত্রও সাহায্য করে ভূ-প্রকৃতির স্বরূপ জানতে। বিশেষ করে রুক্ষ, দুর্গম, পার্বত্য-এলাকার জন্য এই আকাশ-চিত্র পদ্ধতি বেশ কার্যকর। বিশেষ ধরনের ক্যামেরা (একাধিক লেন্স সমন্বিত) ব্যবহার করে তোলা ছবিকে উপযুক্ত উপায়ে বিশ্লেষণ করে অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হয়। দ্বি-মাত্রিক দৃষ্টিতে যা একটি গর্ত বা খাদ, সালোক-ভূতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে (photo geological methods) ধরা পড়ে

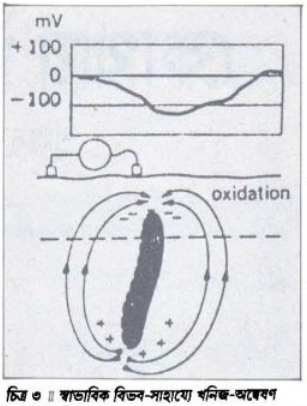

চিত্র ৩ ॥ স্বাভাবিক বিভব-সাহায্যে খনিজ-অন্বেষণ

চিত্র ৪ ॥ আকরিকবাহী স্তরের যথাযথ অবস্থান নির্ণয়

তার গভীর স্তরের কিছু খবর। এই ধরনের নানা উপায়ে, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহারে বাইরে থেকে অনেকটাই জানা যায় মাটির তলার খবর।

তবে ভূ-বিস্ফোরণ পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই ভেতরের খবর জানার জন্য! খনিজ-তেল বা গ্যাসের সন্ধানে এর ব্যাপক ব্যবহার সারা বিশ্বেই বহুল প্রচারিত ও স্বীকৃত। একটা নির্ধারিত পথ বরাবর নির্দিষ্ট কয়েকটি গভীরতায় কয়েকটি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। উদ্দেশ্য অবশ্য অত্যন্ত মহৎ ও শান্তিপূর্ণ! এই বিস্ফোরণের ফলে ভূ-স্তরের বিভিন্ন মহলে যে কম্পন সঞ্চারিত হয়, তার গতি-প্রকৃতি সব দিকে সমান থাকে না। মাটির তলার বিভিন্ন স্তরের কিছু জায়গায় এই 'শক-ওয়েভ্স' বা 'ঘাত-তরঙ্গ' বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয়; আবার বিভিন্ন ঘনত্বের স্তরের মধ্যে দিয়ে কখনও দ্রুত, কখনও ধীর গতিতে চলমান সেই শব্দতরঙ্গ পৃথিবীর ওপরে যন্ত্রের কাছে ফিরে আসে কিছু সময় পরে। প্রতিফলিত তরঙ্গের গতিচ্ছবি ধরা পড়ে যন্ত্রের পরদায়—শব্দ-শক্তি যেখানে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত: সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগের কম্পনও ফুটে ওঠে সেখানে। চিত্র-পরীক্ষক বৈজ্ঞানিকের কাছে যদি আগে থেকেই রাখা থাকে তিন-চার কিলোমিটার গভীরতার মোটামুটি খবর ওই পরদার ভাষাতেই, তা হলে তুলনায় সহজেই তাঁরা বোঝেন নতুন স্তরের উপাদানে কোনও বিশেষত্ব আছে কি না! কেননা অন্যান্য অনেক তরঙ্গের মতো শব্দতরঙ্গও বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন গতিতে চলে, একভাবে নয়।

শুধু শব্দতরঙ্গের প্রবাহ নয়, বিশেষ কোনও আকরিকহীন একটি ভূ-স্তরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে যদি আমরা মান বা reference হিসেবে ধরি, তা হলে তার তুলনায় অন্য একটি স্তরের ভূ তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়বে—বৈদ্যুতিক, চৌম্বক বা তরঙ্গবহন যে-কোনও ক্ষেত্রেই।

আকরিক প্রত্যেক যৌগেরই কিছুটা বিদ্যুৎ-বিভব থাকে। এর ফলে, ধাতব ও অক্সিজেন আয়নের পরিমাণের আনুপাতিক হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় আকরিক স্তরের ওপরে বিভিন্ন জায়গায়। স্তরে উপস্থিত জলেরও সেখানে একটা ভূমিকা আছে, আকরিক যদি 'ইলেকট্রোড' হয় তো জল সেখানে 'ইলেকট্রোলাইট'। বিভব-প্রভেদ মেপেজুখে অঙ্ক কষে বৈজ্ঞানিকরা বলতে পারেন মাটির নীচে ধাতব আকরিকের অস্তিত্ব আছে কি না, বা থাকলে সেটা কতটা আকর্ষক!

এরকম নানা পদ্ধতির সাহায্যেই মাটির তলায় বিশেষ-বিশেষ আকরিক বা খনিজ পদার্থের খোঁজ করা হয়। কিছু পাওয়া যেতে পারে এমন বোঝা গেলে যেটা জানা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, সেটা হল তার অবস্থান। কী গভীরতায়, কতটা জায়গা জুড়ে, কী কৌণিক অবস্থানে আকরিকবাহী স্তরটি রয়েছে এসব না জেনে বা না হিসেব করে খনির খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করা হয় না। কেননা, সেও তো আর-এক জগৎ! ঠিক কীরকমভাবে খোঁড়া শুরু হবে, কীভাবে সেটা এগোবে বা নামবে—এগুলো নির্ভর করবে আগে পাওয়া হিসেবের ওপর।

আর খনি-খননের আগে কিছু নিয়মমাফিক পরীক্ষামূলক গর্ত করে তার থেকে নিদর্শন তুলে ভালমতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নেওয়া হয়। কতটা আকরিকে কতটা 'পদার্থ' মিলবে, তার নিষ্কাশনের পদ্ধতিই বা কী হবে, বা তার খরচ কত পড়বে অর্থাৎ খরচে পোষাবে কি না—এ-সবই যদি আগে থেকে জানা না যায়, তা হলে মাটি খোঁড়ার সব পরিশ্রমই তো মাটি হয়ে যাবে!

আশার দশক নব্বই

গৌতম চক্রবর্তী

গ্যেটে

ঘটনাবহুল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক নব্বই। আবার এই দশক শেষ হলেই শুরু হবে একুশ শতাব্দী। প্রশ্নটা হল, নব্বইয়ের দশক কি নতুন কোনও আশার প্রতীক ? নতুন কোনও প্রজন্মের প্রতীক ? অথবা এ-সব কিছুই না, শুধু এক ধূসর, শীতল ভবিষ্যৎ ?

অন্তত, মানুষের কাছে নব্বই বছর বয়সটা তাই। মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকা এক ধূসর, হিমশীতল সময়। বিংশ শতাব্দীর এই নব্বই বছর বয়সটাও কি সেরকম ?

ঠিক তখনই মনে পড়ল আশির দশকে ছিল 'ওয়েস্টল্যান্ড'-এর কবি টি এস এলিয়ট-এর জন্মশতবার্ষিকী। আর নব্বই দশকের মাঝামাঝি আসছে 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-এর লেখক অলডাস হাক্সলের শতবার্ষিকী ! আশির দশক থেকে নব্বই দশকের পার্থক্যটাও কি ততখানি ? একফালি 'পোড়োজমি' থেকে সাহসী এক নতুন পৃথিবী ?

না কি, এসব কিছুই না, শুধুই এক প্রতীকী ব্যঞ্জনা !

নব্বই যুদ্ধের দশক, নব্বই তারুণ্যের দশক, নব্বই কবিতার দশক !

১৭৯১ সালে ভ্যালেন্স শহরে লেফটেন্যান্ট হয়ে এসেছিলেন ২২ বছরের এক ছোটখাটো যুবক। তারপর গোটা নব্বই দশক ধরে একের পর এক উল্কার মতন সে সমস্ত যুদ্ধ জয় করেছে, ১৭৯৯-তেই সে হয়ে গেছে ফ্রান্সের কনসাল। নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ত।

১৭৯৯ সালেই একচল্লিশ বছর বয়সী জার্মান রাজপুরুষ ভন উলফগ্যাং গ্যেটে প্রকাশ করেছিলেন এক নতুন মহাকাব্য, 'ফাউস্ট আ ফ্র্যাগমেন্ট' !

১৮৯০-এর দশকের শুরু থেকে লন্ডনবাসী, ৩৯ বছরের প্রতিভাবান এক আইরিশ ভদ্রলোক ভাবতে শুরু করেছিলেন, না, এভাবে আর হয় না ! অ্যাদ্দিন তো স্রেফ নাট্যসমালোচনা করলাম, এবার নিজে বরং নাটক লিখে দেখি।

সেই নব্বই-এর দশকেই ঘটেছিল নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ'র আত্মপ্রকাশ !

তাই প্রশ্নটা আবার নতুন করে ভাবতে হয়। ১৭৯০-এর প্রতীক যদি হয় নেপোলিয়নের যুদ্ধ বা গ্যেটের মহাকাব্য, ১৮৯০-এর প্রতীক যদি হয় নিৎসের দর্শন বা বার্নার্ড শ'র নাটক, ১৯৯০-এর প্রতীক তা হলে কী ? এই দশকের নতুন আশা, ভরসা কারা ? কারা হবে এই দশকের চঞ্চল, উদ্দাম, কৈশোরের প্রতীক ?

ফেলেআসা ষাটের দশক যদি হয় বিটপ্রজন্মের যুগ, সত্তর দশকের প্রতিবাদী তারুণ্য যদি হয় 'হিপি'দের যুগ, বিবর্ণ আশির দশক যদি হয় 'পাঙ্ক'দের যুগ, নব্বই দশকের কিশোর-কিশোরীরা তা হলে তাদের নতুন প্রতীক, নতুন রং, নতুন সাজ হিসেবে নতুন কী গ্রহণ করবে ?

নব্বই-এর প্রতীক কি 'প্রেটি বেবি' ব্রুক শিল্ড্স ? না কি 'টপ গান' টম ক্রুস ? নাকি, শেষ অবধি সবাইকে ছাড়িয়ে যাবেন 'লাইক আ প্রেয়ার' মাডোনা ?

এই ১৯৯০-এ ডাচ শিল্পী ভ্যান গঘ-এর মৃত্যুশতবার্ষিকী। মৃত্যুকে হার মানিয়ে ভ্যান গঘ আজও বেঁচে আছেন তাঁর ছবিতে। মৃত্যুকে জয় করার দশক এই নব্বই।

ফ্রেডরিখ ফরসাইথ বা সিডনি শেলডনের আধিপত্য শেষ হয়ে গিয়ে নব্বই দশকের নতুন সাহিত্যের প্রতীক কি এই মুহূর্তের কিশোর-কিশোরীদের কাছে তুমুল জনপ্রিয় হার্ভার্ডের 'ক্লাস' এরিখ সেগাল ? নাকি, নাইজিরিয়ার উলে সোয়েঙ্কা ? নাকি, সবার চেয়ে আলাদা হয়ে থাকবেন লাতিন আমেরিকার 'শতবর্ষের নিঃসঙ্গতা' পরিবৃত সেই পরিচিত গেব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ !

নব্বই-এর প্রারম্ভে, পৃথিবী আজ শুধু অপেক্ষায় উন্মুখ !

গ্যেটে শুধুমাত্র মহাকবি নন, তিনি জীবনের কবি। অশুভ শক্তির প্রতীক 'মেফিস্টোফিলিস' শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল সাধারণ মানুষ ফাউস্ট-এর কাছে। শয়তান কিনতে পারেনি ফাউস্টের আত্মা। ফস্টাস হলেন অদম্য মনুষ্যত্বের প্রতীক। ১৭৯০-এর সীমা ছাড়িয়ে তাই আজও বেঁচে আছেন ফাউস্ট, আজও বেঁচে আছেন গ্যেটে। বেঁচে আছে মানুষ ও মনুষ্যত্ব।

টম ক্রুস

"গ্রেগরি পেক না শন কোনারি ?"

"না ,নব্বই-এর দশকে ওরা দুজনেই তো রীতিমত পুরনো। ওল্ড লেজেন্ড।"

"এখনকার নতুন ছেলেমেয়েরা কেউ অভিনয় জানে না। অথচ হলিউড একসময়

কী দারুণ সব অভিনেতা দিয়েছে।"

"কেন ? টম ক্রুস ! ১৯৯০ সালে তো ওর বয়স পুরোপুরি ত্রিশও পূর্ণ হচ্ছে না।"

হ্যাঁ, নব্বই-এর দশকের তরুণ নায়ক হল টম ক্রুস। 'টপ গান' ছবির সেই দুর্ধর্ষ ফাইটার প্লেনের পাইলট পিট মিশেল। মার্টিন স্ক্রোজ-এর ছবি 'কালার অব মানি'র ভিনসেন্ট। অস্কারপ্রাপ্ত 'রেইনম্যান'-এ ডাস্টিন হফম্যানের সঙ্গে সহনায়ক। 'ওয়াল স্ট্রিট' আর 'প্লেটুন' ছবির পরিচালক অলিভার স্টোন-এর নতুন ছবি 'বর্ন অন দা ফোর্থ অব জুলাই'-এর নায়ক রন কোভিক।

পৃথিবীর যেসব গম্ভীর, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি অনবরত বলেন, আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'ডেডিকেশন' জিনিসটার বড় অভাব, নব্বই-এর তরুণ প্রজন্মের হয়ে টম ক্রুস ! তাঁদের যোগ্য উত্তর দিতে পারে। 'টপ গান' ছবিতে ফাইটার প্লেনের পাইলটের ভূমিকায় অভিনয় করার আগে টম সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে নিউ ইয়র্কের এনজেলস ফ্লাইং ক্লাবে শারীরিক কসরত শিক্ষা করে গেছে। 'বর্ন অন দা ফোর্থ অব জুলাই'তে অভিনয়ের আগে ফিলিপিন্সে গিয়ে পুরো দশ দিন সুকঠিন ভিয়েতনামী স্টাইলে শারীরিক কসরত করেছে, হুইলচেয়ারে বসা অভ্যাস করেছে, দিনের পর দিন আসল রন কোভিকের সঙ্গে কথা বলেছে।

রন কোভিক চরিত্রটি রীতিমত রক্তমাংসের বাস্তব চরিত্র। ১৯৬৭ সালে সে মার্কিন নৌবাহিনীর হয়ে ভিয়েতনাম যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং যুদ্ধে আহত হয়ে সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। না, দেশে ফিরে কোভিক স্রেফ হুইলচেয়ারে বসে জীবন কাটিয়ে দেয়নি, যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে সে হয়ে ওঠে একজন প্রথম সারির নেতা। এই বাস্তব রন কোভিকের জীবন নিয়েই অলিভার স্টোনের ছবি।

এই বয়সেই টম ক্রুস প্রতিটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য দাবি করে ত্রিশ লক্ষ ডলার। কিন্তু, এই ছবিতে সে একটি পয়সাও নেয়নি, বলেছে ছবি থেকে যদি লাভ হয়, তা হলেই যেন তাকে একটা লভ্যাংশ দেওয়া হয়। না হলে কিছুই লাগবে না !

নব্বই-এর তরুণ টম ক্রুস অর্থলোভী বৃদ্ধ নয়। সে শুধু তারুণ্যের প্রতীক নয়, নায়কোচিত বীরত্ব এবং কর্মনিষ্ঠার প্রতীক।

ছবির প্রথমাংশে দেখা যায় যুদ্ধবাজ কোভিককে। মেরিন ক্রু-কাট চুলের ছাঁট দেওয়া পরিচিত টম ক্রুস। শেষাংশে সে হুইলচেয়ারে বসে থাকা চল্লিশ বছর বয়সের কোভিক। তার কোমর থেকে পা অবধি পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট, পরনে বেলবটম জিন্স আর নোংরা খাকি শার্ট। এলোমেলো, লম্বা চুল। তার প্রতিজ্ঞা পৃথিবী থেকে যুদ্ধ শেষ করতে হবে।

এই ছবিতে অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে টম সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছে,"আমার মনে হয়েছিল ওই সময়ের চেতনাটাকেই ধরা আসল ব্যাপার। রন কোভিকদের সেই স্পিরিটটাকেই আমি ধরতে চেয়েছিলাম।"

অভিনয় থেকে অবসর নিয়ে হলিউডের আর এক যুদ্ধবিরোধী অভিনেত্রী জেন ফন্ডা আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে 'ওল্ড লেজেণ্ড' !

নব্বই দশকের কিশোর-কিশোরীদের কাছে তাই স্পিরিট একটাই, 'টপ গান' টম ক্রুস !

'ম্যান্ডোলিন' শ্রীনিবাস

উপ্পালাপু শ্রীনিবাস

ওর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এবার হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। পৃথিবীর অপাপবিদ্ধ আরও অনেক কিশোর-কিশোরীর মতো এই ছেলেটিও ব্রুস লি-র ছবি দেখতে ভালবাসে, আচির কমিক্স পড়ে মুগ্ধ হয়ে যায়, এক বাক্স চকোলেট উপহার পেলে খুশি হয়।

তবু, সে অন্য সবার চেয়ে আলাদা ! মাত্র আঠারো বছর বয়সে মেক্সিকোর বিখ্যাত সাভাতিনো উৎসবে সে অংশ নিয়েছিল। ম্যান্ডোলিন বাজিয়েছিল।

সাভাতিনো উৎসব সেবার উদ্বোধন করতে এসেছিলেন মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতির স্ত্রী পালোমা। এবং, সব রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রীরা সচরাচর যা করেন, পালোমাও তাই করতে চেয়েছিলেন ! উদ্বোধনী-প্রদীপটি জ্বালিয়ে, মাত্র দশ মিনিট বসে তিনি চলে যাবেন। ফার্স্ট লেডির পক্ষে কোনও এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকা সম্ভব নয় !

তবু, পালোমা বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। ওই ভারতীয় ছেলেটির হাতের ম্যান্ডোলিন তাঁকে বসে থাকতে বাধ্য করেছিল। ছেলেটি ম্যান্ডোলিনে কর্ণাটকী সঙ্গীত বাজাচ্ছিল। "চমৎকার", উচ্ছ্বসিত পালোমা পরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, "কর্ণাটকী সঙ্গীত তো দূরের কথা, আমি জীবনে কোনও ভারতীয় রাগ-রাগিণীই শুনিনি ! তবু, কেমন যেন মোহমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেটা সত্যিই জিনিয়াস ! চাইল্ড-প্রডিজি !"

সে এই ভারতেরই ছেলে। ম্যান্ডোলিন আর ম্যাজিক ওর হাতে একাকার হয়ে গেছে। একটা ছোট্ট ম্যান্ডোলিন নিয়েই সে ম্যাজিক দেখিয়েছে, ঝড় তুলেছে, সারা পৃথিবীর লোককে মুগ্ধ করে ফেলেছে। ওর নাম উপ্পালাপু শ্রীনিবাস।

উপ্পালাপু শ্রীনিবাসের জন্ম অন্ধ্রপ্রদেশের পালাকোল শহরে। সঙ্গীত ওর রক্তে। ওর ঠাকুর্দা সীমাচলম বাজাতেন নাদস্বরম যন্ত্র। বাবা উপ্পালাপু সত্যনারায়ণ কর্ণাটকের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম দিকপাল সুব্বারাজুর শিষ্য। 'সরস্বতী সঙ্গীত দল' নামে সত্যনারায়ণের একটি লঘুসঙ্গীতের

মাডোনা

কৈশোর তীব্র অভিমানী ! অন্তত, ১৯৫৯ সালের ১৬ অগস্ট ডেট্রয়েটে মাডোনা লুইসি সিসোনে নামে যে মেয়েটি জন্মেছিল, সে অল্পেই তীব্র অভিমানী হয়ে উঠত। মিশিগান স্কুলের মাস্টারমশাই রোজ বিরক্ত হতেন, রোজ ধমক দিতেন।

আর মাডোনা লুইসি সিসোনে নামের মেয়েটি রোজ সেই এক অপরাধ করত। ঠোঁটে এক ইঞ্চি পুরু লিপস্টিক লাগাত, স্কুলে ইউনিফর্মের বদলে ঝকমকে রঙিন জামা গায়ে দিয়ে আসত।

দল আছে। এই দলটি সারা বছর বিজয়ওয়াড়া, নেলোর ইত্যাদি স্থানে ঘুরে বেড়ায় ও সঙ্গীত শুনিয়ে থাকে।

বাড়ি ফিরে সত্যনারায়ণ একদিন আচমকা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। ছ'বছরের শ্রীনিবাস তার ম্যান্ডোলিন নিয়ে বাজাচ্ছে। শ্রীনিবাসের কোনও সঙ্গীত-শিক্ষক নেই, শুধুমাত্র শুনে শুনেই সে ম্যান্ডোলিনে বেশ কিছু রাগ তুলে ফেলেছে!

পুত্রের প্রতিভাকে চিনতে সত্যনারায়ণ বিন্দুমাত্র দেরি করেননি। পরের দিনই শ্রীনিবাসকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর গুরু সুব্বারাজুর কাছে। কণাটিকী রাগ সাধারণত বীণা আর নাদস্বরম যন্ত্রে সঙ্গত করা হয়। ম্যান্ডোলিন ইতালির বাদ্যযন্ত্র। ওতে নেপল্‌স-এর লোকসঙ্গীত বাজানো হত। সুব্বারাজু তাঁর এই বালক ছাত্রটিকে সেদিন বলেছিলেন, "কিন্তু আমি সঙ্গীতের কোনও দেশী বা বিদেশী দেওয়াল তোলায় বিশ্বাসী নই। এখন তো বীণা আর বাঁশিতেও রাগাশ্রয়ী সুরের সঙ্গত করা হয়। বাঁশি, বীণা দু'টোই বিদেশী যন্ত্র! আসল হল, তোমার মনটাকে মীড় আর গমকের মূর্ছনায় বেঁধে ফেলা!'

সুব্বারাজুর শিষ্যত্বে শ্রীনিবাস সত্যি-সত্যিই মনটাকে সুরের মূর্ছনায় বেঁধে ফেলেছিল। ন'বছর বয়সে গুরিভারা শহরে ওর প্রথম পাবলিক শো! ১৯৮২-তে ইন্ডিয়ান ফাইন আর্টস সোসাইটি'তে বাজানোর পরে সে রীতিমত প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃত। শ্রীনিবাসের বয়স তখন মাত্র তেরো! কী আশ্চর্য ওই তেরো বছর

ভীমসেন যোশির সঙ্গে শ্রীনিবাস

বয়সেই মোজার্ট তাঁর প্রথম অপেরা প্রযোজনা করেছিলেন।

বিশ বছরের শ্রীনিবাস ওর তেরো বছর বয়সটাকে পিছনে ফেলে এসেছে। ফেলে এসেছে ওর টিন-এজকে। ফেলে এসেছে অনেক...অনেক অভিজ্ঞতা! ১৯৮৩-তে পশ্চিম বার্লিনের জ্যাজ উৎসবে ম্যান্ডোলিনে ওই কণাটিকী সঙ্গীত বাজিয়েই সে সবাইকে যন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছে, ১৯৮৯ সালে লন্ডনে ভারতীয় বিদ্যাভবনের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ম্যান্ডোলিন বাজিয়েছে রবিশঙ্কর, বালমুরলি কৃষ্ণ-র সঙ্গে!

উপ্পালাপু শ্রীনিবাস এখনও বাড়িতে ওর গুরু সুব্বারাজুর সঙ্গে দৈনিক পাঁচ থেকে ছ' ঘণ্টা সঙ্গত করে। ওর প্রশ্ন, "সঙ্গীতের কি শেষ আছে? যত শেখা যায়, তত বেশি শেখার আগ্রহ বেড়ে যায়। আমি ম্যান্ডোলিন আরও শিখতে চাই।"

তাই, মাত্র বিশ বছর বয়সেই একাকার হয়ে গেছে ম্যান্ডোলিন আর উপ্পালাপু শ্রীনিবাস। 'ম্যান্ডোলিন' শ্রীনিবাস বলেই ওকে সবাই আদর করে ডাকে।

স্কুলের পোশাককে তার কেমন যেন বিবর্ণ, ফ্যাকাসে মনে হয়। রঙিন জামা গায়ে দিলে কী এমন অপরাধ হবে? মা সবসময় বলতেন, যিশুখ্রিস্টকে ভালবাসবি, ভাল মেয়ে হবি। সে এসবের কিছুই হবে না! মা তাকে ছেড়ে চলে গেল কেন?

মাডোনার বয়স যখন মাত্র ছয়, তখনই ক্যান্সারে তার মায়ের মৃত্যু হয়। ছ' ভাইবোনের মধ্যে সেই সবচেয়ে বড়। বয়স পুরো আট হতে না হতেই মাডোনা দেখল বাড়িতে বিমাতার আবির্ভাব! অভিমানিনী মেয়েটি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছে, সে তার মা'র কোনও কথাই রাখবে না। আর একটু বড় হলেই সে বাড়ি থেকে পালাবে!

১৯ বছর বয়সে মাডোনা লুইসি সিসোনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এল নিউ ইয়র্কে। পকেটে মাত্র ৩৫ ডলার। আলভিন অ্যালে কোম্পানিতে সে নাচবে।

না, ক্ষুধার্ত মাডোনা লুইসি সিসোনে আলভিন অ্যালেতে বিন্দুমাত্র নাচের প্রতিভা দেখাতে পারেনি। গোপনে গোপনে সে প্রায়ই খাবারের হোটেলের ডাস্টবিনগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে, যদি কোথাও একটা পটেটো চিপ্‌স বা হ্যামবার্গারের টুকরো খুঁজে পাওয়া যায়! তার খুব খিদে পায়, কিন্তু পয়সা নেই যে ...

হ্যামবার্গারের খোঁজে ডাস্টবিনে টু মারা আজ মনে হয় এক অবিশ্বাস্য গল্প। সেই মাডোনা লুইসি সিসোনে হারিয়ে গেছে।

১৯৮৩-তে বার হওয়া লুইসি সিসোনের গানের প্রথম অ্যালবাম বিক্রি হয়েছিল ছ' মিলিয়নেরও ওপর।

লুইসি সিসোনের দ্বিতীয় অ্যালবাম 'লাইক আ ভার্জিন' বিক্রি হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষেরও ওপর। গত বছর বার-হওয়া লুইসি সিসোনের অ্যালবাম 'লাইক আ প্রেয়ার' এখনও তুমুল বিতর্কিত। ১৭টা পর-পর 'টপ টেন' হিট করার রেকর্ড একজনেরই দখলে— লুইসি সিসোনে।

ডাস্টবিন-খোঁজা লুইসি সিসোনের মালিবু সৈকত স্প্যানিশ দুর্গের মতো বাড়িটাই আজ প্রায় ৫০ একর বাগানে ঘেরা।

লুইসি সিসোনে নামটা হারিয়ে গিয়ে আজ পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত শুধু একটাই নাম, মাডোনা।

শুধু গান শোনার জন্য নয়, রুপোলি পরদাতেও সারা পৃথিবী আজ তাকে দেখতে উন্মুখ। 'ডেসপারেটলি সিকিং সুসান' আর 'সাংহাই সারপ্রাইজ' সেই জনপ্রিয়তার প্রমাণ।

নব্বই দশকের তরুণ-তরুণীরা মাডোনার মতোই আত্মবিশ্বাসী ও স্পষ্টবাদী। মাডোনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি কি মেরিলিন মনরোকে নকল করেন? আত্মবিশ্বাসী মাডোনা জবাব দিয়েছিলেন, "মেরিলিন শেষ অবধি ভিকটিম হয়েছিল। আমি হব না। আমি জানি আমি কী চাই, আর তার জন্য কী করতে হবে!'

বার্ধক্য ইতস্তত করে, গড়িমসি করে। তারুণ্য স্পষ্টভাবে জানায়, সে কী চায়! মাডোনা নব্বইয়ের সেই নতুন তারুণ্যের প্রতীক।

শান্ত, নিরীহ এক মহিলা শেষ অবধি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তিনি সুসানের মতোই এক বেপরোয়া, উদ্দাম, অ্যাডভেঞ্চারময় জীবন যাপন করবেন। ডেসপারেটলি সিকিং সুসানের মাডোনা প্রাণচঞ্চল, উদাম জীবনের প্রতীক।

বাস্তব মাডোনা কখনও 'গ্রামি' পুরস্কার পাননি। জিজ্ঞেস করায় হেসে বলেছেন, "পেলে ভালই লাগবে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় না আমি কিছু হারিয়েছি। আমি পুরস্কারের ভক্ত নই, জীবনের ভক্ত।"

না, জীবনবোধে বিশ্বাসী মাডোনার কিশোর-কিশোরী ভক্তরা নীতিসর্বস্ব আগের প্রজন্মের প্রতি গেয়ে উঠতেই পারে, 'পাপা, ডোন্ট প্রিচ।'

নব্বই দশকের প্রায় প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে আজ পৃথিবীর সব কিশোর, তরুণের মনের কথা

এরিখ সেগাল

বার্নের মুমূর্ষু বাবার কাছ থেকে পিঠ ফিরিয়ে নিয়েছিল এক ডাক্তার ! ক্ষুব্ধ বার্নে কাঁদেনি, প্রতিজ্ঞা করেছিল সে ডাক্তার হবে। মানুষের সেবা করবে।

সারা পৃথিবীতে নিশ্চয় অনেক বার্নে আছে। অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে তাকে রক্তমাংসের এক জীবন্ত চরিত্র করে তুলেছেন এরিখ সেগাল তাঁর সাম্প্রতিকতম 'ডক্টরস' উপন্যাসে।

জেসন গিলবার্টকে তার বাবা সর্বদাই বলতেন, "তোমার পরিচয় কী হবে ?" জেসনের পরিচয় হওয়া উচিত একটাই— সে আমেরিকান। ভুলে যাওয়া উচিত সে ইহুদি।

আমেরিকান আইডেন্টিটি নিয়ে যে জেসন গিলবার্ট বাঁচতে চেয়েছিল, সে মারা গেল ইজরায়েলের একটা শিশু-স্কুল বা কিডবাট্জকে বাঁচাতে গিয়ে। ড্যানিয়েল রোসি পিয়ানোতে অসাধারণ এক সুরসৃষ্টি করেছিল, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর বুদ্ধিজীবী সংগীত-সমালোচক লিখেছিলেন জঘন্য ! পাগলের প্রলাপ। তারপর ড্যানিয়েল রোসি যখন হতাশায় ভুগতে ভুগতে কিছু চটুল সুরসৃষ্টি করেছিল, সেই সমালোচকরাই লিখেছিলেন অসাধারণ ! অ্যাল্ডু এলিয়ট কোনও বিপ্লব করতে চায় না, মহৎ সৃষ্টি করতে চায় না, তার আপ্তবাক্য একটাই, 'আই হ্যাভ নো অ্যাম্বিশন !'

বাস্তবে রয়েছে প্রচুর জেসন গিলবার্ট, ড্যানিয়েল রোসি কিংবা অ্যাল্ডু এলিয়ট ! এরা রক্তমাংসের চরিত্র হয়ে উঠেছে এরিখের 'ক্লাস' উপন্যাসে।

'ম্যান, ওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড', 'ক্লাস', 'অলিভার', 'ডক্টরস' এরিখ সেগালের সব উপন্যাসই গত কয়েক বছর ধরে জনপ্রিয়তার এভারেস্টে বসে আছে। অন্তত, তিন থেকে সাড়ে তিন লক্ষ মিলিয়ন তাঁর এক একটি বইয়ের বিক্রি ! 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় ১৭ সপ্তাহেরও বেশি বেস্ট-সেলার লিস্টে এরা জ্বলজ্বল করে।

এরিখ সেগালের জনপ্রিয়তা অন্তত একটি তথ্য প্রমাণ করে। সাহিত্য বড় না সাংবাদিকতা বড় এই তর্কের অবসান আজ ঘটে গেছে। যে সাংবাদিকতা টিকে থাকে, সেটাই সাহিত্য ! এরিখের উপন্যাসে তাই চরিত্র হয়ে বারবার ফিরে আসে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধ, ইজরায়েলের যুদ্ধ, রেগনের নির্বাচন !

ব্রুক শিল্ড্স

সৌন্দর্য ও স্মার্টনেস-এর জন্য কি বংশগতির বিশেষ কোনও 'জিন' থাকে ? ব্রুকির ক্ষেত্রে অন্তত ছিল। ওঁর ঠাকুর্দা ফ্রান্সিস শিল্ড্স ছিলেন টেনিস খেলোয়াড়, ঠাকুমা মারিনা তালেরিনা ছিলেন রোমের রাজকন্যা।

ব্রুক শিল্ড্স

১৯৯০ সালের ৩১ মে 'ব্রুকি' বা ক্রিস্টা ব্রুক ক্যামিলি শিল্ড্স-এর বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হবে। বাস্তবতার খাতিরে বলতেই হবে, ব্রুক শিল্ড্স এখন আর 'প্রেটি বেবি' নন, বরং জীবন্ত এক 'চার্মিং লেডি' !

শুধু মাডোনোর গান শোনার জন্য নয়, রুপোলি পরদাতেও সারা পৃথিবী তাকে দেখার জন্য উন্মুখ। মাডোনার গান যতবার 'টপ টেন' তালিকায় স্থান পেয়েছে তা রীতিমত একটা রেকর্ড।

মাডোনা

বার্নার্ড শ, যাঁর জনপ্রিয়তা এখনও বিন্দুমাত্র কমেনি

তাঁর একটি নাট্যসংকলনের নাম 'প্লেজ আনপ্লেজেন্ট'। সত্য সর্বদাই অস্বস্তিকর, আনপ্লেজেন্ট ! তবু ফেবিয়ান সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জর্জ বার্নার্ডশ' সত্য কথা বলতে কখনওই পিছপা হননি।

তবু, প্রেটি বেবি শব্দটার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে ব্রুক শিল্ড্স-এর নিষ্পাপ সারল্যে-ভরা কিশোরী মুখ। শুধু রুপোলি পরদায় নয়, বাস্তব জীবনেও। সিনেমা থেকে অবসর নেওয়ার পর এককালের বিখ্যাত অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বো 'মুভি' শব্দটাই সহ্য করতে পারতেন না, এমনকী, নিজের অভিনীত চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও একেবারে 'স্পিকটি নট' হয়ে থাকতেন। ষাটের দশকেও কোনও ডিনার-পার্টিতে গ্রেটা গার্বো সঙ্গে কেউ সিনেমা-বিষয়ক কথা বলার চেষ্টা করলে গ্রেটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সেখান থেকে বিদায় নিতেন।

নিউ ইয়র্কের ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে এ-হেন রহস্যময়ী গ্রেটা গার্বোও একদিন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। প্যারাম্বুলেটরে বসে খিলখিল করে হাসছে একটি বাচ্চা মেয়ে। এরকম অদ্ভুত সুন্দর মুখ সচরাচর চোখেই পড়ে না ! নিজস্ব রহস্যের দেওয়াল ভেঙে গ্রেটা নিজেই এগিয়ে গিয়েছিলেন, মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়েছিলেন।

বাচ্চা মেয়েটি ওই ফিফটি সেকেন্ড স্ট্রিট নিবাসী ফ্রাঙ্ক শিল্ড্স ও টেরি শিল্ড্স-এর কন্যা। টেনিস-খেলোয়াড় ফ্রান্সিস শিল্ড্স ও রাজকন্যা মারিনার নাতনি।

সারল্যে-ভরা সেই কচি, নিষ্পাপ মুখ শুধু গ্রেটা গার্বোকেই মুগ্ধ করেনি, ক্যামারাম্যান ফ্রান্সিসকো স্ক্যাভুলোও মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরই তৈরি একটা সাবান কোম্পানির অ্যাড-ফিল্মে 'ব্রুকি'র প্রথম মডেলিং। তার বয়স তখন মাত্র এগারো মাস। দ্বিতীয় মডেলিং ১৮ মাস বয়সে। চার বছরেই ব্রুকি নিউ ইয়র্কের লেডিজ হোম জার্নালের 'কভার-গার্ল'। দশ বছর বয়সেই কলগেট মডেল। বারো বছর বয়সেই, মানহাটানের নিউ লিঙ্কন স্কুলের এই ছাত্রীটির বার্ষিক আয় ত্রিশ হাজার ডলার।

লুই মালের প্রেটি বেবি ছবির কিশোরী নায়িকা ভায়োলেটের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অডিশন দিতে এসেছিল তিনশো প্রায় মেয়ে। শিকে ছিঁড়ল একজনের ভাগ্যে— ১৩ বছর বয়সী ব্রুকি !

আশির দশকের গোড়ায় মুক্তি পেয়েছিল 'ব্লু লেগুন'। কিছুদিন পরে এসেছিল 'এন্ডলেস লাভ' আর 'সাহারা' ! তিনটি ছবিই গত দশকে প্রমাণ করে দিয়েছিল পৃথিবীতে কিশোরী-নক্ষত্র একটিই ! তার নাম জুডি ফস্টার বা টাটুম ও'নিল নয়— ব্রুকি ! ব্রুক শিল্ড্স !

জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন 'নাইন্টিন এইট্টি ফোর'। আর, অলডাস হাক্সলে লিখেছেন 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'। ১৯৯৪ সালে হাক্সলের জন্মশতবার্ষিকী। সাহসে-ভরা নতুন এক পৃথিবীর প্রতীক তিনি।

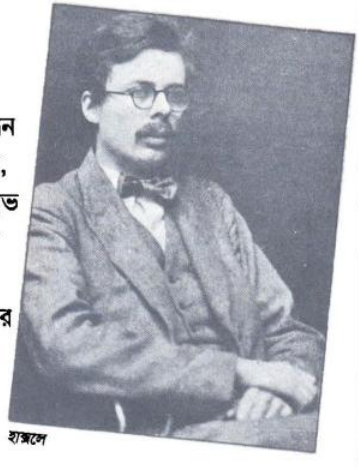

হাক্সলে

ক্যারাটে থেকে পপ গানের আসরে

গুরদাস মান

ক্যারাটের আঙিনা থেকে টিভির স্টুডিও—শুনতে অনেকটা দূর হলেও আসলে কিন্তু এই দূরত্বটা একজনের কছে কোনও সমস্যাই সৃষ্টি করেনি। তিনি হলেন গুরদাস মান। প্রায় অসম্ভব এই ব্যাপারটাই সম্ভব হয়েছে বর্তমানে দিল্লির বাসিন্দা এই পঞ্জাবি তরুণটির জীবনে। আজ দেশ-বিদেশ উত্তাল যাঁর পঞ্জাবি লোকসঙ্গীতের স্পর্শমাখা পপ গান আর নৃত্যের ছন্দে, সেই ছেলেটি কিন্তু কখনও কোনওদিন নিয়মমাফিক গানের তালিম নেননি কারও কাছে। নিজের আনন্দে নিজেই গাইতেন পঞ্জাবি লোকসঙ্গীত নিজের স্কুল-কলেজ। জন্মভূমি পঞ্জাবের ফরিদকোট জেলার গিদিরভা। গিদিরভার মানুষ আস্তে আস্তে ভালবেসে ফেললেন তাঁর গান। শুরু হল স্কুল-কলেজের বাইরে বিভিন্ন জলসায় গান গাওয়া। লেখাপড়া বন্ধ হয়নি কিন্তু। গুরুদাস তাঁর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিলেন শারীরশিক্ষায়! কিছুদিনের মধ্যেই ক্যারাটের ব্ল্যাকবেল্ট খেতাবটিও অর্জিত হল! এত সবের মধ্যেও গান চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। জলসায় গান গাইতে-গাইতেই একদিন চোখে পড়ে গেলেন হিজ মাস্টার্স ভয়েস কর্তৃপক্ষের। ডাক এল দূরদর্শনেও। গুরদাস গাইলেন কিছুদিন আগে এইচ এম ভি'র জন্য 'মামলা গড়বড় হ্যায়' নামক অ্যালবামে রেকর্ড-করা একটি গান 'দিল দা মামলা'। রাতারাতি সারা ভারতে এবং বিদেশেও বিখ্যাত হয়ে গেলেন গুরদাস মান।

মাঝে কিছুদিন পঞ্জাব স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি করলেও এখন গানই তাঁর সব সময়ের পেশা। দিল্লির প্রাক্তন রাজ্য হকি খেলোয়াড় মনজিৎ তাঁর স্ত্রী।

গুরদাস নিজেই লেখেন তাঁর বিভিন্ন গান। তাঁর দাদাও গীতিকার। তবে দাদার সাহায্য দরকার হয় না তাঁর। অবশ্য তাঁর পরিবার বরাবরই তাঁকে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন গানের ব্যাপারে। নিজেই পরিকল্পনা করেছেন দূরদর্শনে তাঁর সাম্প্রতিক 'পপ টাইম' অনুষ্ঠানের।

অবশ্য এ-ব্যাপারে এইচ এম ভি সাহায্য করেছে তাঁকে। গুরদাসের গানের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব, পঞ্জাবি লোকগীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য পপ ছন্দের দুর্দান্ত মিশেল। তিনি জানিয়েছেন, "এই মিশ্রণ ঘটেছে সম্পূর্ণ নিজে থেকেই, কারও প্রভাবে নয়।" এ-পর্যন্ত তাঁর যেসব অ্যালবাম বেরিয়েছে তার মধ্যে 'মামলা গড়বড় হ্যায়', দিল সাফ হোনা চাহিদা', 'মস্তি', 'গীতৌ ভরিপেটারি', 'পীর তেরে জান দি', 'আঁখিয়া উড়িক ভিয়াঁ' উল্লেখযোগ্য।

মজার কথা, গুরদাসের মতে, শারীরশিক্ষা ও খেলাধুলোর জন্যই তিনি এত সহজে নাচতে পারেন। নাচ তাঁর অনুষ্ঠানকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তোলে। তরুণ গুরদাস মান নব্বই-এর দশকে যে আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

জয়ন্তী সেন

শুধুই অভিনয়? মানহাটানের লেনক্স স্কুল, নিউ লিঙ্কন স্কুল, এঙ্গেলউডের ডয়েট স্কুল সর্বত্রই পড়াশোনায় প্রথম দশটি নামের একটি— ব্রুকি! অভিনয়ের বাইরে, ব্রুকির ভাল লাগে ঘোড়ায় চড়তে আর 'শপিং' করতে। লুকিয়ে লুকিয়ে সে কবিতাও লেখে। অন্তত, তার কবিতার একটি ছোট্ট বই প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশ করেছেন তার মা টেরি শিল্ড্স!

নব্বই দশকে নিশ্চয় অনেক স্কুলের ছাত্রীরাই পড়াশোনা, নাচ, গান, খেলাধুলো সব দিকেই উড়ন্ত তুবড়ির মতো রোশনি ছড়িয়ে দেবে। তাদের প্রতীক একটাই— ব্রুকি!

নব্বই-এর দশকে নিশ্চয় আরও অনেক অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় কিশোরী তরুণী পৌঁছে যাবে এভারেস্টের চূড়োয়, পাড়ি দেবে সাহারা মরুভূমি, চলে যাবে অ্যান্টার্কটিকা। তাদের প্রতীক একটাই! মাথায় হলুদরঙা হ্যাট আর পরনে ব্রিচেস, সেই 'সাহারা' ছবির 'সাহারা'র ছদ্মবেশী নায়িকা—ব্রুকি!

পৃথিবীর অগণিত স্কুল-ছাত্রীর কাছে তাই নব্বই দশকের অন্যতম প্রতীক: প্রেটি-বেবি ব্রুক শিল্ড্স!

শেষ কথা

নব্বই দশকে হয়তো চারদিক দিয়েই দেখা যাবে আরও অনেক নতুন প্রতিভার ফুলঝুরি!

তবু যে পৃথিবীতে যুদ্ধ হয়, দুর্ভিক্ষে ক্ষুধার্ত শিশুর মৃত্যু হয় সেই পৃথিবীকে নিয়ে কি এত আশা করা উচিত? নব্বইয়ে নিশ্চয় কোনও না কোনও দিকে হতাশাও দেখা দিতে পারে। নব্বইয়ের দশকে হয়তো দেখা দিতে পারে নতুন কোনও সমস্যা উত্তাল হয়ে উঠতে পারে আমাদের এই পৃথিবী।

উত্তর একটাই! পৃথিবী ধ্বংস হবে কি না, তা মানুষের হাতে। আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কিছু মানুষকে নিয়ে আলোচনা করেছি। আশা করা যায়, উজ্জ্বল, অনুজ্জ্বল পৃথিবীর সব মানুষেরই নব্বই দশকে, অভিজ্ঞতার নিরিখে অন্তত নতুন কিছু করার ইচ্ছে হবে।

এবং আশা ছাড়তে আমরা রাজি নই। কারণ নব্বইয়ের দশকের আর একটা অন্তর্লীন অর্থ আছে!

২০০০ সাল আসতে আর মাত্র দশ বছর বাকি!

বিজ্ঞান: নব্বইয়ের দশকে

পথিক গুহ

বিংশ শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞানের গবেষণা আজ অনেকাংশে খরচের মুখাপেক্ষী। সব কিছুতেই প্রয়োজন বিপুল আয়োজন। চাই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বিশেষত মৌলিক গবেষণায়। তাই সমালোচনা সব জায়গায়। প্রশ্ন একটাই : কোনটা গ্রহণযোগ্য—মৌলিক গবেষণা না কি আশু জনকল্যাণ উপযোগী বিজ্ঞান। এ-বিতর্কে ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর জানালেন, উনি মৌলিক গবেষণার দিকে। বললেন, খরচের দোহাই দিয়ে গবেষণাকে ঠেলে রাখা বোকামি।

ভাবা যায়? একটাই মেশিন। লম্বায় পঁচাশি কিলোমিটার। তৈরি করতে লোক লাগবে সাড়ে চার হাজার। খরচ হবে দশ হাজার কোটি টাকা। কলকব্জা থাকবে অগুনতি। কেবল শক্তিশালী চুম্বকই হাজার-দশেক। তার প্রত্যেকটায় বিদ্যুতের তার বত্রিশ কিলোমিটার করে।

যন্ত্রটাকে চালু রাখতে এঞ্জিনিয়ার লাগবে আড়াই হাজার। বিশেষজ্ঞ থাকবেন ছ'শো। বিজলি খরচ হবে আড়াইশো মেগাওয়াট। তরল হিলিয়াম চাই পাঁচ লক্ষ গ্যালন। তরল নাইট্রোজেন আড়াই লক্ষ গ্যালন। জলও চাই মুহুর্মুহু। মিনিটে আড়াই হাজার গ্যালন।

যন্ত্রটার নাম? সুপারকন্ডাকটিং সুপার কোলাইডার। সংক্ষেপে এস এস সি। আপাতত তৈরি হচ্ছে আমেরিকার টেক্সাসে। উদ্দেশ্য মোটরগাড়ি কিংবা রকেট তৈরি নয়। যুদ্ধের জন্য বোমা-টোমাও নয়। নেহাতই বৈজ্ঞানিক গবেষণা। তাই এত আয়োজন। ব্যস্ততা। তৈরি হচ্ছে মানুষের হাতে-গড়া আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মেশিন। আগামীদিনে বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে সাধের যন্ত্র। ওর সাহায্য নেবেন সারা পৃথিবীর গবেষকরা। বাদ থাকবেন না ভারতের বিজ্ঞানীরাও। কারণ মহার্ঘ ওই মেশিন আসলে এক কষ্টিপাথর। ওখানে যাচাই হবে বিজ্ঞানের বাঘা-বাঘা সব তত্ত্ব। চোখ বুজে এখনই বলে দেওয়া যায় পেল্লায় ওই যন্ত্র এঁকে-ওঁকে পাইয়ে দেবে নোবেল প্রাইজ। সুতরাং, নব্বই-এর দশকে বিজ্ঞানীকুলের দৃষ্টি নিশ্চিত নিবদ্ধ থাকবে টেক্সাসের ওই অতিকায় মেশিনের দিকে।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার বোধহয় এইটেই যে, এত ব্যাপক আয়োজন, এত সমারোহ (খরচের দিকে যার তুলনা কেবল চাঁদে মানুষ পাঠানোর রাজসূয় যজ্ঞ—অ্যাপোলো প্রকল্প) যাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য তার ওজন এক মিলিগ্রামের ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ভাগেরও কম! আর আয়ুষ্কাল এক সেকেণ্ডের ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ ভাগের কাছাকাছি! ওইটুকু সময়ের জন্য ক্ষুদ্র সব কণা তৈরি হবে সুপার কোলাইডারে। অন্তত বিজ্ঞানীদের তাই হিসেব। বোঝাই যাচ্ছে এ বড় সাঙ্ঘাতিক মেশিন। কিন্তু কেন এমন মেশিন তৈরি হচ্ছে? আমাদের কোন্ কাজে আসবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ওইসব কণা? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার দিকে। জানতে হবে কোলাইডারের কাজ।

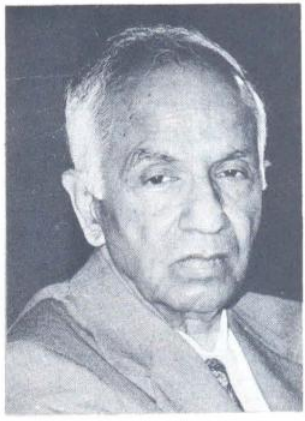

চন্দ্রশেখর : বিগ সায়েন্স মানেই কি বিলাসিতা?

কোলাইডারের আর এক নাম অ্যাকসিলারেটর। কারণ, এতে বিভিন্ন ধরনের কণার স্রোতকে দীর্ঘপথ ছুটিয়ে নিয়ে (খেলনা গাড়িকে যেভাবে মেঝেয় ঘষে নেওয়া হয় দৌড়নোর আগে) তাপের বেগ বাড়িয়ে। অর্থাৎ অ্যাকসিলারেট করিয়ে প্রায় আলোর গতির (সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার) কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

প্রচণ্ড বেগে ধাবমান দু'রকম কণার স্রোতকে দু'দিক থেকে এনে ছেড়ে দেওয়া হয় মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য। এক কণা অন্যের সঙ্গে এভাবে ঠোকাঠুকি (কোলাইড) করায় কণারা নিজেরা হয় চূর্ণবিচূর্ণ। পাওয়া যায় অকল্পনীয় তেজ বা শক্তি। আর সেই তেজ থেকে জন্ম নেয় নতুন-নতুন কণা। যারা সংঘর্ষকারী কণাদের থেকে আলাদা। তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বে এরকম একটা কথা আমাদের শুনিয়েছিলেন আইনস্টাইন। বলেছিলেন, পদার্থ আর শক্তি আসলে একই জিনিসের দুই রূপ। একটা পালটে যেতে পারে অন্যটায়। পদার্থকে ভাঙিয়ে পাওয়া যেতে পারে তেজ (আলো, তাপ); আর তেজ পুঞ্জীভূত হয়ে তৈরি হতে পারে পদার্থ। ঠিক এইটেই ঘটে কোলাইডারে। প্রচণ্ড তাপ আর জ্যোতি তৈরি করে নতুন নতুন পদার্থ-কণা। এদিক থেকে কোলাইডারের কাজ অ্যাটমিক রিঅ্যাকটর বা পারমাণবিক চুল্লির একেবারে উলটো। রিঅ্যাকটরে জ্বলানি ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামকে আঘাত করা হয় নিউট্রন-কণা দিয়ে। ধাক্কায় ভেঙে

যায় তারা। পাওয়া যায় যেসব ভগ্নাংশ তাদের মোট ওজন ওই ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের থেকে কম। তা হলে সেই কমতি পদার্থটা গেল কোথায় ? হাওয়ায় উবে তো যেতে পারে না ! আসলে ওই পরিমাণ পদার্থই রূপ পালটে জন্ম দেয় প্রচণ্ড তাপের। সেই তাপে ফোটানো হয় জল। পাওয়া যায় বাষ্প। ঘোরে টারবাইন। আমরা পাই বিদ্যুৎ। অর্থাৎ, কোলাইডারে শক্তি থেকে পদার্থ। আর রিঅ্যাকটরে পদার্থ থেকে শক্তি।

বিজ্ঞানীদের কাছে কিন্তু কোলাইডারের আর একটা পরিচয়। আর সেইটেই নাকি বড়। ওঁরা মনে করেন অ্যাকসিলারেটর হল 'টাইম মেশিন'। কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীর সেই যন্ত্র যার সাহায্যে ঝাঁপ দেওয়া যায় অতীতে। কেমন করে ? পদার্থের সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কণার খোঁজে বেরিয়ে। ব্যাখ্যাটা বেশ মজার। আমাদের চারপাশের এই বিপুল বস্তুরাজি— এই বাড়িঘর, গাছপালা, চেয়ার-টেবিল, এই আনন্দমেলার পাতা কিংবা আমাদের মাথার চুল, পায়ের নখ—এসব কী দিয়ে তৈরি ? এমনকী, কোন পদার্থ আছে যা এই সবকিছুর উপকরণ ? এরকম প্রশ্ন প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে মানুষকে ভাবিয়েছে বহুকাল। ক্ষিতি (মাটি), অপ্ (জল), তেজ (আগুন), মরুৎ (বিদ্যুৎ) আর ব্যোম (শূন্য) —এই পাঁচ উপকরণে তৈরি বিশ্বের তাবৎ বস্তু। ভারতীয় ঋষিদের ছিল এরকম বিশ্বাস। প্রায় একইরকম মত পোষণ করতেন প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকেরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের একাধিক তাকলাগানো আবিষ্কার ভেঙে চুরমার করে দিল ওইসব ভাবনা। দেখা গেল, যে-কোনও পদার্থ তৈরি তার পরমাণু (এরকম একটা কণার ধারণা অবশ্য প্রচলিত ছিল গ্রিসেও) দিয়ে। লোহা তৈরি লোহার পরমাণু দিয়ে, সিসা সিসার। এই পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা। কিন্তু পরে দেখা গেল পরমাণুকেও ভেঙে ফেলা যায়। পৌঁছনো যায় আরও সূক্ষ্মতর কণায়। তাদের নাম প্রোটন, ইলেকট্রন আর নিউট্রন। এরাই মিলেমিশে তৈরি করছে বিভিন্ন পদার্থের পরমাণু। তখন ফের প্রশ্ন এরাও কি তৈরি আরও ছোট কণা দিয়ে ? প্রোটন বা নিউট্রনের ওজন এক মিলিগ্রামের ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০-০,০০০ ভাগেরও কম ইলেকট্রনের আবার তার চেয়েও কম। ওদের ওজনের ১৮৩৬ ভাগের এক ভাগ ! তা ওরা যতই ছোট হোক, বিজ্ঞানীদের হিসেব বলে দিল ওরা অবিভাজ্য নয়, এরা তৈরি আরও সূক্ষ্ম অন্যান্য কণা দিয়ে। কোয়ার্ক, লেপটন বা বোসন (আমাদের বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামানুসারে)—এইরকম সব কণার নাম।

মুশকিল হল ইলেকট্রন, প্রোটন কিংবা নিউট্রনকে যত সহজে গবেষণাগারে পাওয়া যায় তত সহজে ওই কোয়ার্ক, লেপটন বা বোসন পাওয়ার কোনও আশা নেই। ওরা তৈরি হয় প্রচণ্ড তাপ আর তেজের মধ্য দিয়ে। ঠিক এমনটাই বলেছিলেন বিজ্ঞানীরা—যাঁরা প্রথম মনে মনে কল্পনা করেছিলেন ওদের অস্তিত্ব। ওঁরা বলেছিলেন, আজ যে ওসব কণা পাওয়া যায় না তার কারণ ওরা হারিয়ে গেছে। ওদের দেখা মিলেছিল কেবল বিশ্বসৃষ্টির ব্রাহ্মমুহূর্তে—আজ থেকে পনেরোশো কোটি বছর আগে। সেই যখন এক মহাবিস্ফোরণে আবির্ভূত হয়েছিল বিশ্বসৃষ্টির উপাদান। তখন কোথায় সূর্য, কোথায় পৃথিবী, আর কোথায় বা এইসব গাছপালা, মানুষজন। চারদিকে কেবল অকল্পনীয় তাপ আর চাপ। যা হাজার কোটি সূর্যের একত্রিত তেজপুঞ্জকেও হার মানায়। তারই মাঝে চকিত চমকে উঁকি দিয়েছিল কোয়ার্ক-লেপটন-বোসনেরা। উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল শূন্যে। তাই ওদের ফিরে পেতে হলে আমাদের প্রথমে তৈরি করতে হবে সেই ব্রাহ্মমুহূর্তের পরিবেশ। কৃত্রিমভাবে। না হলে এমনিতে তো আর সেই সন্ধিক্ষণে ফেরবার উপায় নেই। সেই সুদূর অতীতে আমাদের নিয়ে যেতে পারে যন্ত্রই। ১৯৮৭ সালে ইউরোপের বিজ্ঞানীরা মেশিনে দু'রকম কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে তৈরি করেছিলেন ওরকম অকল্পনীয় অতীত। মহাবিশ্বের জন্মলগ্নের পর এক সেকেন্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়কালের পরিবেশ। আর তাতেই নাকি ধরা দিয়েছিল কোয়ার্ক। চোখে নয়, যন্ত্রে। কারণ যার আয়ুষ্কাল এক সেকেন্ডের একশো কোটি ভাগের একভাগ সময়,তাকে ধরা কি মানুষের কাজ ? এজন্যই নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী কার্লো রুবিয়া (যিনি পুরস্কৃত হয়েছেন কোলাইডারে কাজকর্মের সুবাদে) বলেছেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে যেমন দূরবিন, জীববিজ্ঞানীর কাছে যেমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, আমাদের কাছে তেমনিই অ্যাকসিলারেটর।"

প্রায় ষাট বছর আগে এরকম টাইম মেশিন-এর নকশা তৈরি করেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী আর্নেস্ট লরেন্স। তারপর তৈরি হল কত যন্ত্র ইউরোপ এবং আমেরিকায় একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। কে পারে অন্যের চেয়ে শক্তিশালী মেশিন বানাতে ! কে পারে বেশি জোরে সংঘর্ষ ঘটিয়ে বেশি তাপ আর চাপ সৃষ্টি করতে ? মেশিন যত জোরদার, সময়-ফেরিতে সওয়ারি হয়ে ততই বেশি পেছনে যাওয়া এবং ততই বেশি ক্ষুদ্র কণার সন্ধান পাওয়া। জেনিভার কাছে ফ্রান্স আর সুইজারল্যান্ডের সীমানায় জুরা পর্বতমালা। তার নীচে মাটির তলায় ১০০ মিটার গভীরে ২৭ কিলোমিটার লম্বা টানেল জুড়ে তৈরি হয়েছে এক কোলাইডার। খরচ লেগেছে বাবোশো কোটি টাকা। শুধু মাটি কেটে ফেলতে হয়েছে চোদ্দ লক্ষ ঘনমিটার। বসানো হয়েছে পেল্লায় এক-একটা যন্ত্রাংশ। ওদের একটা বানাতে যা ইস্পাত লেগেছিল তা দিয়ে গোটা কতক আইফেল টাওয়ার তৈরি হয়ে যায়। একার পক্ষে সম্ভব নয় বলে ইউরোপের একাধিক দেশ মিলে তৈরি করেছে ওই কোলাইডার। ওখানে কাজ করেই নাকি সম্প্রতি হদিস মিলেছে কিছু বোসন-কণার। অবশ্য একই সময়ে একই কৃতিত্বের দাবি জানিয়ে বসে আছেন আমেরিকায় স্ট্যানফোর্ডের আর-এক অ্যাকসিলারেটরের কিছু বিজ্ঞানী। এখন চলেছে তর্ক। কে আগে পেয়েছে অভীষ্ট কণা ? তর্কটা হালকা নয়। মীমাংসার সঙ্গে ঝুলে আছে নোবেল প্রাইজটা। ছিঁড়ে কার ভাগ্যে কে জানে !

ক্ষমতার দিক থেকে স্ট্যানফোর্ডের অ্যাকসিলারেটর কিন্তু ইউরোপের কোলাইডারের কাছে শিশু। ইউরোপে কাজ করে এর আগে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন কয়েকজন। তখন মার্কিন বিজ্ঞানীরা তাই আওয়াজ তুলেছিলেন, ইউরোপকে টেক্কা দেওয়ার মেশিন চাই। সুপার কোলাইডার নাকি হবে তাই। অনেক, অনেক বড়—এখনকার মেশিনগুলোর থেকে। উদ্দেশ্য,বিশ্বসৃষ্টির আরও কাছে (যেন সেকেন্ডের লক্ষ কোটি ভাগ কাছাকাছি সময়ও যথেষ্ট নয় !) পৌঁছনো। মাটির নীচে অতিকায় মেশিন বসানোর কাজের অর্ডার বের করতে আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে জোর লড়াই চলেছিল। প্রথমে ২৭টা থেকে শেষে দাবিদার হয় সাতটা রাজ্য। অ্যারিজোনা, কলোরাডো, ইলিনয়, মিশিগান, টেক্সাস, টেনেসি আর নর্থ ক্যারোলাইনা। প্রায় নিলাম হাঁকার মতো কাড়াকাড়ি। শেষমেশ অর্ডার বগলদাবা করে টেক্সাস।

শুরু হয়েছে খোঁড়াখুঁড়ি। কাজ শেষ হবে পঁচানব্বই সালে। এরই মাঝে উলটো গাইতে শুরু করেছেন অনেকে। কী দরকার ছিল এই পাহাড়প্রমাণ খরচ ? এর ফলে কি অর্থাভাবে ধুঁকবে না বিজ্ঞানের অন্য গবেষণা ? বিলাসিতার অভিযোগে দমছেন না বিজ্ঞানীরা। বলছেন "দ্য বিগার, দ্য বেটার।"

মানবদেহ, না খেলনা !

বিগ সায়েন্স মানেই কি বিলাসিতা ?

প্রশ্নটা ক'দিন আগে করলেন ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী কলকাতায় এসেছিলেন বক্তৃতা দিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে ভাষণ শেষে কথা বলছিলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। একজন প্রশ্ন করেছিলেন, বিজ্ঞানের আধুনিক বিতর্কের বিষয়ে। বিংশ শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞানের গবেষণা আজ অনেকাংশে খরচের মুখাপেক্ষী। সবকিছুতেই প্রয়োজন বিপুল আয়োজন, চাই রাশি-রাশি টাকা। বিশেষত মৌলিক গবেষণায়। তাই সমালোচনা সব জায়গায়। প্রশ্ন একটাই : কোনটা গ্রহণযোগ্য—মৌলিক গবেষণা নাকি আশু জনকল্যাণ-উপযোগী বিজ্ঞান। এ বিতর্কে ডঃ সুব্রহ্মণ্যম জানালেন, উনি মৌলিক গবেষণার দিকে। বললেন, খরচের দোহাই দিয়ে গবেষণাকে ঠেলে রাখা বোকামি। কারণ আজকের গবেষণাই কালকের ওষুধ হয়ে আসে।

চমৎকার মন্তব্য। উদাহরণ দেওয়া যাক। জীববিজ্ঞানে নব্বই-এর দশকের সবচেয়ে বড় যে কাজ তাকেও ইতিমধ্যে মোকাবিলা করতে হচ্ছে বিলাসিতার অভিযোগ। কী সে কাজ ? হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট। বাংলা পরিভাষা করা মুশকিল। বরং ব্যাখ্যা করা যাক প্রকল্পটা।

একজন মানুষের দেহে রয়েছে প্রায় ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০ জীবকোষ। এসব কোষের (অবশ্য লোহিতকণিকা কোষ ছাড়া) মাঝখানে রয়েছে নিউক্লিয়াস। এই নিউক্লিয়াসে বসবাস সরু সুতোর মতো লম্বাটে ক্রোমোজমের। এদের সংখ্যা ৪৬-টা। সবক'টাকে একটার পর একটা দাঁড় করালে পুরোটা লম্বায় হবে প্রায় দেড় মিটার। কিন্তু সেই সুতোটা মোটা হবে এক মিলিমিটারের ৮,০০০,০০০,০০০ ভাগের একভাগ মাত্র। এই ক্রোমোজম তৈরি বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ পদার্থ দিয়ে। কয়েকটি যৌগের পারস্পরিক অবস্থান একসঙ্গে নিয়ে ধরা হয় এক-একটি ইউনিট। এই ইউনিটগুলোকে বলা হয় 'জিন'।

মোটামুটিভাবে একটা ক্রোমোজমে থাকে প্রায় লাখখানেক জিন। জিনোম হল সারা শরীরের সমস্ত জিন। আমরা জানি মানুষের

কাজটা দুরূহ। একে তো জিন অগুনতি। একটা-একটা করে তাদের চেনা ! সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সন্ধান ! বিজ্ঞানীদের হিসেব, চিনে উঠতে পারলে সব শুধু পাশাপাশি লিখতে গেলেই দরকার হবে দশ লক্ষ পৃষ্ঠার একটা বই ! তবে, একবার যদি চিনে ফেলা যায় তা হলে আখেরে লাভ অনেক।

ডি এন এ : কম্পিউটার যেভাবে দেখে

জীবনে ওই জিন কী সাঙ্ঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটা কোষ কী করবে না করবে তা ঠিক করে তার জিন। চুলের একটা কোষ বিভাজনের পর যে আর-একটা চুলেরই কোষ তৈরি করে, দাঁতের নয়, তাও ওই চুলের কোষে বসে থাকা জিনের হুকুমে। শুধু তাই নয়, মানুষের রোগভোগ, দৈহিক গুণাবলী (লম্বা-বেঁটে, রোগা-মোটা, ফরসা-কালো) এমনকী বুদ্ধিবৃত্তিও—কেউ খেলোয়াড় হবেন না গাইয়ে) নাকি ওই জিনই নিয়ন্ত্রণ করে। এ হেন জিনের কান্ডকারখানা আয়ত্ত করার বাসনা বিজ্ঞানীদের বহুকালের। এজন্য দরকার পৃথিবীর মানুষের দেহে যতরকম জিন থাকা সম্ভব তার সবক'টাকে প্রথমে চিনে নেওয়া। ঠিক এই কাজটাই জিনোম প্রজেক্টের লক্ষ্য। (কাজটা দুরূহ। একে তো জিন অগুনতি। একটা-একটা করে তাদের চেনা ! সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সন্ধান ! বিজ্ঞানীদের হিসেব, চিনে উঠতে পারলে সবক'টা শুধু পাশাপাশি লিখতে গেলেই দরকার হবে দশ লক্ষ পৃষ্ঠার একটা বইয়ের।) তবে, একবার যদি চিনে ফেলা যায় তা হলে আখেরে লাভ অনেক। কারণ ডাক্তারি করে জিনকে বদলে ফেলার কৌশল অনেকটা রপ্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা। সেই কৌশলে খারাপ বা দুষ্ট জিনকে পালটে ফেলা যাবে সহজে। থাকবে না অসুখবিসুখ। মানুষ তার শরীরটাকে তৈরি করবে খেলনার মতো, ইচ্ছেমতো যাকে যাতে সারিয়ে নেওয়া যায়।

কিন্তু খরচ ? হ্যাঁ, এখনকার হিসেবেই ৫০,০০০,০০০,০০০,০০০ টাকা ! আর সময় ? তা-ও অনেক দিন। প্রায় তিরিশ বছর। কোনও একটা দেশের কাজ নয়। তাই ওই প্রজেক্টের অধিকর্তা ডঃ জেমস ওয়াটসন (যিনি ক্রোমোজমের অংশ ডি এন এ-র আকৃতি সঠিক বাতলে দেওয়ার জন্য ১৯৫৩-তে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ফ্রানসিস ক্রিক-এর সঙ্গে) বারবার আবেদন জানাচ্ছেন পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীদের, "আসুন, কাজে হাত দিই সবাই মিলে।" নব্বই-এর দশকে জিনোম প্রজেক্টের কাজ মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

ঈশ্বর কি পাশা খেলেন

প্রজাপতি দেখেছ ? যার পাখায় পাখায় রামধনু রং। আর তার কী বাহার ! ওই বাহারি রঙের দিকে তাকিয়েই বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন তাঁর সদ্য-প্রকাশিত বই ইনফাইনিট ইন অল ডিরেকশনস-এ লিখেছেন, "বুঝতে পারছি প্রকৃতির কল্পনাশক্তির কাছে আমরা কোথায় !" সত্যিই তাই। কে যেন বলেছিলেন, স্পেস শাট্‌ল বানিয়েও কিন্তু আমরা একটা বিষয় বুঝে উঠতে পারিনি এখনও, পাখিদের গগনবিহার। খাঁটি কথা। কী সহজে ওদের ডানামেলা। কত সাবলীল ! ওপর-নীচ কিংবা ডাইনে-বাঁয়ে কত সহজে ওদের ভেসে বেড়ানো। জেট প্লেন কি কখনও পারবে ওইরকম করে উড়তে ? প্রকৃতির সঙ্গে প্রচেষ্টার, বাস্তবের সঙ্গে বিজ্ঞানের এখানেই তফাত। একের বৈচিত্র্যের কাছে অন্যের বিচারজ্ঞান বড় অসহায়। অনেকের মতে এই অসহায়তাকে জয় করার নামই সভ্যতা।

মনে পড়ছে আর-একটা গল্প। গল্প নয়, ইতিহাস। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকের। অণুপরমাণুর গবেষণা নিয়ে তখন চলেছে ধুন্ধুমার কাণ্ড, তর্ক-বিতর্ক আর তাতে জড়িয়ে পড়েছেন আইনস্টাইন স্বয়ং। আপেক্ষিকতার প্রবক্তা, বিজ্ঞানীকুলের নমস্য। বিজ্ঞানচর্চা যাঁর কাছে ছিল একটা নির্দিষ্ট দর্শন। বিশ্বাস করতেন, আবিষ্কার মানে প্রকৃতির ওই অপার বৈচিত্র্যের রহস্য উদ্ঘাটন। পূর্বসূরী নিউটনের মতোই নিজেও মনে করতেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে নীতি ও নিয়মে। ওই নীতিই আসলে প্রকৃতির মনের কথা। বিজ্ঞানীর কাজ ওই নীতি বা সূত্রগুলোকে খুঁজে পাওয়া। নীতিই একমাত্র সত্য এবং তা যে একেবারে অলঙ্ঘ্য, অর্থাৎ প্রকৃতিরও ক্ষমতা নেই তাকে অমান্য করার, এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল ওঁর মনে যে উনি বলতেন, "আমি জানতে চাই একটা কথাই। চাইলেই ঈশ্বর পারতেন কি বিশ্বটাকে অন্য ভাবে গড়তে ?" অর্থাৎ, ওঁর মতে বিশ্বপিতাও নিয়মের দাস। এই ব্রহ্মাণ্ডের, গ্রহ-নক্ষত্রের আজ যা অবস্থা তা হয়েছে কতগুলো নিয়মের বশে সব-কিছু থাকার দরুন। নিয়মের এই মহিমায় মুগ্ধ ছিলেন নিউটনও। যিনি প্রমাণ করেছিলেন সূর্যের টান পৃথিবীর প্রতি আর পৃথিবীর টান গাছের আপেলের ওপর, এ-দুটো একই বলের ক্রিয়া। অর্থাৎ, স্বর্গে আর মর্ত্যে একই নিয়মের রাজত্ব। নিউটনও বিশ্বাস করতেন নিয়ম বা সূত্রগুলো জানলে ব্যাখ্যা করা সম্ভব পৃথিবীর তাবৎ ক্রিয়া। শুধু ব্যাখ্যা নয়, সম্ভব আগেভাগে অনেক-কিছু বলে দেওয়াও। আকাশে বুধ গ্রহ একশো বছর পরে কোথায় থাকবে তা বলে দেওয়া যায় আজই শুধু সূত্র প্রয়োগ করে, অঙ্ক কষে। পঞ্জিকায় অমাবস্যা-পূর্ণিমার পূর্বাভাস দেওয়া হয় ওই অঙ্ক কষেই। বিজ্ঞানের এই পূর্বনির্ধারণক্ষমতা বড় রকমের ধাক্কা খায় পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার গবেষণায়। দেখা যায়, পরমাণু বা তার উপাদান কণিকারা নিউটন-আইনস্টাইনের নীতিনিয়ম তোয়াক্কা করে না তেমন। তাদের গতি কিংবা অবস্থানের হদিস তাই আগেভাগে দেওয়া শক্ত। নিউটন বেঁচে থাকলে কী বলতেন জানি না, কিন্তু তাঁর মতানুসারী আইনস্টাইন রীতিমত ব্যথিত হন পরমাণুকণার আচার-ব্যবহারে। ওসব ব্যাখ্যা করার জন্য এগিয়ে আসেন যাঁরা তাঁরা প্রথমেই যে কাজটি করেন তা হল ওই নির্ধারণক্ষমতাকে নস্যাৎ করা। আর এতে চটে যান আইনস্টাইন। শোনা যায়, ওঁর বিপক্ষ দলের বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্নকে এক চিঠিতে উনি লেখেন, "তোমরা বিশ্বাস করো এমন এক ঈশ্বরে, যিনি পাশা খেলেন। আর আমি আস্থা রাখি নীতি ও নিয়মে।"

ঈশ্বরের পাশা খেলা ? হ্যাঁ, ক্ষুব্ধ আইনস্টাইন চমৎকার ব্যাখ্যা করেছিলেন সংঘাতটাকে পাশার প্রতীকে। পাশার দানের কি পূর্বাভাস সম্ভব ? কোনওভাবে কি বলা যায় কত পড়বে চালে ? দুই না চার, তিন না ছয় ? বাস্তব যদি এতই জটিল আর দুর্বোধ থাকে তা হলে আর বিজ্ঞান চর্চায় কী লাভ ? "হায়, আগে জানলে জুতো পালিশ করতাম কিংবা ভাটিখানার বেয়ারা হতাম," লিখেছিলেন আইনস্টাইন। উনি বেঁচে থাকলে এখন আরও কী বলতেন জানি না। তবে এটা ঠিক, বেশ কিছুদিন ধরে বিজ্ঞানীরা এমন একটা বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন যা বিস্মিত করত আইনস্টাইনকেও। কারণ, অনেকটা ওইপাশা খেলার কাছাকাছি। নাম 'ক্যাওস'। একটু ব্যাখ্যা করা যাক। ফিরে আসা যাক ফরাসি গণিতজ্ঞ হেনরি পয়েঁকারের বক্তব্যে।

মহাকর্ষের প্রভাব তিনটে নক্ষত্র একে অন্যের ওপর ফেললে তাদের অবস্থান কখন কীভাবে বদলাবে তা হিসেব করতে বসেছিলেন তিনি। দেখেছিলেন গণনা ক্রমশই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। হিসেব এতটাই কঠিন হচ্ছে যে, শুধুমাত্র নিউটনের সূত্র যেখানে যথেষ্ট নয়। আর-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। নেওয়া হোক একটা পেণ্ডুলাম। অর্থাৎ, সিলিং-এ একটা আংটা থেকে ঝোলানো একটা লোহার বল। এই বলটা একদিকে একটু টেনে ছেড়ে দিলে বিজ্ঞানের নিয়মে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো এদিক-ওদিক দুলতে থাকবে। পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম বলছে এই মুহূর্তে পেণ্ডুলামের অবস্থান ও গতিবেগ জানা থাকলে পাঁচ মিনিট পরে বলটার অবস্থান কী হবে তা এখনই বলে দেওয়া যায়। এবারে একটু খোদকারি করা যাক। পেণ্ডুলামের নীচে ঘরের মেঝেয় দু' দিকে দুটো চুম্বক বসিয়ে রাখা হোক। দেখা যাবে পেণ্ডুলামের দোলন আর সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুবর্তী নেই। থাকবে কী করে ? বলটা যখন যে চুম্বকের কাছাকাছি এগোচ্ছে সে তখন তাকে ক্রমশ বেশি করে টানছে। এদিকে পেছনে টানছে অন্য চুম্বকটা। শ্যাম-রাখি-না- কুল-রাখি করে পেণ্ডুলামের অবস্থা কাহিল। তাই তার গতিও গোলমেলে। এই বিশৃঙ্খলারই ইংরেজি পরিভাষা, 'ক্যাওস'। বাংলায় কী বলা যায় একে ? গোলমাল ? না, মানাচ্ছে না। সে তুলনায় 'বিশৃঙ্খলা' শোনায় ভাল।

এই বিশৃঙ্খলাকেই এবার বুঝতে চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ, ওঁরা দেখেছেন আমাদের চারপাশে শৃঙ্খলার চেয়ে বিশৃঙ্খলাই বেশি। সুতরাং এটাকে বুঝতে পারলে সহজ হবে অনেক কিছু। যেমন আবহাওয়ার মেজাজ-মর্জি। চাপ, তাপ, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, চাঁদের কিংবা সূর্যের আকর্ষণ—সব-কিছু মিলে বাতাস আর মেঘ নিয়ে কেমন লোফালুফি খেলে ! এসবের মাঝে শৃঙ্খলা কোথায় ? বিশৃঙ্খলা বুঝলে হয়তো সম্ভব হবে আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া। সুতরাং, নব্বই-এর দশক, ক্যাওস নিয়ে বিস্তর মাথাঘামানো অবশ্যই দেখতে হবে তোমায়।

খানিকটা প্রমাণ পেলাম এবার লন্ডনে। মেট্রো রেলের প্রত্যেকটা স্টেশনে, এসকালেটরের গায়ে সিনেমা কিংবা খাবারের বিজ্ঞাপনের পাশে বিশাল হোর্ডিং। অবাক হলাম। রাস্তায় বইয়ের বিজ্ঞাপন। তাও আবার বিজ্ঞানের ! বইয়ের প্রচ্ছদের ক্লো-আপ। ক্যাওস : মেকিং অব এ নিউ সায়েন্স। লেখক বিজ্ঞানী জেমস্ গ্লিক। গ্লিকের মতো ক্যাওস নিয়ে বই লিখেছেন আরও অনেকে। গণিতজ্ঞ ইয়ান স্টুয়ার্ট-এর 'ডাজ গড প্লে ডাইস ?' দেখলাম বইয়ের স্টলে থরে-থরে। মনে-মনে বললাম, 'ক্যাওস, তুমি এসে গেছ।'

উদাসী রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চম্পককে শূলে চড়ানো হল দ্বিপ্রহরের আগেই। তার মুখ বাঁধা রইল, শেষ মুহূর্তেও সে একটা কথাও বলতে পারল না। ছত্তীর কাছ থেকে ভরসা পেয়ে সে রাজা হবার আশা নিয়ে ছুটে এসেছিল রাজধানীতে, সেই ছত্তীর আদেশেই প্রাণ দিতে হল তাকে।

মহারানি তলতাদেবী ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যেতে গিয়ে এক সময় বাধা পেলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, কোনওক্রমে সীমান্ত পেরিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু সীমান্তের দিকে আগে থেকেই সৈন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। তলতাদেবী এক জায়গায় এসে দেখলেন, তাঁর সামনেও সৈন্য, পেছন দিকেও সৈন্য, সবাই তাঁকে ধরতে আসছে।

তখন তলতাদেবী ঠিক করলেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন। ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে ধরা দিয়ে তিনি কিছুতেই অপমানের জীবন বরণ করে নেবেন না।

তলোয়ারটা তুলে গলায় কোপ মারতে গিয়েও তিনি থমকে গেলেন।

তিনি আত্মহত্যা করলে তাঁর ছেলে দুটির কী হবে ? দৃঢ় আর তীক্ষ্ণ দু'জনেই ছোট। মাকে ছাড়া ওরা কী করে বাঁচবে ?

তলতাদেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তলোয়ারটা ফেলে দিলেন।

প্রহরীরা তাঁকে ঘিরে ধরল। ঘোড়ার ওপর বসিয়ে রেখেই তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল আষ্টেপৃষ্ঠে।

এদিকে রাজবাড়ির যে অংশটাতে মহারাজ আর মহারানি থাকতেন, সেই অংশটা নতুন করে সাজিয়ে নিলেন ছত্তী। একেবারে শেষ ঘরটা তিনি রাখলেন নিজের জন্য। তার সামনের ঘরটিতে থাকবে তীক্ষ্ণ। এর পরে একটি সুদৃঢ় লোহার দ্বার, সেই দ্বারের সামনে বসে থাকবে অতি বিশ্বাসী চারজন প্রহরী। ছত্তী আদেশ দিয়ে রাখলেন, "কোনও মানুষ তো দূরের কথা, কোনও পক্ষী-পিঁপড়েও যেন এ লোহার দ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকতে না পারে।"

সব ব্যবস্থা পাকা করার পর ছত্তী কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেন মহাচূড়ামণির মণি-মাণিক্যখচিত পালঙ্কে।

একসময় প্রহরীদের ডাকে তাঁর ঘুম ভাঙল। লৌহদ্বারের বাইরে এসে তিনি দেখলেন সেনানায়ক ভামহ দাঁড়িয়ে আছে। ছত্তীকে দেখে হাত জোড় করে সে প্রণাম জানাল।

ছত্তী জিজ্ঞেস করল, "কী বার্তা, সেনানায়ক ?"

ভামহ বলল, "গুরুদেব, আপনার সব আদেশ পালিত হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র সৈন্যদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোথাও সামান্য কোনও বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেলেই তারা দমন করতে পারে। সেরকম কোনও চিহ্ন এখনও কোথাও দেখা যায়নি। মহারানি তলতাদেবীও ধরা পড়েছেন।

ছত্তী ধমক দিয়ে বললেন, "মহারানি মানে ? কে মহারানি ? এ-রাজ্যের তো কোনও মহারানি নেই এখন ? বলো, তলতাদেবী !"

এ-রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও সৈন্যরা কখনও রাজা বা রানির নাম উচ্চারণ করে না। ভামহ আড়ষ্ট গলায় বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। উনিই ধরা পড়েছেন। ওঁকে কি এখানে নিয়ে আসব ?"

ছত্তী আরও জোর গলায় বললেন, "খবর্দার, না ! তলতাদেবী আর কোনওদিন এই রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে পারবেন না, একথা মনে রেখো। তিনি এখন কোথায় ?"

ভামহ বলল, "তাঁকে রাজউদ্যানের মাঝখানে ধরে রাখা হয়েছে। তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে কি না, সে বিষয়ে আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছি।"

ছত্তী বললেন, "এখানকার কারাগারে নয়, পাহাড়ের ওপরে কালাঘরে নিয়ে যাও। সেখানে কড়া পাহারায় ওঁকে রাখবে। আমি সন্ধের সময় কালাঘরে যাব। সাবধান, এই বন্দিনী যেন কোনওক্রমে আর না পালায় !"

ভামহ বলল, "না, গুরুদেব সে ব্যবস্থা আমরা করব। ওঁকে কি কিছু খেতে দেওয়া হবে ?"

ছত্তী বললেন, "তা দিও। যা খেতে চান উনি সব দিও। আমি তো ওঁকে মৃত্যুদণ্ড দিইনি, কারাদণ্ড দিয়েছি মাত্র। ওঁকে না খাইয়ে রাখবার দরকার নেই।"

ভামহ এবং অন্য প্রহরীরা দূরে সরে গেলে ছত্তীর মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। এ-রাজ্যের আর কোনও প্রজা এখনও বিদ্রোহ করেনি। তলতাদেবীও ধরা পড়েছেন। এখন ছত্তীর আর কোনও প্রতিপক্ষ রইল না।

বিকেলবেলা ছত্তী রাজসভায় গিয়ে কিছুক্ষণ রাজকার্য পরিচালনা

করলেন। তিনি বসলেন ভূতপূর্ব মহারাজ মহাচূড়ামণির সিংহাসনে। কিন্তু তিনি মুকুটটা মাথায় দেননি। তাঁর অঙ্গে পুরোহিতের পট্টবস্ত্র। রাজ্যের কোথায় কী ঘটছে, তার সবই খুঁটিনাটি তিনি জানেন, কর্মচারিদের প্রয়োজন মতো নির্দেশ দিলেন।

একটু পরে তিনি একটি রথে চেপে চালককে বললেন, "কালাঘর চলো।"

রাজধানী থেকে কিছুটা দূরে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর কালাঘর একটি কুখ্যাত জেলখানা। অন্যান্য জেলখানার সঙ্গে এর তফাত এই যে, এখানে কয়েদিদের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসতে পারে না। কয়েদিরাও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কখনও আলো দেখতে পায় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাদের কাটাতে হয় অন্ধকার ঘরে। তারা নিজেদের মুখ দেখতে পায় না, হাত-পা দেখতে পায় না, কখন যে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, তাও টের পায় না। এই রকম অন্ধকারে থাকতে থাকতে চোখের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন অন্ধ হয়ে যায় তারা।

ছন্ডী সেই কালাঘরের প্রধান দ্বারে এসে রথ থেকে নামলেন। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখে বুঝে নিলেন, এই কারাগার থেকে কোনও জীবন্ত মানুষের পালাবার উপায় নেই। একেবারে নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা।

লম্বা সিঁড়ি বেয়ে তিনি উঠে এলেন ওপরে।

একজন প্রহরী একটা মশাল জ্বেলে নিল, তারপর সেই মশালের আলোয় পথ দেখে ছন্ডী প্রহরীটির সঙ্গে একটার পর একটা কক্ষ পার হয়ে এলেন।

একেবারে শেষ কক্ষটির সামনেটা বড়-বড় লোহার শিক দিয়ে ঘেরা। সেখানে এসে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন তলতাদেবীকে। কালো মেঘের মধ্যে প্রায় ঢাকা পড়ে যাওয়া চাঁদের মতন সেই অন্ধকার ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছেন তলতাদেবী।

ছন্ডী বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "ওহে প্রাক্তন রানি, তা হলে তুমি শেষ পর্যন্ত পালাতে পারলে না?"

তলতাদেবী উঠে বসে ছন্ডীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর দু'হাত জোড় করে বললেন, "প্রণাম, গুরুদেব।"

ছন্ডী হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন, "বেঁচে থাকো! তুমি আয়ুষ্মতী হও!"

তলতাদেবী বললেন, "গুরুদেব, আপনাকে সবাই বিশ্বাস করি, শ্রদ্ধা করি। তবু আপনি মিথ্যে কথা বলে আমাকে চম্পকের কাছে পাঠালেন!"

ছন্ডী হা-হা করে হেসে উঠলেন খুব জোরে। তারপর বললেন, "তুমি নিজের বুদ্ধির খুব গর্ব করতে তাই না? তুমি মনে করতে, এ-রাজ্যে তোমার মতন বুদ্ধি আর কারও নেই। তুমি সামান্য একটা কৌশলে দাবানল নিভিয়ে দিয়েছিলে, তাই তোমার স্বামী, রাজা মহাচূড়ামণি আমাদের সকলকে বোকা বলে অপমান করেছিল। এবার বুঝলে, কে আসল বুদ্ধিমান? যে শেষ পর্যন্ত জেতে, তার বুদ্ধিই সবচেয়ে বেশি!"

তলতাদেবী বললেন, "মহারাজ আপনাকে সব সময় মান্য করতেন। তিনি সরল মানুষ ছিলেন। তবু আপনি তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলেন?"

ছন্ডী বললেন, "আমি তাকে হত্যা করেছি? তুমি এখন এ-কথা চিৎকার করে বললেও কেউ শুনতে পাবে না। মহাচূড়ামণি মারা গেছেন নিজের বোকামির জন্য। অত কম বুদ্ধি নিয়ে কি কোনও রাজা রাজ্য চালাতে পারেন? কোনও রাজা কি কখনও অন্য কাউকে বিশ্বাস করে একা অত উঁচু খাড়া পাঁচিলে ওঠেন? তার তো মরাই উচিত!"

তলতাদেবী বললেন, "আপনি কিসের লোভে এত সব খারাপ কাজ করলেন গুরুদেব? আপনার কিসের অভাব ছিল?"

ছন্ডী বললেন, "তোমার বুদ্ধির অহঙ্কারই আমার অসহ্য ছিল। তুমি নারী হয়েও সকলের ওপরে উঠে গিয়েছিলে। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বুদ্ধির খেলায় তুমি জিতবে, না আমি জিতব, তা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। তুমি এত সহজে হেরে গেলে, তলতাদেবী! ছি ছি ছি, তুমি এখন অন্ধকার কারাগারে ধূলায় গড়াচ্ছ!"

তলতাদেবী বললেন, "আমি তো আপনার সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে যাইনি। আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম!"

ছন্ডী বললেন, "রাজ্য যাঁরা চালান, তাঁরা কাউকেই পুরো বিশ্বাস করেন না। তুমি ভুল করেছ, তাই তোমার এই দশা।"

"আপনি পুরোহিত হয়েও সিংহাসনের ওপর লোভ করেছিলেন?"

"কেন, পুরোহিত বুঝি রাজা হতে পারে না? আমি ইচ্ছে করলেই মাথায় রাজমুকুট পরতে পারতাম। তা আমি পরিনি। কিন্তু এই রাজ্য এখন সম্পূর্ণ আমার হাতের মুঠোয়। আমি যেমনভাবে খুশি এই রাজ্য চালাব!"

"আপনি অন্যায়ভাবে সিংহাসন দখল করেছেন। এ-সিংহাসন আপনি বেশিদিন রাখতে পারবেন না।"

"তুমি বুঝি মনে-মনে ভেবে রেখেছ, এখান থেকে কোনওক্রমে পালিয়ে গিয়ে প্রজাদের আমার বিরুদ্ধে খ্যাপাবে! সে গুড়ে বালি! তোমার জন্য কী ব্যবস্থা করেছি শুনে রাখো। তুমি সারা জীবন এই অন্ধকার ঘরে কাটাবে। এখান থেকে কেঁদে-কেঁদে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। একজন বোবা-কালা সৈন্য শুধু দু'বেলা তোমার খাবার দিয়ে যাবে। এখান থেকে তোমার পালাবার কোনও উপায় নেই। তবু যদি কোনওক্রমে বাইরে বেরোতে পারো, তা হলে কী হবে, সেটাও শুনে রাখো। তোমার এক ছেলে তীক্ষ্ণ থাকবে আমার কাছে। অন্য ছেলে দৃঢ় থাকবে এই কারাগারেরই অন্য একটা ঘরে। তুমি তাকে কখনও দেখতে পাবে না। তুমি যদি কোনওক্রমে পালাও, তা হলে প্রথমেই তোমার দুটি ছেলেকে খুন করা হবে। সুতরাং মনে রেখো, তুমি এ-ঘরের বাইরে কোনও দিন পা দিলেই তোমার দুই ছেলেরই মৃত্যু হবে, আর তুমিই হবে তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।"

"গুরুদেব, তবু আপনি আমাকে বেশিদিন বেঁচে থাকার জন্য আশীর্বাদ করলেন কেন?"

"তুমি যত বেশিদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কষ্ট পাবে, সেটাই তো আমি চাই।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তলতাদেবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "তবে আপনিও শুনে রাখুন, গুরুদেব! যদি আমি বেঁচে থাকি, তা হলে নিশ্চয়ই আমি দেখে যাব, একদিন কেউ এই রাজ্যের সিংহাসন থেকে পদাঘাত করে আপনাকে ফেলে দিয়েছে। আপনার ছিন্ন মুণ্ড ধূলায় গড়াচ্ছে!"

ছন্ডী অট্টহাস্য করে বললেন, "সে সাধ তোমার কোনওদিন পূর্ণ হবে না!"

আর কোনও কথা না বলে ছন্ডী পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন। সব ক'টি কক্ষ পেরিয়ে, বাইরের মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে তিনি পরম তৃপ্তির সঙ্গে মনে-মনে বললেন, "আঃ! এখন এই রাজ্য সম্পূর্ণ আমার!" (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

বুদ্ধিমান

ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য

আমাদের এই বাঙলা দেশে কোনও নামজাদা জেলার ভিতরে ঝুমঝুমপুর নামে একটা পল্লীগ্রামে ভজহরি চক্রবর্তী নামে এক বামুনের ছেলে বাস করত। গ্রামের সকলে ভজহরিকে 'বুদ্ধিমান' বলে ডাকত। বাস্তবিক যে, ভজহরির বেশি বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল, তা নয়, বেশি বুদ্ধি থাকা দূরে থাক, অনেক সময়ে সে যে কাজ করত, তাতেই তার বোকামির ভাবটা বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ত। আবার অনেক সময় ভগবানের কৃপায় হোক অথবা তার ভাগ্যবলেই হোক, কোনও কোনও কাজে তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত। সে যা হোক, বাল্যকাল হতে ভজহরি গ্রামের লোকের নিকট এই বুদ্ধিমান উপাধিটা আদায় করে আসছে। ক্রমে বাল্য ছাড়িয়ে ভজহরি যুবক হয়ে দাঁড়াল। সংসারে একমাত্র সম্বল তার দুঃখিনী মা ছেলের বিয়ের জন্য বড়ই অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রতিবেশীদের যোগাযোগে প্রজাপতি ঠাকুর বড় চঞ্চল হয়ে পড়লেন, কাজেই ভজহরির বিয়ের সম্বন্ধটা স্থির হয়ে গেল। শুভদিনে প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে নিয়ে,

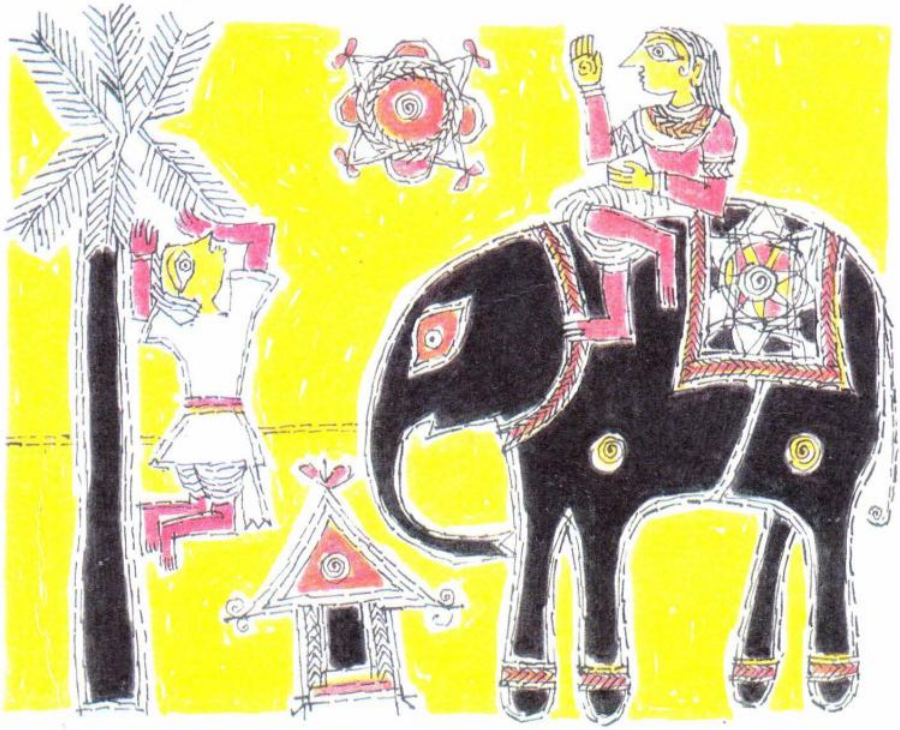

মাকে প্রণাম করে ভজহরি বিয়ে করতে রওনা হল। অবশ্য পাল্কিযোগে—কিন্তু তাই বলে পথের লোক কেউ তার মুখ দেখতে পায়নি। কারণ ভজহরি ছেলেবেলা থেকে বড় লাজুক, তাতে নিজের বিয়ে, এ অবস্থায় তার লজ্জার ভাগটা কিছু বেড়ে যাবারই কথা। এই সব কারণে সে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় এবং বিয়ের পর ফিরে আসার সময় পাল্কির দরজা বন্ধ করে যাওয়া-আসা করেছিল ; কাজেই শ্বশুরবাড়ির পথঘাট সম্বন্ধে একরকম কিছুই জানলে না বললেই হয়। দুঃখের বিষয় ভজহরির স্ত্রীর বয়স খুব কম ছিল বলে বিয়ের পর নববধূকে সঙ্গে আনা আর তার ভাগ্যে ঘটে উঠল না।

ক্রমে দেখতে দেখতে ৭/৮ বৎসর চলে গেল, এখন ভজহরির স্ত্রীর বয়স প্রায় ১২/১৩ বছর হবে। ভজহরির মা'র বয়স অনেক হয়েছে। এখন তো আর তিনি আগের মতো খাটতেখুটতে পারেন না, কাজেই বৌমাকে বাড়ি আনার জন্য তিনি ভজহরিকে বড়ই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। ভজহরি একেই লাজুক ছেলে—তাতে শ্বশুরবাড়ির রাস্তাঘাট আদৌ সে চেনে না ; এ-সমস্ত কারণে, প্রথমে সে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ি যেতে স্বীকৃত হল না। শেষে মায়ের অনেক অনুরোধে স্বীকার করলে বটে, কিন্তু রাস্তাঘাট জানা নেই বলে আবার আপত্তি করে বসল। মা তাকে অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে রাস্তার কথা বলে দিলেন, আরও বিশেষ করে বললেন, "দেখো বাবা, বরাবর সোজা রাস্তা ধরে চলে যেও। কদাচ ডাইনে বা বাঁয়ের পথে যেও না। তা হলে ঠিক তোমার শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে যাবে।" ভজহরি তাদের বংশের পুরোহিতের নিকট থেকে একটা ভাল দিন দেখে মায়ের চরণে টিপ করে একটি প্রণাম করে শ্বশুরবাড়ি যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরুলো এবং মায়ের উপদেশ মতো সোজা রাস্তা ধরেই একাকী রওনা হল।

কিছুদূর সোজা রাস্তা ধরে গিয়ে ভজহরি বড়ই বিপদে পড়ে গেল। সামনে প্রকাণ্ড এক তালগাছ, তার ডাইনে-বাঁয়ে দুই দিকে দুটো রাস্তা গিয়েছে, ভজহরির মায়ের আদেশ, বরাবর সোজা রাস্তা ধরে যেতে হবে ; কিন্তু বড় তালগাছটি পথের মাঝখানে পড়ে তার মায়ের আদেশ পালনে বাধা জন্মিয়ে দিলে ; কাজেই ভজহরি বড় মুস্কিলে পড়ল। কিছুক্ষণ সে হাঁ করে সামনের তালগাছটির দিকে তাকিয়ে একটা মতলব ঠিক করে ফেলল, মায়ের আদেশ পালনই উচিত বলে স্থির হয়ে গেল। যেই মতলব ঠিক হওয়া অমনিই কাজ আরম্ভ হল। ভজহরি তালগাছে উঠতে আরম্ভ করলে। ক্রমে তালগাছের মাথায় উঠে বসল, শেষে অপর পাশ দিয়ে নামবার চেষ্টা করতে লাগল। দু'পায়ে গাছটা জড়িয়ে ধরবার মতলব করে গোটা কয়েক পাতা ধরে ঝুল খেয়ে পড়ল, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভজহরির মতলবটি ফেঁসে গেল। পা দিয়ে গাছটি জড়িয়ে ধরা তার ভাগ্যে আর ঘটে উঠল না। সে তালপাতাগুলো ধরে মাটি থেকে ১২/১৩ হাত উঁচুতে ঝুলে থাকল। কিছুক্ষণ পরে এক রামায়ণ গায়ক হাতীর পিঠে চড়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রামায়ণ গায়ক হাতীর পিঠে কথাটা শুনতে যদিও কেমন কেমন, তা হলেও সংসারে অসম্ভব কিছুই নেই, গোবরেও পদ্মফুল ফুটতে পারে। গায়ক মহাশয় নিজের দলবল নিয়ে রাজীবপুরের রাজবাড়িতে গাওনা করতে গিয়েছিলেন, মধুর রামনামে সেখানকার রাজাকে মাতিয়ে ফেলে এই বড় হাতীটা বকশিস পেয়েছিলেন। একে রামায়ণ গায়ক, তাতে দরিদ্র, হাতীর খোরাক যোগানো তাঁর পক্ষে বড় কঠিন ; তার উপর একজন মাহুতের বেতন ও খোরাক-পোষাক তাঁর ক্ষমতার বাইরে। সেজন্য তিনি ঠিক করলেন, কোনওরূপে কিছুদিন রাজার মাহুতের কাছে থেকে হাতী চালানো বিদ্যেটা শিখে নিজেই হাতী চালিয়ে দেশে চলে যাবেন, শেষে সুবিধামতো কোনও বড়লোকের কাছে বিক্রি করে একটা দাঁও মারবেন। এই ভেবে দলবল দিয়ে ২/৩ মাস যাবৎ সেখানকার মাহুতের কাছে থেকে হাতী চালানো বিদ্যেটা শিখেছেন, এখন নিজে হাতী চালিয়ে দেশে যাচ্ছেন। ভজহরির শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথ আর রামায়ণওয়ালার বাড়ির পথ, এই উভয় পথের মিলনস্থানেই এই তালগাছ। কাজেই সেই গাছে ঝুল্যমান ভজহরির সঙ্গে রামায়ণওয়ালার দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ভজহরি রামায়ণওয়ালাকে দেখে কাতর হয়ে বললে, "দেখো ভাই, আমি কি বিপদেই পড়েছি, দেখছ তো ? তুমি হাতীর পিঠে অনেক উঁচুতে আছ, যদি দয়া করে এই তালতলায় এসে হাতীর পিঠে দাঁড়িয়ে আমার পা দুটো শক্ত করে ধরতে পারো তাহলে আমি ফিকির করে হাতীর পিঠে নামতে চেষ্টা করতে পারি।"

ভজহরির কথা শুনে রামায়ণওয়ালার বড় দয়া হল, তিনি হাতী নিয়ে তালতলায় এসে হাতীর উপর দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে ভজহরির পা দুটো শক্ত করে জড়িয়ে ধরতেই নিজের পা দুটো হাতীর পিঠ থেকে একটু উঁচু হয়ে উঠল, হাতীটাও এই অবকাশে রামায়ণওয়ালার পায়ের তলা থেকে সরে দাঁড়াল এবং তখনি একদিকে ছুটে বেরুলো। তখন রামায়ণওয়ালা উপকার করতে এসে বিপদে পড়ে গেলেন, ভজহরির দুই ঠ্যাং ধরে ঝুলতে লাগলেন। বুদ্ধিমান ভজহরি রামায়ণওয়ালার সঙ্গে একটু আলাপের লোভ সামলাতে পারলে না, "ভাই তুমি কে ? বাড়ি কোথায় ?"

রামায়ণওয়ালা, "আমার নাম নদেরচাঁদ, বাড়ি সনাতনকাটী। আমি রামায়ণওয়ালা।"

ভজহরি, "বেশ ভাই, বেশ ! এই ফাঁকে একটা গান করে ফেলো না বাবা ? আমি গান বড় ভালবাসি।"

রামায়ণওয়ালা, "তুমি তো বেশ লোক ! এখন ঝুল খেয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, একটু পরেই হয়তো অক্কা পেতে হবে, তুমি ধন্যি লোক, তাই এই বিপদকালেও তোমার গান শুনতে ইচ্ছে হলো।"

ভজহরি, "দেখো বাপু ! তোমার ওসব বক্তৃতা শুনতে চাই নে। হয় গান করো, নয় এই হাত ছেড়ে দিলাম ; তোমারি হাড়গোড় আগে গুঁড়ো হয়ে যাবে শেষে আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটবে।"

ভজহরির এই কথা শুনে রামায়ণওয়ালা প্রমাদ গুনলেন। ভাবলেন এখনও ঝুল খেয়ে প্রাণে বেঁচে আছি, কিন্তু এ ব্যাটা হাত ছেড়ে দিলে তো আগেই আমার প্রাণটা যাবে। এই না ভেবে রামায়ণওয়ালা বললেন, 'আচ্ছা ভাই, আমি গান করছি, কিন্তু একটা গানের বেশি গাইতে পারব না।"

ভজহরি বললে, "আচ্ছা তাই লাগাও বাবা।" রামায়ণওয়ালা তখন নিরুপায় হয়ে "জয় রামে রাম" বলে যেই সুর ধরেছেন, অমনি ভজহরি 'এমন গানে তাল না দিলে চলে' এই বলে যেই তালের পাতাগুলো ছেড়ে দুই হাতে তালি বাজাতে যাওয়া অমনি দুজনে মাটির উপর দুদুম করে পড়ল। অবশ্য রামায়ণওয়ালা নীচে পড়ে গেলেন, তাঁর উপরে ভজহরি পড়ল। শেষে দু'জনে তুমুল ঝগড়া। রামায়ণওয়ালা বললেন, "বাপু, তোমার উপকার করতে এসেই আমার এ দশা ঘটল।"

ভজহরি বললে, "আমি তার কি করব বাপু ; তোমার মিষ্টি গান শুনে তালি না দিয়ে কি থাকতে পারি ?"

যা হোক, দু'জনে কিছু সময়ের জন্য এরূপ বচসা করে রামায়ণওয়ালা মাজা ডলতে ডলতে তাঁর হাতী খুঁজতে বেরুলেন। হাতী খুঁজে পেয়েছিল কি না ঠিক জানি না, তবে ভজহরি যে সেখান থেকে সটান শ্বশুরবাড়ির দিকে রওনা হল ; এ খবর আমরা নিশ্চিত জানি।

কিছুদূর গিয়ে ভজহরি এক মাঠে উপস্থিত হল। সেই মাঠ পার হয়ে আরও প্রায় এক মাইল রাস্তা গেলে ভজহরির শ্বশুরবাড়ি পৌঁছানো যায়। কিন্তু ভজহরি বড় বিপদে পড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা

হয়েছে। গত ৭/৮ মাস ধরে ভজহরিকে এক নতুন রোগে ধরেছে—রোগটা তত গুরুতর নয় বটে, তবে কিনা ভরসার মধ্যে এই যে, তার শ্বশুরবাড়ির কোনও লোক তার এই নতুন রোগের কোনও খবর রাখে না। তা হলেও ভজহরি বড় চিন্তিত হয়ে পড়ল। কারণ এখনও রাত্তির হয়নি—কেবল সন্ধ্যা ; তাই সে চোখে ঝাপসা ঝাপসা দেখতে আরম্ভ করেছে। হাজার হলেও সে ছেলেবেলা হতে বুদ্ধিমান, কাজেই সে তখনই একটা বুদ্ধি ঠাউরে ফেললে। এই মাঠ পার হলে তার শ্বশুরবাড়ি যে বেশিদূর নয় তা সে লোকের মুখে আগে শুনেছে ; সুতরাং শ্বশুরবাড়ির গরুগুলো যে সে মাঠে চরতে আসতে পারে তা সে অনুমানেই ঠিক করে ফেললে। নিকটের একজন চাষাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ভাই, স্বরূপকাটীর অধিরথ চক্কর্তির গরুটা দেখেছ কি ? আজ তাঁদের বাড়িতে গরু খোঁজবার লোক নেই তাই আমাকে গরুগুলো নিয়ে যেতে বলেছেন।"

সেই কথা শুনে চাষা বলল, "সে কি ! আমরা চক্কর্তি মশাইর গরু চিনিনে ? তিনি যে আমার মুনিব হন। এই বছরে, দেখুন না, তাঁকে ছয় আনা তিন পয়সা তিন কড়া আট দন্তি খাজনা দে থাকি। এই—আপনি বরাবর সোজা চলে যাও। ঐ যে বটগাছটে আপনি দেখছ, ওরি তলায় একটা রাঙা গরু দেখতে পাবে। ঐ গরুই—বুঝলে তো—ঐ সেই চক্কর্তি মশাইর।"

চাষার কথা শুনে ভর্জহরি চোখে ঝাপসা দেখতে দেখতে মাঠ পার হয়ে সেই বটতলায় উপস্থিত হল। শেষে অনেকক্ষণ ঠাউরে দেখলে যে, বাস্তবিক একটা লাল গরু দাঁড়িয়ে আছে। সে তখনই সেটাকে তার শ্বশুরের গরু বলে অনুমানে বুঝে নিলে। তখন সে গরুর লেজটি ধরে তার পাছের পা দু' খানি নিজের পায়ে আচ্ছা করে জড়িয়ে ফেললে। আহা ! বেচারী পশুটি এমন বিপদে কখনও পড়েনি ! কাজেই সে এই নতুন বিপদে পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিলে। ভজহরি যদিও তার জড়ানো পা দু'খানা ঠিক রাখতে পারলে না, তা বলে সে লেজটি কিছুতেই ছাড়লে না ; বরং আগের চেয়ে আরও শক্ত করে ধরলে। সেদিন অন্ধকার রাত্রি। ভজহরি কিছুই চোখে দেখতে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু তা হলেও সে তার শ্বশুরের গরুর কৃপায় একেবারে তার শ্বশুরবাড়ির গোয়ালঘরে গিয়ে হাজির হল। সেখানে পৌঁছে গরুর লেজটি ছেড়ে দিলে ; গরুটি রক্ষা পেলে, ভজহরিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। মশক মহাশয়েরা যাতে দংশন যাতনায় ব্যতিব্যস্ত করে না তুলতে পারে সেজন্য গোয়ালঘরের এক পাশে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালা ছিল। ভজহরি গিয়ে তার পাশে চুপ করে বসে থাকলে। ভজহরির এক সম্বন্ধী ছিল, তার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর হবে, তার গায়ে বেশ জোর আছে বলে সকলে জানে এবং প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা বেলায় সে মুগুর খেলা, কুস্তি খেলা খেলে গায়ের বল বাড়িয়ে থাকে । আজও তিনি সন্ধ্যার পর খুব রকম খেলা-টেলা করে গা ঘামিয়ে, আয়েস করে একটু তামাক খাবে বলে কলিকাটি নিয়ে গোয়ালঘরে গেল। অগ্নিকুণ্ডের আগুন আনতে গিয়ে দেখলে যেন কোনও লোক সেখানে বসে আছে ; সে তখনই চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কে রে ?"

ভজহরি বললে, "আমি ভজহরি।"

আবার প্রশ্ন, "কোথাকার ভজহরি ?"

সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তর, "ঝুমঝুমপুরের ভজহরি।"

তখন তার সম্বন্ধী তাকে তার ভগ্নীপোত বলে চিনতে পারলে, কিছু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কুটুম্ব ! তুমি এখানে কেন ?"

ভজহরি, "ওহে, এর মধ্যে একটু কিন্তু আছে।"

সম্বন্ধী, "কিন্তু কি ?"

ভজহরি, "শুনলাম, তুমি নাকি বড় পালোয়ান হয়েছ, মুগুর খেল,

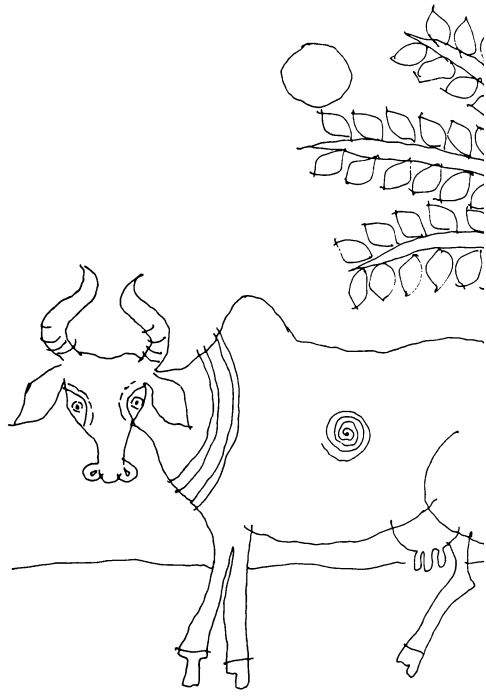

কুস্তি কর, আরও কত কি কর। আমায় যদি কোলে করে ঘরের দাওয়ায় নিয়ে বসাতে পারো, তবে বুঝি তুমি কেমন বীর !"

এই কথা শুনে সম্বন্ধী তো হেসেই অস্থির, বললে, "বটে। আচ্ছা, কুটুম্ব এসো। আমি তোমায় কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

এই বলে সম্বন্ধীমশাই কুটুম্ব ভজহরিকে কোলে করে বাড়ির ঘরের দাওয়ায় নিয়ে বসিয়ে দিলে। অল্প সময়ের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল যে, জামাই এসেছে। অমনি চারিদিকে আহ্লাদের রোল উঠল—সঙ্গে-সঙ্গে রন্ধনাদির আয়োজন ও জলখাবারের ধুম পড়ে গেল। দুঃখের বিষয় ভজহরির শ্বশুরমশায় বাড়িতে ছিলেন না ; তা হলে বোধ হয় আরও বেশি ধুমধাম হত। সে যা হোক, ঘরের ভেতর ভজহরির জলযোগের আয়োজন হল। তার একজন শ্যালিকা তাকে জল খেতে ডাকতে এল। ভজহরি দেখলে যে সর্বনাশ ! জল খেতে গেলে তো রাতকানা বলে ধরা পড়তে হবে। তা হাজার হলেও ভজহরি বুদ্ধিমান তো বটেই ; কাজেই একটা বুদ্ধি ঠাউরে নিলে। হেসে বললে, "আর ঘরে গিয়ে জলখাবার দরকার কি ? আমরা কলিকালের ছেলে, আমাদের এই মাদুরের ওপরই হবে।" এই বলে ভজহরি সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে চুপ করে বসে রইল। কাজেই জলখাবার বাইরে এল, ভজহরি এ ধাক্কা বেঁচে গেল। বাইরে বসে সম্বন্ধীদের সঙ্গে রসালাপ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে রান্নাঘরে খাওয়ার ডাক এল, ভজহরি এবারও এক বুদ্ধি ঠাউরে ফেললে, ইয়ার্কির ভাবে দুই সম্বন্ধীর গলা জড়িয়ে ধরে গল্প করতে করতে

রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই সামনের এক পিঁড়েতে বসে গেল। তাতে সকলে খুব আপত্তি করতে লাগল ; কারণ জামাইয়ের জন্য পৃথক স্থানে আহারাদির খুব ভাল রকম আয়োজন করা ছিল। কাজেই সম্বন্ধীর দল তাকে ধরাধরি করে সেই আসনে বসিয়ে দিলে। এরূপে ভজহরির এ ফাঁড়াটাও কেটে গেল। ভজহরি আসনে বসে আন্দাজ করে খাবার খেতে আরম্ভ করলে। থালের ডানদিকে একটা রুইমাছের মুড়ো ছিল ; ভজহরি রাতকানা—কাজেই চোখে দেখতে পেলে না। একটি বিড়ালমশায় নিকটে বসেছিলেন, তিনি টপ করে দয়া করে ফেললেন। সকলেই এই ব্যাপারে 'হায় হায়' করে উঠল। ভজহরি একটু পরে ব্যাপারটা বুঝলে। ভাবলে, ভারি লজ্জার কথা হল বটে, কিন্তু তাই বলে ভজহরি পিছপাও হওয়ার ছেলে নয়, সে বলল, "কি করব ? মনটা আজ ভাল নেই, কাজেই এমন কাণ্ডটা ঘটে গেল।" যা হোক ভজহরির শাশুড়ী আবার একটা মুড়ো নিয়ে ভজহরির থালায় দিতে এলেন, সেই সময়ে তাঁর হাতের চুড়িগুলির শব্দ হল, ভজহরি ভাবলে, আবার বুঝি বেড়াল এল ; এই না ভেবে সে বিরাশী দশ আনা ওজনের একটা কিল্ শাশুড়ীর হাতে ঝেঁকে দিলে। এই ব্যাপারে সম্বন্ধীর দল তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, বললে, "পাজী ! তুই আমাদের মাকে মারলি।" এই না বলে, সকলে মিলে ভজহরিকে মারে আর কি ! তখন তার শাশুড়ী ছেলেদের অনেক বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তিনি বললেন, "জামাই আর ছেলে ও একই কথা, ওকে তোমরা কিছু বোলো না।"

মায়ের কথায় ছেলেরা শান্ত হল। কিন্তু ভজহরি অভিমানে ফুলতে লাগল, সে আর আসন ছেড়ে কিছুতেই উঠতে চাইলে না। অবশ্য সে বুঝেছিল যে আসন ছেড়ে উঠতে গেলেই তার আবার নতুন বিপদ ঘটবে ; কাজেই সে মান করে বসে রইল। সম্বন্ধীর দল নিরূপায় হয়ে তাকে ধরে নিয়ে হাত মুখ ধুইয়ে তার শোয়ার ঘরে রেখে এল। খাটের নীচে একটা গাড়ু রেখে দিলে এবং দুটো একটা পানেরও ব্যবস্থা করলে। ভজহরি কারো সঙ্গে কোনও কথা না বলে চুপ করে শুয়ে রইল। কিছু পরে তার স্ত্রী এসে চুপ করে সেই বিছানায় পড়ে থাকল ; ভজহরি তার সঙ্গেও আলাপ করলে না।

খানিকটা রাত পরে ভজহরি একবার বাইরে যাবার প্রয়োজন বোধ করলে। পাছে স্ত্রী তার রাতকানার ব্যাপারটা জানতে পারে, এই ভয়ে তাকে আর ডাকলে না। নিজে আন্দাজে গাড়ুটা খাটের নীচে থেকে খোঁজ করে নিয়ে ঐ সঙ্গে নিজের উড়ানিটি সঙ্গে নিয়ে কোনও রকমে ঘর ছেড়ে দাওয়ার উপর এল। এসে ভাবলে, এমন বুদ্ধি করে কাজ হাসিল করতে হবে যে, কেউ কিছুই জানতে না পারে। যেমন চিন্তা, অমনি কার্য—ভজহরি ঘরের খুঁটির সঙ্গে চাদরের এক কোণ জড়িয়ে বেঁধে আর এক পাশ নিজের গলায় বাঁধলে, মতলব করলে চাদর ধরে কিছু দূরে গিয়ে প্রয়োজন মিটিয়ে শেষে আবার চাদর ধরে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে ! এই ভেবে ভজহরি চাদর গলায় বেঁধে দাওয়ার ওপর থেকে লাফ দিলে। দাওয়াটি খুব উঁচু ছিল, ভজহরি তা জানত না, কাজেই বেচারার গলায় ফাঁস লেগে গেল, সে গোঁ-গোঁ করে উঠল। সেই বিকট শব্দে সকলের ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বেলে শাশুড়ী ও তাঁর ছেলেপিলে এই ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল। তখন তাড়াতাড়ি কেউ তার গলার ফাঁস খুলে দিলে, কেউ তাকে ধরে তুললে, কেউ তার কাপড় বদলে দিলে। ভজহরি সে সময় খুব জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "তোমরা আমায় ছেড়ে দেও, যখন আমি শাশুড়ীকে মেরেছি তখন আমি এ প্রাণ কিছুতেই রাখব না," ইত্যাদি।

শেষে শাশুড়ী এসে তাকে অনেক বলে-কয়ে শান্ত করে শয়ন ঘরে এনে রেখে গেলেন। ভজহরির স্ত্রী তখনও খুব ঘুমুচ্ছে, এত কাণ্ডেও তার ঘুম ভাঙেনি। কাজেই সে এসব কিছুই জানতে পারলে না। অনেক রাত্রি জেগে সকলেই একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠলে। ভজহরির চোখে আর রাত্রে নিদ্রা আসেনি, সে রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্রই পিটটান দিলে। শ্বশুড়বাড়ির সকলে ঘুম থেকে উঠে জামাইকে না দেখে যা-তা নিন্দে করতে লাগল। কিন্তু এটা আমরা ঠিক জানি, সে যে রাতকানা, তা তার শ্বশুরবাড়ির কোনও লোক আজও পর্যন্ত জানতে পারেনি। তবে এই রকম শোনা যায় যে, এই ঘটনার কিছু দিন পরে ভজহরির এক মামাতো ভাই তার স্ত্রীকে ঝুমঝুমপুরে ভজহরির বাটীতে পৌঁছে দিয়েছিল।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

লেখক পরিচিতি

ললিতমোহন ভট্টাচার্য : *ইনি ছিলেন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশন ভবানীপুর শাখার ভূতপূর্ব শিক্ষক। প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের পিতা। আজ থেকে ছিয়াত্তর বছর আগে অর্থাৎ ১৩২০ সালে 'পঞ্চরঙ্গ' নামে ললিতমোহন ভট্টাচার্যের ছোটদের জন্য গল্পের একটি বই প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বইটি পড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। গল্পে লেখকের মূল বানান রক্ষিত হল।*

'বুদ্ধিমান' গল্পটি এই বই-এর 'দ্বিতীয় রঙ্গ'-এ আছে। ললিতমোহন ভট্টাচার্যের নাম আজ অনেকেই বিস্মৃত। এই গল্পটি পুনর্মুদ্রণের জন্য তাঁর পরিবারবর্গ এবং রণজিৎকুমার দত্ত মহাশয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

ফ্রি ফ্লায়ার প্লেন

ফ্রি ফ্লায়ার প্লেন তৈরি করা খুব সহজ। এই প্লেন তোমার ইচ্ছেমতো বাঁ দিকে কিংবা ডান দিকে, যেদিকে ইচ্ছে ওড়াতে পারো। তৈরি করতে গেলে চাই ২০·৫ সেন্টিমিটার এবং ২৮ সেন্টিমিটার মাপের একটা পোস্টকার্ডের মতো শক্ত বোর্ড। আর চাই রুলার, কাঁচি ও একটি জেমক্লিপ বা পেপার ক্লিপ।

১

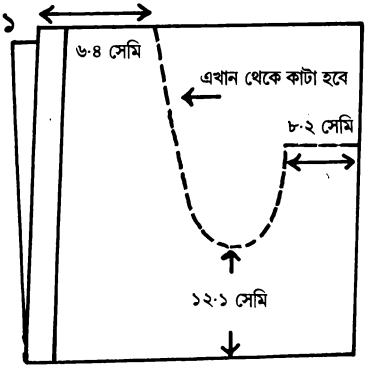

১। বোর্ডটি মাঝখান থেকে ভাঁজ করে, যেভাবে ওপরের নকশাটা দেখানো আছে, সেই ভাবে ছকে নিয়ে কেটে ফ্যালো।

২

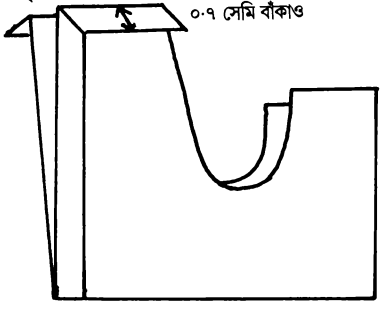

২। প্লেনের সামনের ডানার দিকে,অর্থাৎ বাঁ দিকে ওপরে ০·৭ সেন্টিমিটার মাপে বাইরের দিকে ভাঁজ করো।

৩

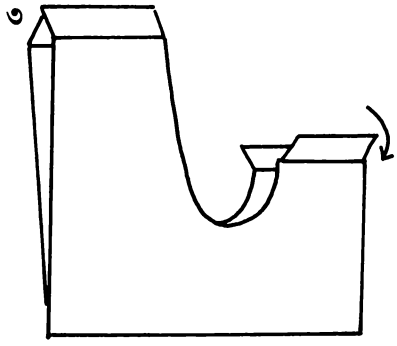

৩। এবার সেই ভাঁজ খুলে উলটো দিকে ভাঁজ করো। পেছনের ডানাটাও আগের মতো ০·৭ সেন্টিমিটার মাপে বাইরের দিকে ভাঁজ করো।

৪

৪। ছবিতে দেখানো আছে যেভাবে সেই ভাবে ভাঁজ খুলে নাও। পেছনের ডানার ভাঁজ নীচের দিকে থাকবে এবং উপরের ডানার ভাঁজ ওপরের দিকে থাকবে।

৫

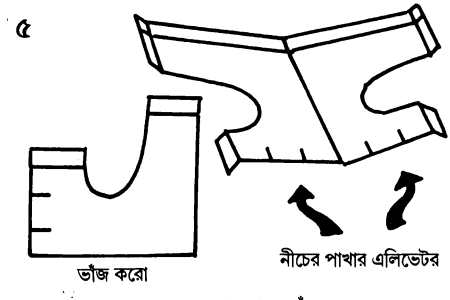

৫। এবার আগের মতো মাঝখান থেকে ভাঁজ করো এবং যেখানে তীর-চিহ্ন দেখানো আছে, সেই বরাবর কাঁচি দিয়ে কেটে নাও। কাটা অংশটা অর্থাৎ এলিভেটরগুলো ভাঁজ করে অল্প ওপরের দিকে তুলে নাও।

৬

দুটো পাখা সমান কি না দেখে নাও

৬। মনে রাখবে,ভাঁজগুলো যদি বাঁকা হয় তা হলে তোমার ফ্রি ফ্লায়ার প্লেন উড়বে না। ডানা দুটি ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হলে প্লেনটা সমান কোনও জায়গায় রেখে দেখে নেবে, যাতে দুঁদিকের ডানাই যেন সমান-সমান থাকে।

৭

৭। প্লেনের মাথার দিকে একটা জেম-ক্লিপ লাগিয়ে নিলে আরও ভাল হয়। তখন শুধু পেছনের ডানার এলিভেটর একটু ওপরের দিকে তুলে দিতে হবে।

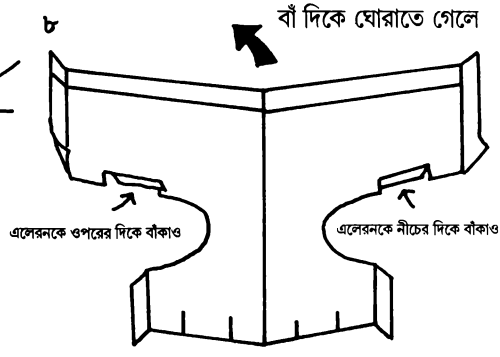

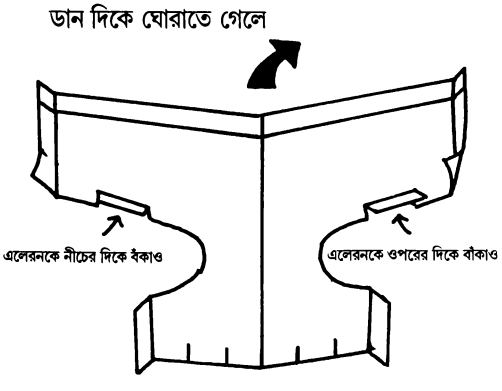

৮

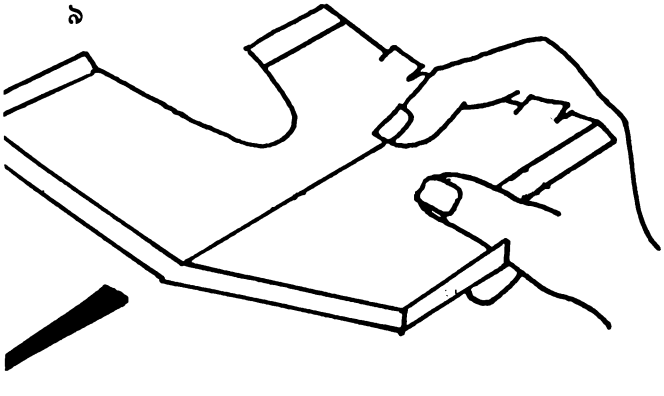

বাঁ দিকে ঘোরাতে গেলে

ডান দিকে ঘোরাতে গেলে

৯

৮। যদি তুমি ফ্রি ফ্লায়ার প্লেনকে বাঁ দিকে কিংবা ডান দিকে নিয়ে যেতে চাও, তা হলে সামনের ডানার নীচের দু'দিকে, ছবিতে যেরকম দেখানো আছে সেভাবে কেটে নাও। এই অংশকে এইলেরন বলে। যদি বাঁ দিকে তোমার প্লেন ঘোরাতে চাও তা হলে বাঁ দিকের এইলেরনকে উপরে তুলবে এবং ডান দিকের এইলেরনকে একটু নীচে নামিয়ে নেবে। আর যদি ডান দিকে পাঠাতে চাও তা হলে ডান দিকের এইলেরনকে উপরে তুলে, বাঁ দিকের এইলেরনকে নীচে নামিয়ে নেবে।

৯। এবার তোমার ফ্রি ফ্লায়ার প্লেন আস্তে করে ছুঁড়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দাও। মনে রাখবে বেশি জোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছুঁড়লে কিন্তু উড়বে না।

প্রশান্ত সেন

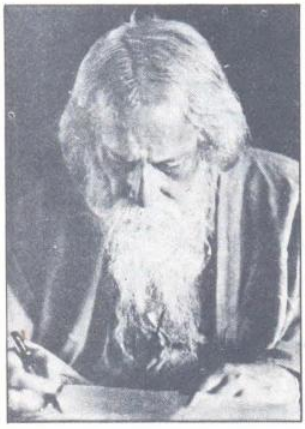

ক

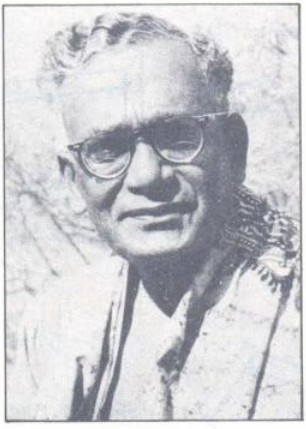

ঘ

চ

খ

কেউ-কেউ ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন। আবার কেউ-কেউ লেখার ফাঁকে-ফাঁকে এঁকেছেন অসাধারণ সব ছবি। এঁদের চিত্রকর্ম আমাদের শিল্পকলাকে করেছে সমৃদ্ধ। এঁদের আঁকা অবিস্মরণীয় সব ছবি আমাদের গর্বের বস্তু। এরকম কয়েকজন চিত্রশিল্পীর ছবি দেওয়া হল। ছবি দেখে বলতে হবে শিল্পীদের নাম।

ছ

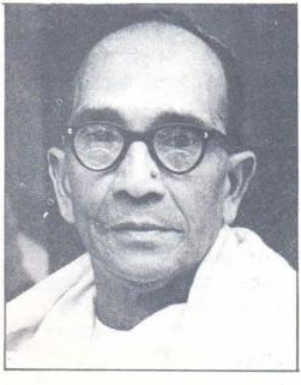

গ

ঙ

গত সংখ্যায় ছিল কয়েকজন ক্রিকেটের ধারাভাষ্যকার, ফোটোগ্রাফার এবং লেখকের ছবি। (ক) ফোটোগ্রাফার অ্যাড্রিয়ান মারেল। (খ) ধারাভাষ্যকার বেরি সর্বাধিকারী। (গ) ফোটোগ্রাফার প্যাট্রিক ইগার। (ঘ) ধারাভাষ্যকার কমল ভট্টাচার্য। (ঙ) লেখক নেভিল কার্ডাস। (চ) লেখক ও ধারাভাষ্যকার ই. ডব্লু. সোয়ানটন।

জখমের জন্য তিনজন সেরা খেলোয়াড়কে ছাড়া মাঠে নেমে মরসুমের প্রথম খেলায় মেলচেস্টার রোভার্স খাবি খাচ্ছিল। নিজের খেলা খুঁজে পাচ্ছে না বলে বিরতির পরে কেনি লোগানের জায়গায় ডিক গাথ্রিকে নামালে গাথ্রির রুক্ষ মেজাজের সুযোগ নিয়ে হোভারটন ২-০ গোলে এগিয়ে গেল।

একটু দাঁড়াও!

তুমি যখন ফ্রি-কিক নিয়ে ঝগড়া করছ, ওরা তখন শট নিয়েছে, ডিক!

যে-জায়গা তোমার আগলাবার কথা, বল সেখান দিয়েই ঢুকেছে!

রোভার্সের রয়

বলে ফ্যালো! বাচ্চা ওয়াল্টারের সামনে চমৎকার দৃষ্টান্ত রাখছ এ-কথা বলতেই হবে!

ঠিক কথা! বড়দের রাস্তার বেড়ালের মতো ঝগড়া করতে দেখলে ছোটরা আত্মবিশ্বাস হারাবে!

ঠিক তাই, কয়েক মুহূর্ত পরেই...

আমাকে ছেড়ে দাও!

তবে এসো, বল ধরো, ওয়াল্টার!

না! ওয়াল্টার দ্বিধায় সময় নষ্ট করেছে!

ওদের স্ট্রাইকার কাজ হাসিল করেছে!

তিন-শূন্য!

ইয়ায়ায়া!

হোভারটন পাগল হয়ে গেছে! ওদের খেলোয়াড়রা বিশ্বাস করতে পারছে না!

আমিও পারছি না! প্রথম বিভাগে ফেরার উৎসব কি আমরা এভাবেই করব!

আশা করা যাক রয় তার আগের জাদু দেখাবে।

খেলা আবার শুরু হতেই...

পাকো ডায়াজ, এবার ধরো!

দারুণভাবে জায়গা নিয়েছে! রক্ষণভাগকে রয় বেসালাম করে তুলেছে!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়) □

কারা হবেন নব্বইয়ের সেরা

সন্দীপ বসু

শুরু হয়েছে নতুন বছর। সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল নতুন দশকও। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উঠে আসবেন প্রতিভাবানরা। নব্বই-এর দশক নিয়ন্ত্রণ করবেন এঁরাই। খেলাধুলোয় কারা হবেন এই দশকের তারকা ?

তারকার তালিকায় আমরা প্রথমেই নির্দ্বিধায় দু'জন ভারতীয়কে রাখতে পারি। দুই ক্রিকেটার এঁরা— শচীন তেন্ডুলকর ও সঞ্জয় মঞ্জরেকর। ষোলো বছরের কিশোর শচীন ইতিমধ্যেই ক্রিকেটবিশেষজ্ঞদের

আগামী দিনের আশা-ভরসা : শচীন ও সঞ্জয়

বিস্মিত করেছেন তাঁর দক্ষতায়। পাকিস্তানে জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজেই নিজের জাত চিনিয়েছেন শচীন। 'প্রতিভা' শব্দটা গাওস্করের পর অনেকদিন পরে ঠিকভাবে প্রয়োগ করা যাচ্ছে শচীনের ক্ষেত্রে। এখন পুরো দশকটাই রয়েছে শচীনের দুর্দান্ত 'ড্রাইভ'-এর জন্য।

পাকিস্তানে রানের বন্যা বইয়ে চব্বিশ বছরের মরাঠী যুবক সঞ্জয় মঞ্জরেকরও দেখালেন, ক্রিকেটে যথার্থ টেকনিকের কোনও বিকল্প নেই। 'কপিবুক ক্রিকেট' খেলতে ভালবাসেন প্রয়াত ক্রিকেটার বিজয় মঞ্জরেকরের ছেলে সঞ্জয়। এই দশকের ভারতীয় ব্যাটিং যে অনেকখানিই সঞ্জয়-নির্ভর হবে, তা বলার জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না।

পাকিস্তানের সেলিম মালিক, অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ ও, মার্ক টেলরও শচীন, সঞ্জয়ের সঙ্গে নব্বই দশক শাসনের ভার নিজেদের হাতে তুলে নেবেন বলেই মনে হয়। মালিকের মতো মারমুখী ব্যাটসম্যানকে চূড়ান্ত ফর্মে দেখার জন্য নব্বই দশক উন্মুখ হয়ে আছে।

একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ক্যালেন্ডারের একই বছরে অভিষেক সিরিজেই হাজার রান করে হইচই ফেলেছেন মার্ক টেলর। শুরুই যাঁর এই, নব্বই-এর শেষে তাঁর শেষ কোথায় হবে ?

টেনিসে এখন মধ্যগগনে স্টেফি গ্রাফ। ক্রিস এভার্ট, নাভ্রাতিলোভার যুগ শেষ। কিন্তু স্টেফিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য টেনিস কোর্টে ইতিমধ্যেই দু'একজন তৈরি হচ্ছেন। এঁদের একজন পঞ্চদশী যুগোস্লাভিয়ার মোনিকা সেলেস। অন্যজন আরও কম বয়সের, মাত্র তেরো বছরের মার্কিন কন্যা জেনিফার ক্যাপ্রিয়তি। 'ওয়ার্ল্ড টেনিস' পত্রিকার সম্পাদক তো বলেই দিয়েছেন, "নব্বইটা ক্যাপ্রিরই"। দু'জনই বড় কোনও প্রতিযোগিতা এখনও না জিতলেও, এটা বুঝিয়েছেন, জেতাটা শুধু সময়ের ব্যাপার !

ফুটবলে গুলিট, মার্কো ভ্যান বাস্তেনকে লড়াইয়ে ফেলে দেবেন পশ্চিম জার্মানির ক্লিন্সম্যান এবং ইতালির আর-এক তরুণ রবার্টো ব্যাগিও। অনেকের মতে, মারাদোনা এবং জিকোর মিলিত দক্ষতা আছে একা রবার্টোর। তা হলে তো এই দশকটা পুরোই রবার্টোর !

তবে, খেলাধুলোর জগৎ চমকে ভরা। হয়তো দেখা যাবে, হঠাৎই কোনও বিরাট মাপের খেলোয়াড় এসে আমাদের সবাইকে চমকে দিলেন। চমকে গেলেও আমরা কিন্তু খুশি হব, যদি তিনি কোনও ভারতীয় হন। আর বাংলার খেলোয়াড় হলে তো কথাই নেই !

ত্রয়োদশী জেনিফার

লিলি যাঁর ঈশ্বর

মানস চক্রবর্তী

ইদানীং এ-ধরনের ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। অন্তত কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। রঞ্জি ট্রোফির তৃতীয় দিনের খেলা শুরু হয় সাড়ে ন'টায়। সারাদিনই খেলা চলার কথা। সাংবাদিকরা সাধারণত মাঠে যান লাঞ্চের পর। সেদিনও তাঁরা প্রায় সবাই তাই করেছিলেন এবং বোকা বনেছিলেন। কারণ লাঞ্চের আগেই খেলা শেষ। অসমের দ্বিতীয় ইনিংসে বিরাট ধস। বাংলা জিতল ইনিংসে। সাগরময় সেনশর্মা ছ'টি উইকেট পেলেন, কিন্তু অসমের ইনিংস ভাঙলেন দিল্লির এক যুবক। ওটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম রঞ্জি ম্যাচ। রঞ্জি খেলার আগেই অবশ্য তিনি ইরানি ট্রোফিতে অবশিষ্ট ভারতীয় দলের হয়ে খেলে ফেলেছেন। বিরল কৃতিত্ব সন্দেহ নেই! এবং জীবনের প্রথম রঞ্জি ম্যাচেই দু' ইনিংসে ছ'টি উইকেট। খারাপ নয়। তাঁর যোগ্যতা নিয়ে যাঁরা সন্দিহান ছিলেন তাঁরা বলতে শুরু করেছেন, "মন্দ নয়। ছেলেটার

যেকোনও দিন টেস্ট দলে আসতে পারেন রাজীব শেঠ

বলে বেশ গতি আছে। দুটো সুইং-ই হাতে রয়েছে। সুব্রত গুহ, বরুণ বর্মনের পর এরকম বোলার বহুদিন আসেনি বাংলা দলে।"

অতএব রাজীব শেঠ পাকাপাকিভাবে জায়গা করে নিলেন বাংলা দলে। এবং খুব তাড়াতাড়ি। পাটনায় বিহারের বিরুদ্ধে তাঁর শিকার দাঁড়াল পাঁচটি, মাত্র এক ইনিংসেই। ছ'ফুট এক ইঞ্চি লম্বা ছেলেটি ওড়িশার বিরুদ্ধেও ভাল বল করেছেন। ওঁর বল দেখে ময়দানের এক ঝানু ক্রিকেটার বললেন, "আ রে বাবা, যতই বলুন, কিছু না থাকলে কি রাজ সিংহ ওঁকে ইরানি ট্রোফিতে খেলতে দেন? লোকে যতই ওঁর নিন্দা করুক, লোকটা ক্রিকেট বোঝে না এই অপবাদ তো ওঁর পরম শত্রুও দিতে পারবে না। এই তো বিবেক রাজদানকে নিয়ে কত কথাই হল। ও নাকি বলই করতে পারে না। সিয়ালকোটে দেখিয়ে তো দিল বল করতে জানে। শোয়েব, সেলিম মালিক আর রামিজ রাজাকে আউট করা কম ব্যাপার নয়। দেখবেন রাজীবও খুব তাড়াতাড়ি টেস্ট খেলবে। এবং কপিলের পর এই দু'টি ছেলেই টানবে ভারতকে।"

রাজীব সম্পর্কে দারুণ উচ্ছসিত রমেশ সাক্সেনা। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার এবং বর্তমানে ভারতীয় দলের নির্বাচক সমিতির অন্যতম সদস্য রমেশ তো বলেই ফেলেছেন "রাজীবকে নিউজিল্যান্ড নিয়ে যাওয়া হবে।" তবে রাজীবের নিউজিল্যান্ড যাওয়া যে নিশ্চিত এটা জোর দিয়ে বলা যায় না। কারণ, পাকিস্তানে বিবেক শেষ দিকে ভাল বল করেছেন। কপিল, মনোজকে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই নেই। সলিল আঙ্কোলাকে হয়তো কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। তা হলে জায়গা খালি থাকছে একটা। দাবিদার কিন্তু কমপক্ষে তিনজন। রাজীব শেঠ, দিল্লির অতুল ওয়াসন এবং সুপরিচিত সঞ্জীব শর্মা। নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট পিচের কথা মাথায় রেখে হয়তো পাঁচজন পেসার পাঠানো হতে পারে। তা হলেও রাজীবের জায়গা পাকা নয়।

তবে অদূর ভবিষ্যতে রাজীব যে টেস্ট খেলবেনই একথা জোর দিয়ে বলা যায়। এম আর এফ পেস ফাউন্ডেশনের এই ছাত্রটি সম্পর্কে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেছেন স্বয়ং ডেনিস লিলি, যাঁর হাতে গড়া ছাত্রদের মধ্যে রাজীব অন্যতম। বিবেক রাজদান যদি হন এক নম্বর, তা হলে রাজীব আছেন ঠিক তাঁর পরেই। দু'জনেই দিল্লির ছেলে। রাজীবের শুরু অবশ্য পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে রোহিন্টন বারিয়া ট্রোফিতে। আবির্ভাবেই চোখে পড়ার মতো বল করেন।

এত রাজ্য থাকতে বাংলার হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? ইডেনে রাজীবকে প্রশ্ন করতেই উত্তরটা দিলেন একটুও না ভেবে, "এখানে সুযোগ বেশি। বাংলার বোলিং তেমন ভাল নয়। ভাল বল করলে, নিয়মিত উইকেট পেলে রঞ্জি দলে জায়গা পাওয়া শক্ত নয়। আমি দিল্লির ছেলে। কিন্তু দিল্লি দলে তো পেসার গিজগিজ করছে। মদনলাল এখনও অবসর নেননি। রয়েছেন মনোজ প্রভাকর, সঞ্জীব শর্মা। দারুণভাবে উঠে আসছে অতুল ওয়াসন। ইরানিতে কী বলটাই না করল! দিল্লিতে তাই সুযোগ কম। খেলতে পারতাম তামিলনাড়ুতেও। কিন্তু ওখানেও নো ভ্যাকান্সি। রবিন সিংহ, ভরত অরুণ রয়েছেন। আরও দু'একজন কড়া নাড়ছে। কোথায় খেলব তা নিয়ে যখন চিন্তায় পড়েছি তখন মুশকিল আসান করলেন জগমোহন ডালমিয়া। নেহরু কাপের প্রস্তুতির জন্য উনি মাদ্রাজে গিয়েছিলেন। তখনই আমার বল দেখে ওঁর ভাল লাগে। এ ছাড়া, এ-বছরের গোড়ায় আমি বালিগঞ্জের সি সি এফ সি মাঠে এম আর এফ-এর হয়ে খেলেছিলাম। তখনও খারাপ বল করিনি। সব মিলিয়ে সুযোগটা যখন পেলাম তখন আর দু'বার ভাবিনি।" ডালমিয়ারই রাজস্থান ক্লাবে খেলছেন রাজীব। বিবেক রাজদান যেমন রঞ্জি না খেলেই টেস্ট খেলে ভারতীয় ক্রিকেটে রেকর্ড করেছেন, তেমনই কলকাতা লিগে কোনও ম্যাচ না খেলেই বাংলার হয়ে রঞ্জি খেলেছেন রাজীব।

লিলির কাছ থেকে কী কী শিখেছেন? রাজীব হেসে বলেন, "শিখেছি তো অনেক কিছুই। এখন তা কাজে লাগাবার সময়। ওঁর 'আর্ট' অব ফাস্ট বোলিং' আমাদের কাছে বাইবেল। আর লিলি হলেন ঈশ্বর।"

সেই ঈশ্বরকেই মনে মনে পুজো করেন রাজীব শেঠ।

ভারতকে একসময় বলা হত 'স্পিন বোলারদের দেশ'। ভারতীয় স্পিনারদের আগের সেই গৌরবময় দিনগুলি আর নেই। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দারুণভাবে উঠে এসেছেন ফাস্ট মিডিয়াম বোলার কপিল দেব। বিশ্ব ক্রিকেটে সফল হতে হলে দলে কপিলের মতো একাধিক বোলার দরকার। তাই, এম আর এফ পেস ফাউণ্ডেশন নতুন ফাস্ট বোলার তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন।

ফাস্ট বোলার তৈরির কারখানা

সমীর চৌধুরী

বাড়ির নাম 'উইকেট্স'। মাদ্রাজে ছ' কামরার সুদৃশ্য এই বাড়িটিতে থাকেন এম আর এফ পেস ফাউণ্ডেশনের শিক্ষার্থী এক ডজন ফাস্ট বোলার। এই ফাউণ্ডেশনের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিবেক রাজদান ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলে সাড়া জাগিয়েছেন। শিয়ালকোটে ভারত পাকিস্তান চতুর্থ টেস্টের প্রথম ইনিংসে বিবেক পাঁচ-পাঁচটি উইকেট দখল করে এম আর এফের 'উইকেট্স' বাড়িটির নামের সার্থকতা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এম আর এফ ফাউণ্ডেশনের প্রাক্তন আর এক ছাত্র রাজীব শেঠ তো এখন বাংলা দলের হয়ে খেলছেন। শুধু খেলাই নয়, রাজীবের পেস বোলিং বাংলা দলের এখন বড় ভরসা।

এম আর এফ পেস ফাউণ্ডেশন ভারতে পেস বোলার তৈরি করার কাজটি স্বেচ্ছায় নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিয়েছেন এটা তো সবাই জানেন। কিন্তু ফাউণ্ডেশন ঠিক কীভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন, কারা তাঁদের সাহায্য করছেন এ নিয়ে সবার কৌতূহল থাকলেও বিশদ খবর অনেকেই জানেন না। ১০ বছরেরও আগে এম আর এফ এদেশে মোটর স্পোর্টস-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ট্র্যাক রেস ও র‍্যালি—দুটিতেই তাঁরা সাহায্য করছেন। এম আর এফ বিশ্বসিরিজ জওহরলাল নেহরু কাপ নিয়ে এদেশে উৎসাহ-উদ্দীপনা কম দেখা যায়নি। নিউজিল্যান্ড দল এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের গ্রিনিজ ছাড়া বিশ্ব ক্রিকেটের প্রায় সব তারকাই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এম আর এফের গর্ব তাঁদের পেস ফাউণ্ডেশন। বিশ্বে এটাই এ-ধরনের প্রথম ফাউণ্ডেশন। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ৩৯ বছর বয়সী রবি মামেন এই ফাউণ্ডেশন গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। মামেন নিজে এক সময় তামিলনাড়ু স্কুল ক্রিকেটের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৮৭ সালের কথা। মামেন ভাবলেন, ভারতে ফাস্ট বোলারদের জন্য যদি আমরা একটি ফাউণ্ডেশন গড়ে তুলি কেমন হয়। এমনকী, কপিলদেবও ফাস্ট মিডিয়াম বোলার। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় ক্রিকেটকে যদি সত্যিই কাজের কাজ কিছু করতে হয়, তা হলে দক্ষ কয়েকজন ফাস্ট বোলার দরকার। কথাটা ভাবামাত্রই মামেন চিঠি লিখলেন অস্ট্রেলিয়ার ডেনিস লিলিকে। লিলি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানালেন।

১৯৮৭-এর ডিসেম্বরে লিলি ১৮টি ছেলেকে বেছে নিলেন। পরে ছ' জনকে বাদ দেওয়া হয়। ১২জন শিক্ষার্থীকেই ফাস্ট বোলিংয়ের তালিম দেওয়া হচ্ছে। এদের বলা হয় 'দ্য ডেড্‌লি ডজন'। তামিলনাড়ুর প্রাক্তন ফাস্টবোলার টি· এ· শেখরকে করা হয়েছে প্রধান কোচ।

১২জন ছাত্রের বয়স ১৭ থেকে ২০। তাদের লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ভ্রমণ ইত্যাদি সব খরচখরচাই মেটান এম আর এফ। শহরে তাদের ঘোরাঘুরির জন্য আছে অলউইন নিশান ভ্যান। ছাত্রপিছু বছরে খরচ করা হয় এক লাখ টাকারও বেশি। আর যদি ১২জনের জন্য বছরের মোট খরচ ধরা হয় তা হলে অঙ্কটা দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ। ছাত্রদের প্রত্যেককেই তিন বছরের জন্য একটি চুক্তিতে সই করতে হয়েছে। খেয়ালখুশিমতো তারা যাতে হঠাৎ চলে না যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

ফাস্ট বোলারদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শেখর (বাঁদিক থেকে চতুর্থ) ও ডেনিস লিলি (বাঁ দিক থেকে পঞ্চম)

ফাস্ট বোলিংয়ের তালিম দেওয়া হয় মাদ্রাজের একটি স্কুলের মাঠে। সেখানে আছে প্র্যাকটিসের নেট ও জিমনাসিয়াম। সকালে ও সন্ধ্যায় দৈনিক ছ'ঘণ্টা ছাত্রদের শিক্ষা নিতে হয়। তা ছাড়া সপ্তাহান্তে যদি প্রথম ডিভিশন লিগের খেলা থাকে তা হলে ছাত্ররা সেই খেলাগুলিতেও অংশ নেয়। লিলি বছরে চারবার আসেন। প্রতিবার সাতদিন থেকে ১০দিন তিনি ছাত্রদের মধ্যে থেকে তাদের শিক্ষা দেন।

তবে ফাস্ট বোলিংই শুধু নয়, ছাত্ররা যাতে প্রকৃত অর্থে অলরাউন্ডার হয়ে উঠতে পারেন সেদিকেই বোধহয় ফাউন্ডেশন নজর দিয়েছেন। টি· এ· শেখর বলেছেন, "ছাত্ররা সবাই একদিন দুর্দান্ত অলরাউন্ডার হয়ে উঠবেন। এদেরই একজন সমীর মেহরা। সে ১৯ বছরের কমবয়সী দলের হয়ে সম্প্রতি পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল। সে পেয়েছে 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' পুরস্কার।" শেখর আরও জানিয়েছেন, "ছাত্রদের খাদ্যতালিকা, ব্যায়ামের সময়সূচি, সাঁতার, বোলিং, স্প্রিন্টিং সব কিছুর ওপরেই নিয়মিত নজর রাখা হয়। এ-সব ব্যাপারে ছাত্ররা যাতে কোনওরকম ভুল

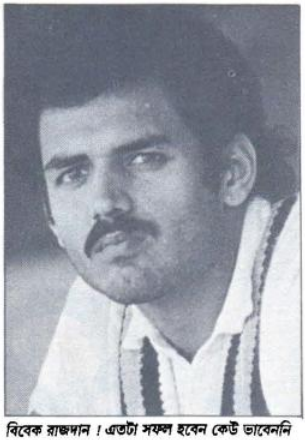

বিবেক রাজদান ! এতটা সফল হবেন কেউ ভাবেননি

না করে তার জন্যই এভাবে সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে।"

এম আর এফ পেস ফাউন্ডেশন যদি সত্যিই ভারতকে অন্তত একজনও দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার উপহার দিতে পারেন, তা হলে সেটা হবে অত্যন্ত আশার কথা। তখন অনেকেই হয়তো এম আর এফের পথের অনুগামী হতে চাইবেন। লিলি অবশ্য নিউজিল্যান্ডেও ফাস্ট বোলিং শেখান। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট-বোর্ড লিলির কাছ থেকে এই সাহায্য নিচ্ছেন। কিন্তু কোনও বেসরকারি কোম্পানির গড়া ফাউন্ডেশনের সঙ্গে লিলি আর কোথাও যুক্ত হননি। বা, অন্যত্র এরকম পেস ফাউণ্ডেশনও আছে কি না সে খবরও ক্রিকেটরসিকরা জানেন না।

পেস ফাউন্ডেশনের কয়েকজন ছাত্র ইতিমধ্যেই রঞ্জি ট্রোফিতে খেলছেন। বর্তমান ছাত্রদের শিক্ষা শেষ হয়ে গেলে আবার ১২জনকে বেছে নেবেন লিলি। আজকের 'ডেড্‌লি ডজন' সত্যিই ব্যাটস্‌ম্যানদের ঘুম কেড়ে নিতে পারে কি না তা জানার জন্য আমাদের এখনও অপেক্ষা করতে হবে। তবে, লিলি যে কথাটা বলেছেন সেটাও আগে ভেবে দেখা দরকার। ফাস্ট বোলিংয়ের উপযুক্ত পিচ ভারতে তৈরি করতে হবে। তখনই ফাস্ট বোলারদের প্যাভেলিয়ন থেকে নিয়মিত বেরিয়ে আসতে দেখা যাবে। তখনই তাঁরা সত্যি মাঠ কাঁপাবেন।

গ্যালারি থেকে

শেক্‌সপিয়র থিয়েটারের জন্য ক্রিকেট

লন্ডনের গ্লোব থিয়েটার আবার নতুন করে গড়ে তোলার তোড়জোড় চলছে। প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্যের জন্য শেক্‌সপিয়র গ্লোব ট্রাস্ট আবেদন জানিয়েছেন। এ-বছর এপ্রিল মাসে একটি চ্যারিটি ক্রিকেট ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়েছে। এক দিকে খেলবেন লর্ডস ট্যাভারনার্স, অন্য দিকে নামীদামি ব্যক্তিদের নিয়ে একটি দল গড়া হবে। দ্বিতীয় এই দলটিতে থাকবেন অভিনেতা পিটার ও'টুল এবং ইয়ান ওগিলভি। উদ্যোক্তাদের আশা, তাঁরা এই ম্যাচটি থেকে আড়াই লক্ষ পাউন্ড সংগ্রহ করতে পারবেন। প্রতিটি টিকিটের দাম ৫০০ পাউন্ড। তাতে দুপুরের খাওয়া, চা ও সন্ধেবেলার পার্টির খরচ ধরা হয়েছে। অর্থাৎ,ওই দামে টিকিট কিনলে এগুলি নিখরচায় পাওয়া যাবে।

টেনিস নিয়ে জল্পনা

জনপ্রিয় খেলা টেনিস। শুধু আমেরিকাতেই ৫০ হাজারের বেশি টেনিস ক্লাব আছে। এবং শুধু খেলা হিসেবেই টেনিস জনপ্রিয় নয়। টেনিস খেলোয়াড়দের নিয়েও চলে নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা। শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা তো সব সময়ই সংবাদের শিরোনাম। ইভান লেন্ডল প্রতি বছর ক'টা র‍্যাকেট ব্যবহার করেন ? তিরিশের দশকের চ্যাম্পিয়ান ফ্রেড পেরি প্রথম সার্ভ করার সময় বাঁ হাতে

ইভান লেণ্ডল

ক'টা বল রাখতেন ? চার্লি চ্যাপলিন কাকে টেনিস খেলতে দেখে বলেছিলেন, এরকম সুন্দর দৃশ্য তিনি আর আগে কখনও দেখেননি ? যাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করেন তাঁরা উত্তরও দিতে পারেন চটপট। তাঁরাই জানিয়ে দেবেন, লেন্ডল বছরে ১২০টি থেকে ১৬০টি র‍্যাকেট ব্যবহার করেন। প্রথম সার্ভ করার সময় তিনটি বল বাঁ হাতে রাখতেন ফ্রেড পেরি। হেলেন উইল্‌সকে টেনিস খেলতে দেখে চ্যাপলিন বলেছিলেন, এটাই তাঁর জীবনে দেখা সবচেয়ে সেরা দৃশ্য ! অস্ট্রেলিয়ান ওপেন টেনিসের আসর বসছে আর কয়েক দিনের মধ্যেই। ইতিমধ্যেই বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর এই টুর্নামেন্টের বল নিয়ে শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়রা ছিলেন রীতিমত ক্ষুব্ধ। দক্ষিণ কোরিয়ায় তৈরি ওই বল নিয়ে লেন্ডল, বেকার দু'জনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তবে সেই সময় বিশ্বের এক নম্বর টেনিস-খেলোয়াড় ম্যাট্‌স ভিল্যান্ডার কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চুপচাপই ছিলেন। হয়তো কারণও ছিল। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডেই তাঁকে স্ট্রেট সেটে ধরাশায়ী করেছিলেন ভারতের রমেশ কৃষ্ণন।

ওয়াকার ইউনুসকে বলা হচ্ছে পাকিস্তানের ইয়ান বিশপ

অনুপ সেন

নতুন ফাস্ট বোলারের খোঁজে ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি দেশের কর্মকর্তারাই এখন জোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। ভারত এখনও কপিল দেবের জুড়ি খুঁজে পায়নি। সলিল আঙ্কোলা ও বিবেক রাজদান অবশ্য কিছুটা আশা জাগিয়েছেন। পাকিস্তানের ইমরান খানের বয়স হয়েছে। পড়ন্ত বেলার ক্রিকেটার তিনি। ইতিমধ্যেই তাঁর জায়গা অনেকটা দখল করে নিয়েছেন ওয়াসিম আক্রম। আর আগামী দিনে আক্রমের সঙ্গে পাকিস্তান দলের হয়ে হয়তো পাকাপাকিভাবে বোলিং ওপেন করতে দেখা যাবে ওয়াকার ইউনুসকে। শারজায় ১৯৮৯-র অক্টোবরে দারুণ বল করে সবার নজর কেড়ে নিয়েছিলেন এই ইউনুস। এবং তারপর থেকেই ইউনুসকে গড়ে-পিটে নিচ্ছেন স্বয়ং ইমরান খান।

ইউনুস-পরিবার বরাবরই ক্রিকেটের ভক্ত। ইউনুস বলেছেন, "আমার বাবা আমাকে সবসময়ই উৎসাহ দিয়েছেন। স্কুলে পড়ার সময় তিনি আমাকে বলতেন, 'তোমাকে পাকিস্তান দলের হয়ে খেলতে হবে।' আমার বাবা নিজে ভলিবল খেললেও ক্রিকেট ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান।"

পাক পঞ্জাবের ভিয়ারি জেলার বুড়েওয়ালায় ১৯৭১-এর ১৬ নভেম্বর ওয়াকার ইউনুস মেত্‌লার জন্ম। ১৯৭৯-এ ইউনুস পরিবার চলে যান শারজায়। ১৯৮৪ পর্যন্ত ওয়াকার ছিলেন সেখানকার স্কুলের ছাত্র। শারজা ক্রিকেট স্টেডিয়ামেই তিনি তাঁর গুরু ইমরান খানকে বল করতে দেখেছিলেন।

ক্রিকেটার হওয়াই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উচ্চাশা। তাই তাঁর বাবা তাঁকে আবার পাঠিয়ে দেন পাকিস্তানে। তখন ইউনুসের বয়স মাত্র ১৩। তাঁর বাবা জানতেন, পাকিস্তানে ফিরে না গেলে ছেলের জীবনের উচ্চাশা পূর্ণ হবে না।

বুড়েওয়ালার সাদিক পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন ইউনুস। ১৯৮৫-তে তিনি প্রথম শ্রেণীর দল বুড়েওয়ালা হোয়াইট্‌স-এ খেলতেন। ১৯ বছরের কম বয়সীদের দলে অচিরেই তাঁর জায়গা হয়। উইলস্ প্যাট্রন ট্রোফিতে তিনি মুলতান ডিভিশনের হয়ে খেলে পাঁচটি ম্যাচে ২২টি উইকেট পান।

বল করতে আসার সময় স্প্রিন্টারের মতো তাঁর দৌড় ছিল দেখার মতো। ছিল বলের দুরন্ত গতি। নির্বাচকদের তিনি নজর কেড়ে নেন। বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাই পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের মূল কাঠামোটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সবাইকে টেক্কা দিয়ে পাকিস্তানের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড ইউনুসকে টেনে নেন।

কায়েদ-এ-আজম ট্রোফিতে ১৯৮৮-'৮৯ মরসুমে ইউনুস পাঁচটি ম্যাচে ২৩টি উইকেট নিয়ে ফাস্ট বোলারদের মধ্যে নিজের নাম সবার ওপরে রাখতে পেরেছিলেন। ভারতের ১৯ বছরের কমবয়সী ক্রিকেট-দলের বিরুদ্ধে গুজরানওয়ালা ও করাচি টেস্টে তাঁকে পাকিস্তান দলে নিতে কোনওরকম দ্বিধা করেননি নির্বাচকরা।

তবে দুরন্ত গতিতে বল করলেও নিখুঁত নিশানা ছিল না ওয়াকার ইউনুসের। তার ওপর আবার প্রায়ই তিনি শর্ট-পিচ বল করতেন। ফলে নির্বাচকরা তাঁকে নিয়ে ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এমন সময় সুপার উইলিস কাপের খেলা। দিল্লির বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেড। গত সেপ্টেম্বরে লাহোরে এই ম্যাচে দারুণ বল করলেন ইউনুস। তখনও জানতেন না অলক্ষ্যে ইমরান তাঁর বোলিং দেখছেন টেলিভিশনের পরদায়। ইমরান তখন লাহোরে। ক্রিকেট-শিবিরে যোগ দেওয়ার ডাক পেলেন ইউনুস। ইমরান ইউনুসের 'রান-আপ' কিছুটা কমিয়ে দিলেন। বললেন, "এতটা ছুটে এসে বল করার দরকার নেই। আর স্প্রিন্টারের মতো নয়, তোমাকে ছুটে আসতে হবে একেবারে উইকেট লক্ষ্য করে।" ইউনুস শুনলেন ইমরানের পরামর্শ। শুধু তা'ই নয়। ১৯৭৪ থেকে ইমরানের সব ম্যাচের ভিডিও রেকর্ড তিনি সংগ্রহ করলেন। নতুন জীবন শুরু হল তাঁর। ওয়াকার ইউনুসের 'মডেল' হলেন ইমরান।

১৯৮৯-এর ১৪ অক্টোবর শারজায় তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেলেছেন। ওয়াসিম আক্রম প্রথম ওভার শেষ করা মাত্রই ইমরান বল তুলে দিয়েছিলেন ইউনুসের হাতে। ইউনুসের বলের গতির চেয়েও ইমরানের সিদ্ধান্তই বেশি বিস্মিত করেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের। কিন্তু সেবার মাঠে হঠাৎ আহত হয়ে পড়ায় ইউনুসকে ধরাধরি করে মাঠের বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ভারতের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচটি তিনি খেলতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচে ফিরে এসে দুই ওপেনার—সিমন্‌স ও হেন্‌স-এর উইকেট দখল করেছিলেন। ওই ম্যাচে ন' ওভারে ২৮ রানে তিনটি উইকেট পান ইউনুস।

ইউনুস বলেছেন, "সাধনা থাকলে কোনও স্বপ্নই ব্যর্থ হয় না। যে শারজা স্টেডিয়ামে দর্শক হিসেবে আমি উপস্থিত থাকতাম, সেই স্টেডিয়ামেই হল আমার ক্রিকেট-জীবনের সূচনা। আর ইমরান নিজে আমার পাশে থেকে আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলেন। এই স্বপ্নই তো আমি দেখেছিলাম।"

সেদিন ওয়াকার ইউনুসের মা ছেলের খেলা দেখতে, ছেলেকে উৎসাহ দিতে পাকিস্তান থেকে সরাসরি শারজার স্টেডিয়ামে চলে এসেছিলেন।

তবে ইমরানের শিষ্য হলেও, অনেকেই এখন বলছেন ওয়াকার ইউনুস হলেন পাকিস্তানের ইয়ান বিশপ। বিশপের মতোই নাকি তাঁর বল করার ভঙ্গি। এমনকী বলের কিছু কলাকৌশলও বিশপের মতো।

ওয়াকার ইউনুস

গৌতম সরকার

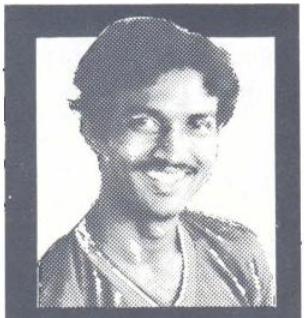

মাঝমাঠের লড়াই

পূর্ব প্রকাশিতের পর

মোহনবাগান ১৯৭৭ সালে ত্রিমুকুট পেল। আমি দারুণ শান্তি পেলাম। মানুষের সময় সর্বদা এক যায় না, প্রমাণ হল। আগের বছরের ব্যর্থতা ও অপমান ফিরে এল সাফল্য ও অভিনন্দন হয়ে। সেই সময় সবচেয়ে সুখী মানুষ ছিলাম বোধহয় আমি আর সুধীর। একদিকে জয়ের আনন্দ, অন্যদিকে পেলের আশীর্বাদ—বছরটা সত্যিই দুর্দান্ত কাটল।

তবে সাফল্যের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে কখনওই আমি অতীতকে একেবারে ভুলে যেতে পারিনি। মাঝে-মাঝেই মনে হত, পুরনো ক্লাবের অনেকের কথা। বিশেষ করে একজনের কথা তো আমি কখনও ভুলব না। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মালী শঙ্কর।

লিখলাম মালী, কিন্তু শঙ্করভাইকে আমরা কোনও খেলোয়াড়ই মালী বলে মনে করিনি। বড়-বড় অনেক খেলোয়াড়ই শঙ্করভাইয়ের কাছ থেকে খেলার বিষয়ে পরামর্শ নিত, আমি তো কোন ছার! ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এরকম প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আমি খুব কম লোককেই দেখেছি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, ইস্টবেঙ্গলের তাবড়-তাবড় অনেক কর্মকর্তাও তাঁদের ক্লাবকে এতখানি ভালবাসেন না। আসলে, ভালবাসার ক্ষেত্রে নিজের কোনও স্বার্থের কথা চিন্তা করেনি বলেই এই দক্ষিণী মানুষটি চিরটাকাল নিষ্ঠাভরে একটি ক্লাবেরই সেবা করে গেল। সমর্থকরা জয়ের আনন্দে যখন খেলোয়াড়দের মাথায় তোলে, তখন নেপথ্যের এই মানুষগুলোর কথাও একটু মনে রাখলে ভাল হয়।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে তখন সদ্য এসেছি। কিছুদিনের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্র্যাকটিসে ফিরে এলাম। প্র্যাকটিসের পর ভীষণ ক্লান্ত লাগত। কী খাব না খাব, এসব নিয়ে ভাবছি। একদিন সকালে দেখি শঙ্করভাই পেঁপে নিয়ে উপস্থিত, সুন্দর করে কেটে একেবারে প্লেটে সাজিয়ে। অসুস্থতার পর ভাল খাবার খাওয়া উচিত ঠিকই, কিন্তু শঙ্করভাই যেন কার কাছ থেকে শুনেছিল আমি পেঁপে দারুণ ভালবাসি। তাই, স্বাস্থ্যপ্রদ অথচ আমার প্রিয় খাবারটি নিয়েই একেবারে হাজির। এই হল শঙ্করভাই—যার ঠিক যা প্রয়োজন শঙ্করভাই একটা কথা না বলেও তা ঠিক বুঝে নেয়।

এই যে শঙ্করভাই আমার মতো এক সাধারণ খেলোয়াড়কে অতি সাধারণ এক ঘটনার মধ্যে দিয়ে ভালবাসার জালে বেঁধে ফেলল, তা বোধহয় আর কখনও কাটিয়ে উঠতে পারব না। প্রত্যেকটি খেলোয়াড় কোন মোজা, কোন বুট পরবে, কোন বুট পরলে মাঠে বেশি কাজ দেবে—এসব শঙ্করভাই-ই ঠিক করে দিত। প্রদীপদার মতো কোচও ব্যাপারটায় খুব একটা কিছু বলতেন না। তাঁরও অগাধ আস্থা ছিল শঙ্করভাইয়ের ওপর।

ইস্টবেঙ্গল কোনও ম্যাচ জেতার পর শঙ্করভাইয়ের আনন্দ ছিল দেখবার মতো। কত ম্যাচে আমি হয়তো ভাল খেলেছি, খেলার শেষে একেবারে শিশুর মতো জড়িয়ে আমাকে আদর করত, কেঁদে ফেলত। আবার এমনও হয়েছে, বাজে খেলেছি, আমাকে একমাত্র শঙ্করভাই-ই সরাসরি বকাবকি করত। বলত, "মন কোথায় আছে? এটা কি তোমার খেলা?" অথবা "এরকম খেললে তোমায় আর ইস্টবেঙ্গলে খেলতে হবে না, পাড়ার ক্লাবে গিয়ে খেলো!" নীরবে শুনে যেতাম। জানতাম, আমাকে পছন্দ করে বলেই আমি বাজে খেললেই শঙ্করভাই কষ্ট পায়। স্তাবক-পরিবৃত এখনকার পরিবেশে এই ধরনের মানুষ ক্রমশ কমে আসছে। এখনও মাঝে-মাঝে প্রয়োজনে মাঠে নামলে ভাবি, শঙ্করভাই থাকলে বকাবকির ভয়ে হয়তো ভালই খেলে ফেলতাম!

মোহনবাগানে এসেও পেয়ে গেলাম আমার আর-এক পছন্দসই মালীকে। গজিয়া। ভাসিয়াকেও আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু গজিয়ার প্রতি আমার কেন যেন এক দুর্বলতা গড়ে উঠেছিল। ম্যাচের আগে ওকে দেখলে 'সে-ম্যাচ আমি ভাল খেলতামই। এবং ওর এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, ম্যাচের আগে ও যা ভবিষ্যদ্বাণী করত, সেটাই ফলে যেত। ওর এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণীর কোনও বাস্তবভিত্তি নেই, তবু ওর মতামতকে দারুণ গুরুত্ব দিতাম। কোনও ছোট ম্যাচের আগে সে হয়তো বলত, "জেতা মুশকিল, একদম আলগা দিও না।" সত্যি-সত্যি দেখা যেত, ম্যাচটা প্রায় আটকে গেল। কোনওরকমে শেষ মুহূর্তের গোলে সম্মান রক্ষা হয়েছে।

মোহনবাগানে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই গজিয়ার সঙ্গে আমার একটা ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে যে ঘরোয়া ব্যাপারটা ছিল এখানে এসে সেটা পাব কি না যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কিন্তু দেখলাম, গজিয়ার মতো লোক যেখানে থাকে সেখানে ঘরোয়া ব্যাপারটা গড়ে উঠতে বেশি সময় লাগে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

আসলে খেলা মানেই যে খেলোয়াড়, কোচ, অনুশীলন, ক্লাব আর টাকা নয়, আরও অনেক কিছু, অনেকের স্নেহ আর ভালবাসা, তা মাঠে যারা এসেছে তারাই জানে। নতুন করে বলার কিছু নেই। এদের জন্যই মাঠ এখনও যন্ত্র হয়নি। এই শঙ্করভাই, গজিয়া, ভাসিয়াদের জন্য।

আর-একজনের কথাও এখানে বলি। মোহনবাগানের ক্যান্টিনের গঙ্গা। ও আবার ছিল আমার আপাদমস্তক ফ্যান। মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থক তো বটেই। ক্লাব খারাপ খেললে তবু সমালোচনা করত, কিন্তু আমি খারাপ খেললে কখনও স্বীকার করত না। অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করত। আমি নিজেই আড়াল থেকে শুনেছি, ও বুঝিয়ে যাচ্ছে, "গৌতমদা বলটা ঠিকই বাড়িয়েছিল, অমুকদা ধরতে পারেনি। পারলেই গোল।" আমি হাসতাম মনে-মনে। কেননা, জানতাম, বলটা সত্যিই আমি ভুল বাড়িয়েছি। কিছু বলতাম না, কেননা, আমাকেও হয়তো বলে দেবে, "না, না, আপনি কিছু জানেন না। বলটা ঠিকই ছিল।..." (ক্রমশ)

অনুলিখন : তানাজি সেনগুপ্ত

বর্ষসেরা গুলিট

'ওয়ার্ল্ড সকার' পত্রিকা ১৯৮৯-র বর্ষসেরা ফুটবলার, ম্যানেজার ও দলের নাম ঘোষণা করেছে। এই পুরস্কার কারা পাবেন তা পাঠকদের ভোটের মাধ্যমে ঠিক হয়। ১৯৮৯-র বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন মিলান ও হল্যান্ড দলের রুড গুলিট। তিনি পেয়েছেন ২৪ শতাংশ ভোট। ১৮ শতাংশ ভোট পেয়ে তাঁর পরের আসনটি দখল করে নিয়েছেন তাঁরই সতীর্থ মার্কো ভ্যান বাস্তেন। ফ্রেমেঙ্গো, ভাস্কো ও ব্রাজিলের নয়া প্রজন্মের খেলোয়াড় বেবেটো আছেন তৃতীয় স্থানে। তিনি পেয়েছেন শতকরা ১০টি ভোট। নেপোলি ও আর্জেন্টিনার স্বনামধন্য দিয়েগো মারাদোনা সাত শতাংশ ভোট পেয়ে চতুর্থ স্থানটি নিজের জন্য সুরক্ষিত করেছেন। পঞ্চম স্থানে আছেন মিলান ও ইতালির ফ্রাঙ্কো বারেসি। তিনি পেয়েছেন সাড়ে ছয় শতাংশ ভোট। ইংল্যাণ্ডের গোলরক্ষক পিটার শিল্টন আছেন ষষ্ঠ স্থানে। তারপরেই আছেন জুভেন্টাস, বার্সেলোনা ও ডেনমার্কের মাইকেল লড্রপ। নবম স্থান পশ্চিম জার্মানির লোথার ম্যাথিয়াস-এর। দশম স্থানে আছেন উরুগুয়ের রুবেন সোসা। একাদশ স্থান নেপোলি ও ব্রাজিলের কারেকা। দ্বাদশ স্থানে রিয়েল মাদ্রিদ ও মেক্সিকোর হুগো সাঞ্চেজ। রুড গুলিট গত বছর অল্প কয়েকটি ম্যাচেই অংশ নিতে পেরেছিলেন। হাঁটুর চোট ও আঘাত নিয়ে অনেকটা সময়ই তাঁকে মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে। তবু বাস্তেনের চেয়ে ভোট বেশি পেলেন। গুলিটই বিশ্বের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি দু'বার বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পেলেন।

১৯৮৭-তে তিনি প্রথমবার বর্ষসেরা হয়েছিলেন। ১৯৮৮-তে তিনি হয়েছিলেন রানার-আপ। সেবার শ্রেষ্ঠত্বের

রুড গুলিট

মার্কো ভ্যান বাস্তেন

শিরোপা পান ভ্যান বাস্তেন। গুলিটের বয়স ২৭ (জন্ম ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)। বাস্তেনের বয়স ২৫ (জন্ম ৩১ অক্টোবর, ১৯৬৪)।

বর্ষসেরা ম্যানেজার

মিলানের কোচ আরিগো সাচ্চি 'ওয়ার্ল্ড সকার' পত্রিকার পাঠকদের বিচারে বর্ষসেরা ম্যানেজারের সম্মান পেয়েছেন। ৪৩ বছর বয়সী (জন্ম ১ এপ্রিল ১৯৪৬) সাচ্চি মিলান দলের ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে গৌরবজনক ভূমিকার নেপথ্য রূপকার। একসময় খেলোয়াড় হিসেবে সাচ্চির কোনও নামডাক ছিল না। কিন্তু ১৯৭৭-এ সেসেনা ইয়ুথ দলের কোচ হওয়ার পর থেকেই তিনি আস্তে আস্তে নিজের দক্ষতা দেখাতে শুরু করেন। সাচ্চির পর দ্বিতীয় স্থানে আছেন ব্রাজিলের কোচ সেবাস্তিয়াও লাজারোনি। লাজারোনির বয়স ৩৯ (জন্ম ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০)। লাজারোনি গত বছরের গোড়ার দিকে

জর্জ গ্রেহাম

কার্লোস আলবার্তো দা সিল্‌ভার জায়গায় ব্রাজিলের কোচ হন। তিনি একসময় ছিলেন মাঝারি মানের একজন গোলরক্ষক। কিন্তু রায়ো ডি জানোরিও-তে তিনি কোচ হিসেবে নাম করেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৮—একটানা তিন বছর তাঁর প্রশিক্ষণে রাজ্য চ্যাম্পিয়ান হয় তাঁর দল। কিন্তু প্রশিক্ষক হিসেবে জীবনের বড় সাফল্য তিনি দেখিয়েছেন ফ্রেমেঙ্গো দলে। আর তাঁর প্রশিক্ষণেই গত বছর ব্রাজিল দল দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়ান হয়। খেলোয়াড়দের নাম-ডাকের পেছনে তিনি দৌড়ন না। দক্ষ ও নতুন খেলোয়াড়দের নিয়েই দল গড়ে তিনি একাধিকবার সফল হয়েছেন। 'ওয়ার্ল্ড সকার'-এর পাঠকদের বিচারে বর্ষসেরা ম্যানেজারদের তালিকার তৃতীয় স্থানে আছেন আর্সেনাল-এর জর্জ গ্রেহাম এবং চতুর্থ স্থানে

আরিগো সাচ্চি

সেবাস্তিয়াও লাজারোনি

লিভারপুল দলের কেনি ডালগ্লিশ। বার্সেলোনার যোহান ক্রুইফ আছেন একাদশ স্থানে। দ্বাদশ স্থানে আছেন পশ্চিম জার্মানির ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। বর্ষসেরা দলগুলির প্রথমেই আছে মিলান। তারপর ব্রাজিল। তৃতীয় স্থানে আর্সেনাল। নেপোলি চতুর্থ, লিভারপুল পঞ্চম এবং ডেনমার্ক আছে ষষ্ঠ স্থানে।

আশিস উপাধ্যায়

প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করার কৌশল সিকেন গিদান বারাই

শিবাজি গঙ্গোপাধ্যায়

কিওকুশিন ক্যারাটের ব্লক বা প্রতিপক্ষের মার আটকানোর পদ্ধতি নিয়ে আমি গত দুটো সংখ্যায় আলোচনা করেছি। এবারও কিওকুশিন ক্যারাটের একটি ব্লক নিয়ে আলোচনা করব। প্রতিপক্ষকে মারার পদ্ধতি বা কৌশল ঠিকমতো না জানলে বা অনুশীলন না করলে প্রতিপক্ষকে কাবু করা মুশকিল। এগুলো ভালভাবে অনুশীলন না করলে, প্রতিপক্ষের মার ঠিকভাবে আটকাতে না পারলে প্রতিপক্ষের মারের আঘাতে নিজেই কাবু হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা এবং সেই সঙ্গে শারীরিক ক্ষতিরও আশঙ্কা থাকতে পারে। আমি যে ব্লকটা নিয়ে এখন আলোচনা করব তার জাপানি নাম 'গিদান বারাই' বাংলায় আমরা বলি শরীরের নীচের অংশের মার আটকানোর কৌশল। তবে এখানে শরীরের নীচের অংশ বলতে বিশেষ ভাবে গ্রইন এবং তলপেটের অংশের জন্যই এই ব্লক অনুশীলন করা হয়। গিদান বারাই-এর পুরো নাম 'সিকেন গিদান বারাই'।

সিকেন গিদান বারাই : প্রথমে ইওই দাচিতে দাঁড়াতে হবে। তারপর সেখান থেকে দাঁড়ানোর ভঙ্গির পরিবর্তন করে সানচিন্ দাচিতে ঠিকভাবে দাঁড়াতে হবে। প্রথমে বাঁ হাতটা মুঠো শক্ত রেখে বাঁ উরুর বাইরের দিকের লাইন বরাবর রাখতে হবে। বাঁ হাতের কনুই একটু মোড়া থাকবে। ডান হাতটা ডান পাঁজরার একেবারে ওপর ভাগ স্পর্শ করে মুঠো শক্ত রেখে দাঁড়াতে হবে। এই অবস্থায় কোমর থেকে শরীরের ওপর ভাগ ডান দিকে ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে থাকবে। এবার ডান হাত দিয়ে প্রথম ব্লক শুরু করতে হবে। প্রথমে বাঁ হাতটাকে মুঠো শক্ত রেখে গ্রইনস্-এর সামনে রেখে ডান হাতটা যেখানে ছিল সেখান থেকে ওপরে তুলে মুঠোটা কপালের সমান উচ্চতায় মুখের ডান দিকে মুখের লাইন থেকে অন্তত তিন-চার ইঞ্চি এগিয়ে এনে মুখের সামনে থেকে কপালের উচ্চতায় ঘুরিয়ে বাঁ দিকে কানের উচ্চতায় এনে তারপর কোনাকুনি ভাবে ডান উরুর বাইরের লাইন বরাবর এনে শেষ করতে হবে। ডান হাত কনুই থেকে একটু মোড়া থাকবে, সেইসঙ্গে বাঁ হাতটা গ্রইন্স-এর সামনে থেকে উঠে এসে বাঁ দিকে পাঁজরার ওপরের অংশ স্পর্শ করে শেষ হবে। এইভাবে ডান হাতের ব্লক হয়ে গেলে আবার ঠিক একইভাবে বাঁ হাতের ব্লক অনুশীলন করতে হবে। প্রতি হাতে কুড়িবার করে অনুশীলন করতে হবে। হাতের মুঠো বেশ শক্ত রেখে ব্লক অনুশীলন করতে হবে। গ্রইনস্-এর তলপেট শরীরের অন্যতম দুর্বল স্থান। এই ব্লকে প্রতিপক্ষের যে-কোনও রকম আঘাত প্রতিহত করা যেতে পারে। প্রতিটি ব্লকের সঙ্গে শরীরের ওপরভাগ (কোমর থেকে) ৪৫ ডিগ্রি ঘুরবে, যখন বাঁ হাতের ব্লক হবে তখন শরীরের ওপরভাগ ডান দিকে ঘুরবে, যখন হাত মুখের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হবে তখন শরীরের ওপর ভাগ সোজা থাকবে। তারপর যখন ডান হাতের ব্লক হবে তখন শরীরের ওপরভাগ বাঁ দিকে ঘুরবে। প্রথমে আস্তে-আস্তে অনুশীলন করতে হবে, তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে স্পিড বাড়াতে হবে।

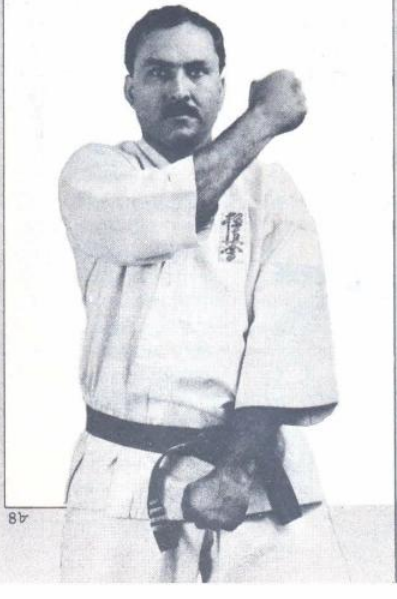

ফোটো : উৎপল সরকার

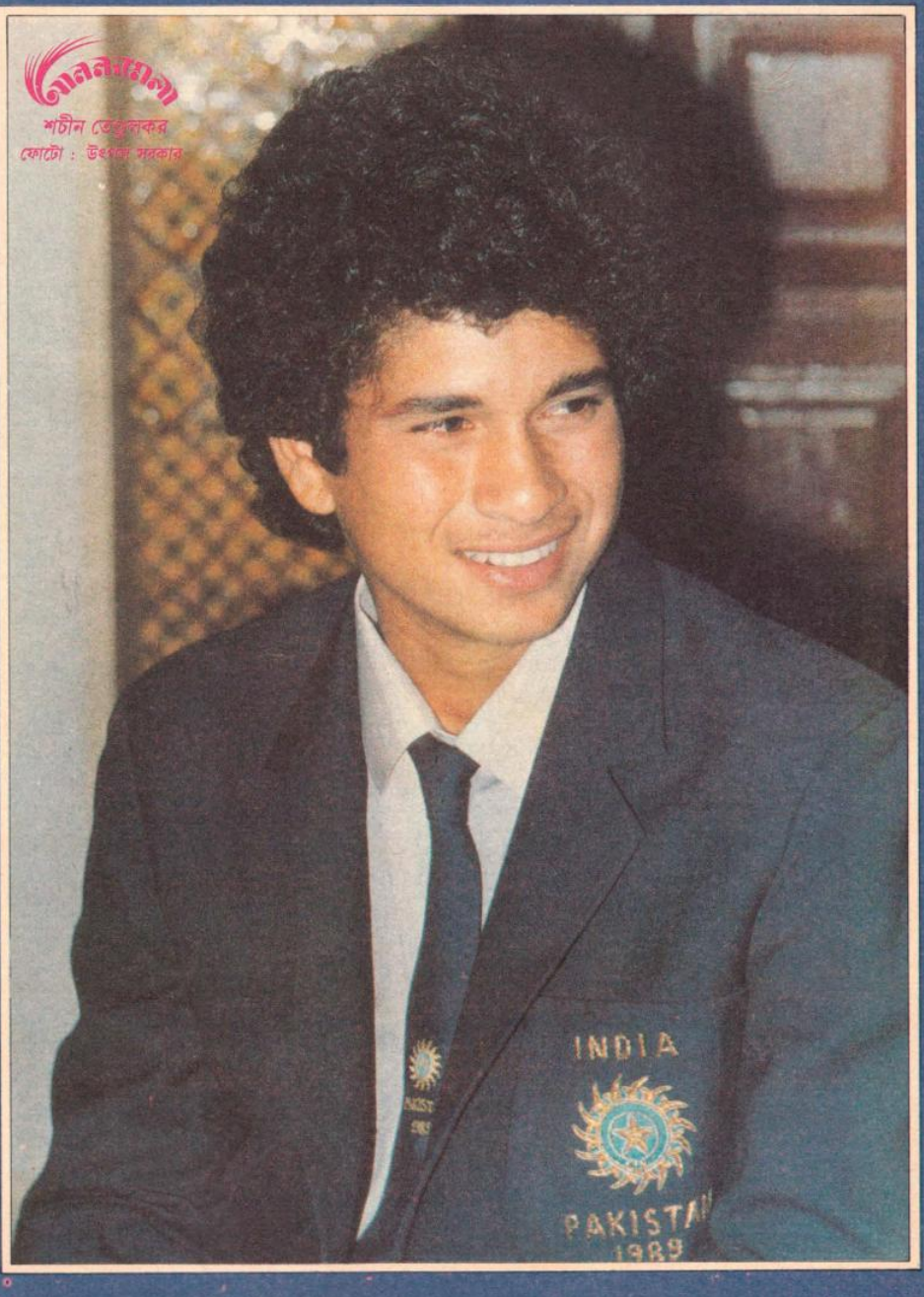

আনন্দমেলা

শচীন তেণ্ডুলকর

ফোটো : উৎপল সরকার

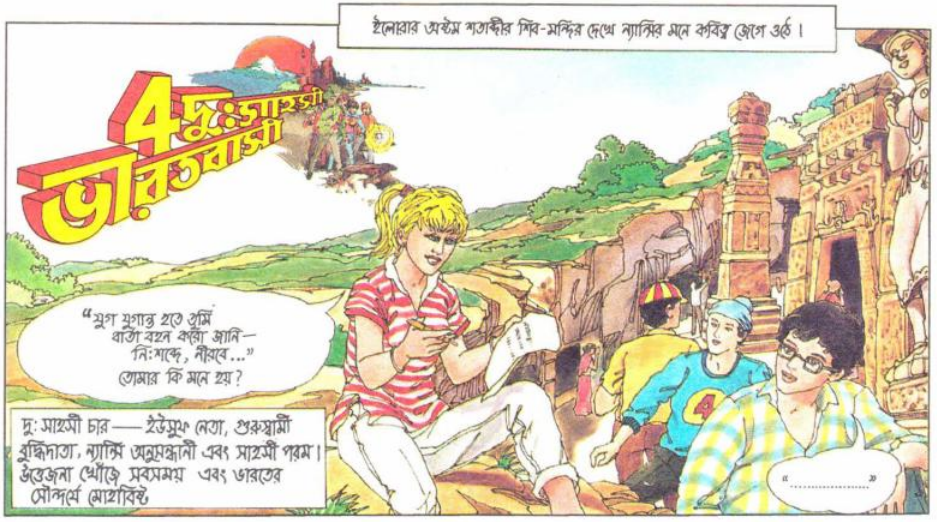

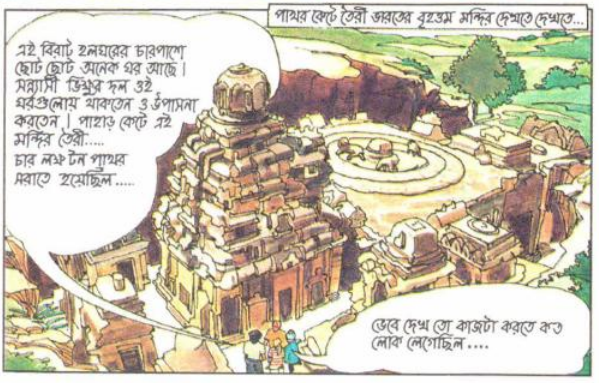

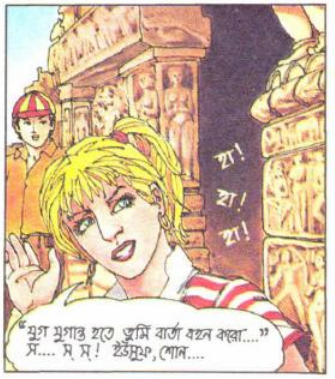

পর্যটন বিভাগ, ভারত সরকার

Department of Tourism Government of India

HTA 650 BEN

মেঘ-বৃষ্টির শহর পেরিয়ে

সুজাতা প্রান্তী সরকার

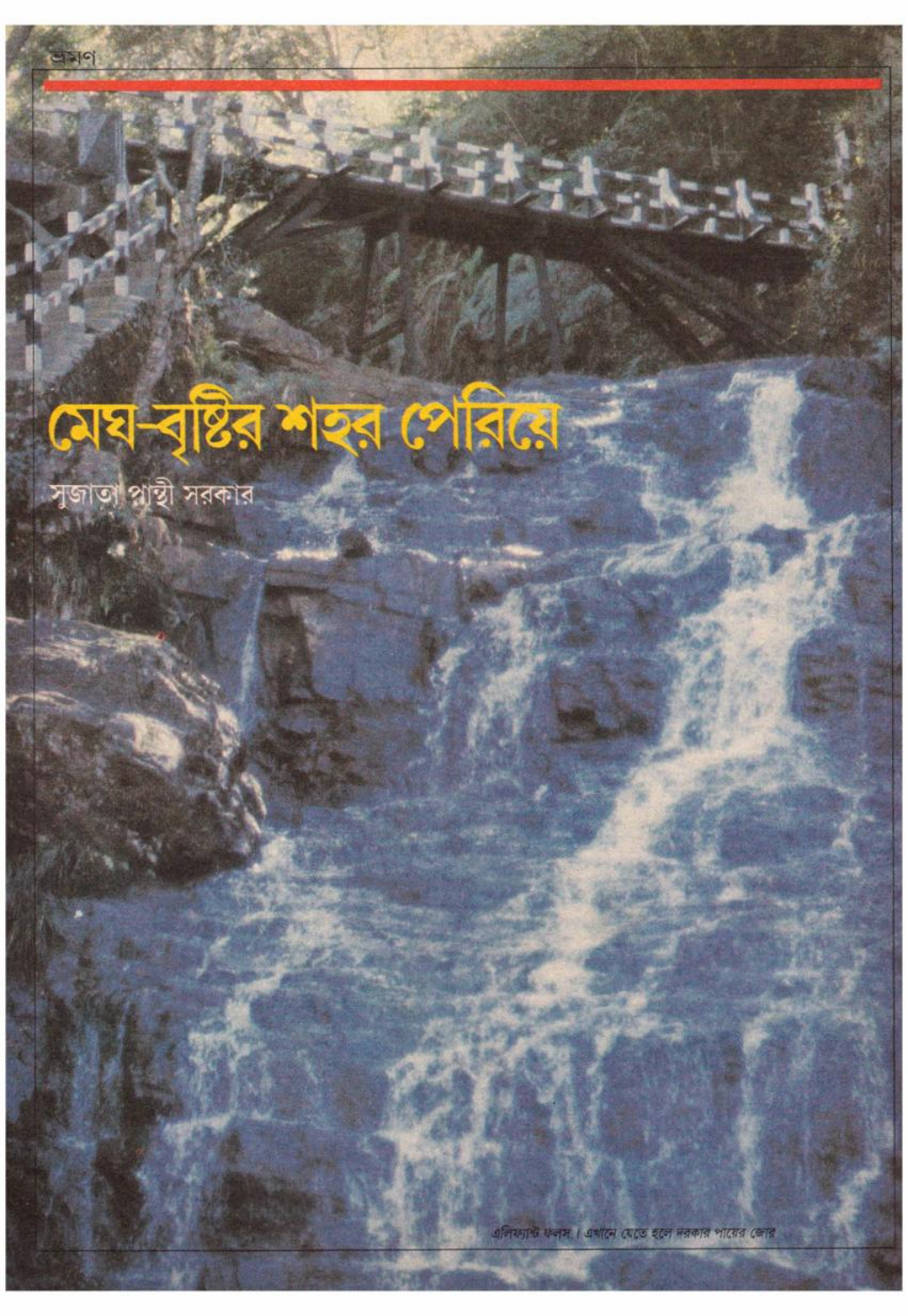

এলিফ্যান্ট ফলস। এখানে যেতে হলে দরকার পায়ের জোর

কলকাতায় গরমের দুরন্ত দুপুরে যদি হাতের কাছে পাওয়া যায় এক গ্লাস ঠাণ্ডা শরবত বা একটা আইসক্রিম, মনে হয়, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে এই মুহূর্তে তা এখানেই। তেমনই পিচগলা গরমে সুনসান নীল আকাশে, একচিলতে মেঘের আশা যখন দুরাশা, ঠিক তখনই সবুজ গালচে-মোড়া পাহাড়ে মেঘেরা চরে বেড়ায়। না, সেই জায়গাটা এই সমতল কলকাতা নয়। মেঘেদের রাজ্য মেঘালয়। তার রাজধানী শিলং। কাছেই চেরাপুঞ্জি। যেখানে গেলে মন কেমন করে কলকাতার আকাশটার জন্য। ইচ্ছে করে এক্ষুনি একখানা জলভরা কালো মেঘ পাঠিয়ে দিই।

গুয়াহাটি থেকে পাহাড়-কাটা কালো রাস্তা বেয়ে বাস বা ট্যাক্সিতে মাত্র ঘণ্টা-তিনেক। দু'ধারে বাঁশবন আর ঘন সবুজের মিছিল। বরাপানি লেকের স্তব্ধ, স্বচ্ছ জলের পাশে ফুটে-থাকা বেগুনি রঙের জারুলের অপূর্ব কম্বিনেশন। গ্রানাইটের বিশাল দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা ঝিরঝিরে ঝরনা। এসব দেখতে-দেখতেই এসে যায় রবি ঠাকুরের শেষের কবিতার শহর। সমুদ্র থেকে হাজার-পাঁচেক ফুট উঁচুতে পাইনবনে ঘেরা পাহাড়ি শহর শিলং। এখানে দৃষ্টি ধাক্কা খায় না। যতদূর দেখা যায় ছোট-বড় পাহাড় আর রং-বেরঙের সবুজ। মাথার ওপরে নীল চাঁদোয়ায় সাদা-কালো মেঘের খেলা। তবে এর মেজাজ বোঝা ভার। এই ঝকঝকে রোদ্দুর। পরক্ষণেই ঝমঝমে বৃষ্টি। এপ্রিল-মের ক্রান্তীয় উষ্ণতাকে একটুও তোয়াক্কা করে না এখানকার বাতাস। জেগে থাকলেই পরতে হয় সোয়েটার। পাখা এখানে অমিল বা আবর্জনার শামিল। নগরের প্রতিটি কোণেই ঠাণ্ডা হাওয়ার অনায়াস যাতায়াত। ব্যারোমিটারের পারা গরমকালেও ওঠানামা করে ২৩·৩—১৫ ডিগ্রির মধ্যে। শিলং শহরে বসতি গড়ে উঠেছে পাহাড় কেটে। লাল, সবুজ ছবির মতো সব কটেজ। দোকান, বাজার, স্কুল, আদালত এমনভাবে পাহাড়ের গায়ে বসানো, মনে হয় এরা যেন প্রকৃতিরই অংশ। চড়াই-উতরাই ভেঙে কালো সড়ক চলে গেছে শহর ছাড়িয়ে। এককালে সাহেবদের খুব প্রিয় ছিল শিলং। ছবির মতো শহরটিকে তারা বলত প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড।

শহরটির প্রাণকেন্দ্রে রয়েছে ওয়ার্ড লেক। এক অপরূপ কৃত্রিম সরোবর। পারাপারের জন্য আছে কাঠের সেতু। চারপাশে ঢালু পাহাড়ে কেয়ারি-করা অজস্র মরসুমি ফুল। লেকের বুক বেয়ে উঠে গেছে রাজপথ।

চেরাপুঞ্জির এই পাহাড়ি পথ কম আকর্ষক নয়

পরিষ্কার, স্থির জলে খেলা করছে মাছেরা। অনেকেই বোটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এখানে সারাটা দিনই কাটিয়ে দেওয়া যায় বোটিং বা পিকনিক করে। জলবিহারের জন্য মজুত আছে লাল, নীল, সবুজ একাধিক বোট। বেছে নিলেই হল যে-কোনও একটি।

শিলং শহরটি যদি হয় এক ল্যান্ডস্কেপ, তবে নিঃসন্দেহে এতে বিশেষ মাত্রা এনেছে রাজভবন ও বোটানিক্যাল গার্ডেন। এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে আছে নানা জাতের গাছ ও ফুল আর বাহারি অর্কিড।

শিলঙের অন্য এক আকর্ষণ গলফ ক্লাব। শহর ছাড়িয়ে একটু নিচুর ধাপে উঁচু গাছের ছায়ায় ঘেরা এক সবুজ উপত্যকা। এটি এশিয়ায় দ্বিতীয় বৃহত্তম ও উন্নত মানের গলফ গ্রাউন্ড। সারা পৃথিবী থেকে গলফপ্রেমীরা আসে খেলতে বা নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। পাশেই ঘোড়া ছোটার মাঠ। সেটিও

ওয়ার্ড লেক-এ বোটিং করে সারাটা দিনই কাটিয়ে দেওয়া যায়

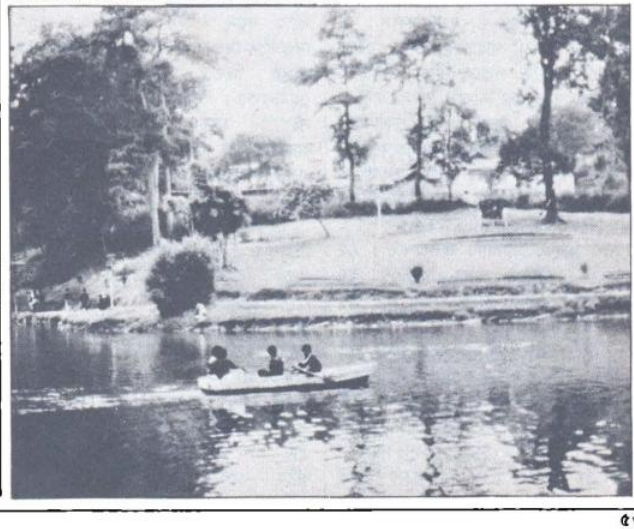

দেখবার মতো। দুটিরই স্রষ্টা স্বভূমি ছেড়ে আসা ইংরেজরা।

শহরের কাছেই লেডি হায়দারি পার্ক। এখানে আছে নানা জাতের অদেখা সব গাছ, ফুল আর মিনি-চিড়িয়াখানা। একটি ছোট মিউজিয়ামও আছে। পার্কটি ছোটদের বিশেষ প্রিয়। কারণ তাদের জন্য রাখা আছে স্লিপ, দোলনা, খেলবার নানা উপকরণ ও প্রচুর জায়গা।

শহর ছেড়ে মন চলে যায় বহুদূরে। পাহাড়ের কোলে। যেখানে মেঘ আনাগোনা করে গাছের মাথায়। এমনকী, ধাক্কা মারে মানুষের শরীরেও। তাই রওনা হই পাহাড়ের মাথায়।

পাহাড় ঘুরে মেঘেদের সঙ্গে গাড়ি উঠে যাচ্ছে আরও উঁচুতে। জানালা দিয়ে নীচে তাকালেই কোথাও অলসভাবে পড়ে রয়েছে মসৃণ নদী। কোথাও বা ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে দেওয়া দগদগে ক্ষত নিয়ে বিশাল পাথুরে পাহাড়। এই সবুজ, সাদা পাথরের গা বেয়ে যত্রতত্র ঝরে পড়ছে জলপ্রপাত। টাটকা সবুজের সঙ্গে স্ফটিকের মতো সাদা জলের কী দারুণ সহাবস্থান। এদের ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ জলে হাত ছোঁয়ালেই সব ক্লান্তি, গ্লানি নিমেষে উধাও হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এলিফ্যান্ট ফলস। এখানে যেতে হলে দরকার পায়ের জোর। অনেক সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে দেখা যায়, হাতির পিঠের মতো কালো পিচ্ছিল পাথরের দেহ বেয়ে নেমে আসছে অজস্র সাদা সুতোর মতো জলরেখা। অবশ্য বর্ষাকালে এর রূপ আলাদা। এ ছাড়াও আছে বিশপ ও বেডন ফলস্। দুই সহোদরার মতো পাহাড়ের ওপর থেকে অঝোরে আছড়ে পড়ছে নীচে। বিশপের জলধারা থেকে জন্ম নিয়েছে উমিয়ম নদী ও উমিয়ম লেক। লেকটি মৎস্য-শিকারিদের স্বর্গ। আর বেডন প্রপাতের জল থেকে তৈরি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ। অপর এক জলপ্রপাত স্প্রেড ঈগল। কবিতার মতোই ছন্দোময়। নাম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ,'উড়ন্ত ঈগল'। এ ছাড়াও আছে মৌসমায়ি জলপ্রপাত। এই ফলসকে দেখতে হলে আসতে হয় বর্ষাকালে। বহুদূর থেকে শোনা যায় এর গর্জন।

শিলং শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে শিলঙের সবচেয়ে উঁচু জায়গা শিলং পিক। এখানে যাওয়ার জন্য টুরিস্ট বাস বা ট্যাক্সি বাহন তো আছেই। তবে পথটা রোমাঞ্চকর হয়, যদি করা যায় ট্রেকিং। জঙ্গল মাড়িয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে মাথায় ওঠার স্বাদই আলাদা। বরাত ভাল হলে সূর্যদেবের দয়ায়

শিলং শহরের একটি গির্জা

ফোটো : জয়ন্ত চৌধুরী

হিমালয়ের স্নো-পিকের দেখাও মিলতে পারে। ওপর থেকে পুরো শহরটাকে খুবই সুন্দর দেখায়। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা এক ছবি।

শিলং আর তার প্রতিবেশী পাহাড়ের প্রতিটি বাঁকে রহস্য। যার অন্যতম নিদর্শন গুহা। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার পথে অরণ্যময় পরিবেশে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রাগৈতিহাসিক গুহা। মৌসুমায়ি কেভ। এর সঠিক বয়স আজও অনাবিষ্কৃত। গুহার দেওয়ালে-দেওয়ালে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের ভাস্কর্য। ভিতরে জমাট অন্ধকার। বেশ রোমাঞ্চকর। তবে দুঃখ একটাই, টম সইয়ারের মতো গুহার ভেতরে ঢুকে অ্যাডভেঞ্চার করা গেল না। কুড়ি পা এগোতে-না-এগোতেই সংঘাত, গুহার মুখ বন্ধ।

মেঘালয়ের ভয়ঙ্কর সুন্দর জায়গাটি হল চেরাপুঞ্জি। বৃষ্টির শহর চেরাপুঞ্জি। শিলং থেকে ১৩০০ মিটার উঁচুতে এই অপূর্ব খাসিয়া গ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনবদ্য। দূরে পাহাড়ের গায়ে মেঘের ভেলা। চলতে-চলতে হাতের কাছেই মেঘ। কথা বলতে বলতেই মেঘের মধ্যে হারিয়ে যায় পাশের সঙ্গী। এখানকার অবিরত বৃষ্টিপাত 'গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড'-এর বিষয়। ঐতিহাসিক রেকর্ড আছে বছরে ৫০০" মতো বৃষ্টির। তবে কিছুকাল ধরে বর্ষণ একটু অনিয়মিত। পাথর দিয়ে গড়া বাড়িগুলোর গায়ে পুরু শ্যাওলা। রাস্তা সবসময়ই ভেজা। আর এ-জায়গার আকর্ষণ বাড়িয়েছে নোকালিকাই জলপ্রপাত। যেটি পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম প্রপাত হিসাবে গণ্য হওয়ার হিম্মত রাখে। সেতারের সরু তারের মতো টান টান সাদা জল এসে মুখ থুবড়ে পড়ছে একখণ্ড ঘন নীল অমৃতগাত্রে। একেই বোধ বলে বাক্যহীন সৌন্দর্য।

শিলঙের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে আছে বিস্ময় আর অফুরন্ত প্রকৃতি। দূষণের ভাইরাস এখানে এখনও পৌঁছয়নি। তাই এখানকার বাতাসে অনেক জীবনীশক্তি, প্রচুর অক্সিজেন। তেমনই পাহাড়ি মানুষেরা। উদাত্ত প্রকৃতিরই মতো মহৎ তাদের হৃদয়। এখানকার প্রধান অধিবাসী খাসিরা অল্পে খুশি। নাচে, গানে প্রাণোচ্ছল। বিক্রি করে মধু, চাষ করে পাহাড়ের ধাপ কেটে আর শহর দেখায়, পাহাড় চেনায় পর্যটকদের। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েরাই গৃহকর্ত্রী। মেয়েদের পদবিতেই চলছে সমাজ-সংসার। তারাই করে হাট-বাজার, দোকানে বসে। পুরুষেরা করে বাড়ির কাজ।

প্রকৃতি এখানে এমন পসরা সাজিয়ে রাখে সহজে ক্লান্তি আসে না। যদি সিলিন্ডারে ভরে কিছুটা টাটকা বাতাস, মেঘ আর সবুজ নিয়ে যাওয়া যেত সমতলে, তা হলে একঘেয়ে জীবনটা চলত ঘোড়ার মতো টগবগ করে, ছন্দ আসত জীবনে।

ফোটো : বিশ্বরঞ্জন সরকার

মাউন্টেনিয়ার হতে হলে

অমর দাশ

যুগযুগান্ত থেকে পাহাড়ের টানে মানুষ ছুটে চলেছে। শুধু বেড়ানোর জন্যই পাহাড়ের আকর্ষণ নয়, পাহাড়ে রয়েছে অ্যাডভেঞ্চার! পাহাড়ে চড়া এক দারুণ মজার নেশা। তাই সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে মাউন্টেনিয়ারিং ক্লাব। কিন্তু পাহাড়ে চড়া শেখা যেমন পরিশ্রমসাপেক্ষ, এই কষ্টার্জিত বিদ্যার তেমনই কদরও আছে খুব।

সারা দেশে মাউন্টেনিয়ারিং শেখার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং এবং মানালির ডব্লিউ এইচ এম আই এবং কাশ্মিরের জে আই এম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট

দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ৭০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এটি জওহর পর্বতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিটি খুব সুন্দর। মাউন্টেনিয়ারিং নিয়ে দেশবিদেশের প্রচুর বই রয়েছে এই লাইব্রেরিতে। ইনস্টিটিউটের মাউন্টেনিয়ারিং মিউজিয়াম দেখবার মতো। মাউন্টেনিয়ারিং-এর নানা যন্ত্রপাতি, খাবারদাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ যেগুলি বিভিন্ন পর্বত অভিযানে কাজে লাগে, সবই রয়েছে এই মিউজিয়ামে। এ ছাড়া পর্বত অভিযানের সময় যেসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, সে-সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা রয়েছে। ১৯৬৫ সালে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে এভারেস্ট মিউজিয়াম। এখানে ১৯২১ সাল থেকে এভারেস্ট পর্বতশৃঙ্গ অভিযানের অনেক ছবি রয়েছে। ইনস্টিটিউটে একটি সুন্দর অডিটোরিয়াম আছে। সেখানে পর্যটক এবং শিক্ষার্থীদের পর্বত অভিযানের নানান ফিল্ম দেখানো হয়।

বিভিন্ন কোর্স

ইনস্টিটিউটে দু'ধরনের মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স শেখানো হয়। বেসিক এবং অ্যাডভান্স কোর্স। মার্চ-এপ্রিল, এপ্রিল-মে, মে-জুন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। অক্টোবর-নভেম্বর, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বেসিক এবং অ্যাডভান্স কোর্স শেখানো হয়। এ ছাড়া ১৪ বছর থেকে ১৭ বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার কোর্স শেখানো হয়—ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মে এবং জুন মাসে। এপ্রিল-মে মাসের মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স সাধারণত মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

বেসিক কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্বতশৃঙ্গ এবং পর্বতারোহণ সম্পর্কে প্রারম্ভিক জ্ঞান দেওয়া হয়। মাউন্টেনিয়ারিং-এর বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কোর্সের মেয়াদ ২৮ দিন। ছেলে এবং মেয়ে সকলেই এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। বয়স হওয়া চাই ১৯ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। কোর্স ফি ৬০০ টাকা। ২৮ দিনের কোর্সের মধ্যে ৫ দিনের অ্যাকলেমাটাইজেশন পিরিয়ড, ৬ দিনের ট্রেক টু বেস ক্যাম্প, ১০ দিনের বেস ক্যাম্পে ফিল্ড ট্রেনিং, ৪ দিনের ট্রেক ব্যাক টু দার্জিলিং, এবং শেষ ৩ দিনের প্রশাসনিক পর্যায়। গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি দিয়ে কোর্স শেষ।

নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং-এর প্রতীক

অ্যাডভান্স কোর্স

অ্যাডভান্স কোর্সের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে তিনি সক্রিয়ভাবে পর্বত অভিযাত্রীদলের সভ্য হতে পারেন। কীভাবে পাহাড়ে চড়তে হয় সে-বিষয়ে উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কিত শিক্ষাও দেওয়া হয় এই কোর্সের মাধ্যমে। এই কোর্সের মেয়াদ ৩২ দিন। ছেলে-মেয়ে উভয়েই এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। তবে বয়স হওয়া চাই ১৯ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। কোর্স ফি ৬০০ টাকা। এই ৩২ দিনের ট্রেনিংয়ের মধ্যে প্রথম ৫ দিন শেখানো হয় অ্যাডভান্সড মাউন্টেন থিওরি, পরের ৫ দিন ট্রেক টু বেস ক্যাম্প, ১৫ দিনের ফিল্ড ট্রেনিং, তার পরের ৪ দিন ট্রেক ব্যাক টু দার্জিলিং এবং শেষের ৩ দিনের প্রশাসনিক পর্ব, তারপর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি দিয়ে কোর্স শেষ। তবে মনে রাখা দরকার, ইচ্ছে করলেই অ্যাডভান্স কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় না। দার্জিলিঙের এইচ এম আই অথবা উত্তরকাশীর এন আই এম কিংবা মানালির ডব্লিউ এইচ এম আই থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সে 'এ' গ্রেড পেয়ে পাশ না করলে অ্যাডভান্স কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় না।

অ্যাডভেঞ্চার কোর্স

ছেলেমেয়েদের মনে অ্যাডভেঞ্চারের আগ্রহ জাগিয়ে তোলাই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। এতে চরিত্র গঠনে যেমন সাহায্য হয়, তেমনি দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যেরও বিকাশ ঘটে।

এই কোর্সের মধ্যে আছে—রক ক্লাইম্বিং, ওয়াটারম্যানশিপ, সারভাইভাল ইন জাঙ্গল, র‍্যাফটিং অ্যান্ড ক্যানোয়িং, ট্রেকিং অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ারিং, অবস্ট্যাকল কোর্সেস, ক্রস-কানট্রি রানিং, সোলো ক্যাম্পিং ইত্যাদি।

ট্রেনিংয়ের সময় শিক্ষার্থীদের টাইগারহিল, সান্দাকফু, ফালুট, জলদাপাড়া গেমস সাংচুয়ারি, মিরিক, হাসিমারা, রঙ্গিত এরিয়াল রোপওয়ে—সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

অ্যাডভেঞ্চার কোর্স সাধারণত স্কুল-কলেজের ছুটির সময়ে করা হয়। বিশেষত জুন এবং জানুয়ারি মাসের দিকে।

১৫-২০ দিনের ট্রেনিং। ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারে। কোর্স ফি ২০০ টাকা।

দৈহিক যোগ্যতা

মাউন্টেনিয়ারিং-এর বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হওয়ার সময় দৈহিক যোগ্যতা একটি বিশেষ বিচার্য বিষয়। কেননা, রুগ্‌ণ, অসমর্থ শরীরে মাউন্টেনিয়ারিং শেখা যায় না। যেমন আধ ঘণ্টায় ৫ কিমি জগিং করতে পারা চাই, ২ ঘণ্টায় ১০ কিমি হাঁটতে পারা চাই, ২০ মিনিটে ১০ কিমি সাইক্লিং করা চাই, অথবা ১৪ মিনিটে ৪০০ মিটার সাঁতার কাটতে পারা চাই। সবদিক থেকে শক্তসমর্থ না হলে মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স পড়া যায় না। মনে রাখতে হবে, বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সের সময় ফিল্ড ট্রেনিংয়ে প্রায় ১৮,০০০ ফুট উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। তা ছাড়া মাউন্টেনিয়ারিং-এর কলাকৌশল-ও জানতে হবে এমন কিছু ব্যাপার নেই। মেডিকেল টেস্ট ছাড়া কোনও প্রবেশিকা পরীক্ষাও নেওয়া হয় না। সাধারণত 'আগে এলে আগে সুযোগের' ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পুরুষের জন্য আলাদা-আলাদাভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপালের সুপারিশক্রমে কিছু স্কলারশিপ পাওয়া যেতে পারে (ক) স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৩২/১ বি বা দী বাগ (দক্ষিণ) কলকাতা-৭০০০০১ এবং (খ) ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন, বেনিটো জুয়ারেজ রোড, আনন্দ নিকেতন, নতুন দিল্লি-১১০০২১ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

শিক্ষার্থীরা ট্রেনিংয়ের সময় ইনস্টিটিউট থেকে মাউন্টেনিয়ারিং যন্ত্রপাতি এবং পোশাক পেয়ে থাকেন। তা ছাড়াও তাঁদের সঙ্গে নিজস্ব হান্টার বুট, উলেন মোজা, উলেন গ্লাভ্‌স, সানগ্লাস, ওয়াটারপ্রুফ, সুইমিং ট্রাংক, ট্রাক সুট, পুলওভার ইত্যাদি নিতে হয়। হিন্দি অথবা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোর্স ফির মধ্যেই থাকা, খাওয়া ইত্যাদির খরচ ধরা থাকে। এসবের জন্য কোনও আলাদা টাকা দিতে হয় না।

১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেসিক কোর্সে ভর্তির কোনও সুযোগ নেই। কেননা, সব আসন আগে

দার্জিলিং মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের মর্মবাণী : সাফল্যের এক চূড়া থেকে আর এক চূড়ায় আরোহণ করো

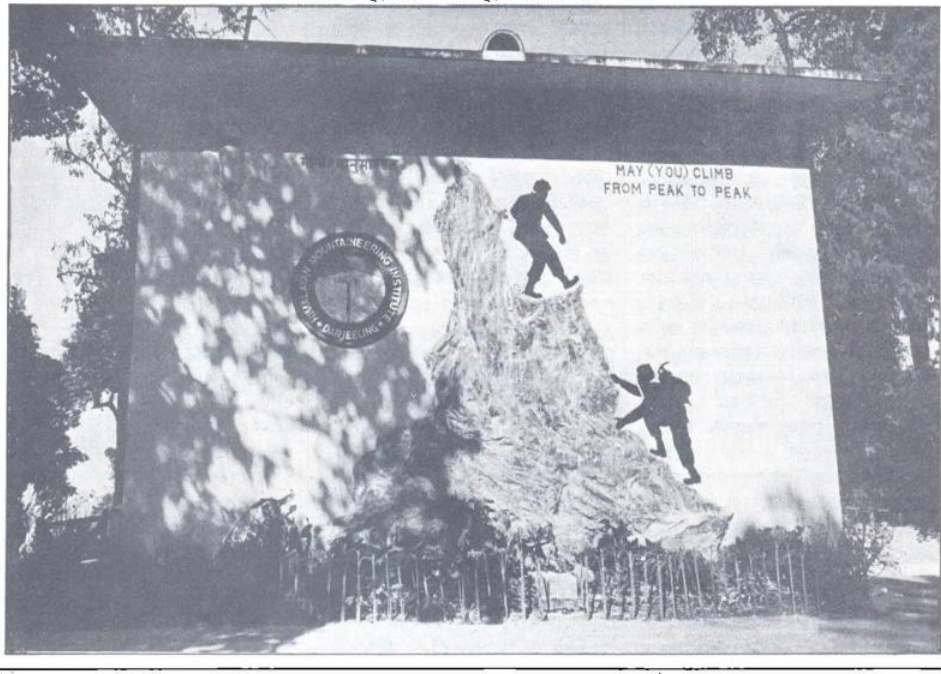

থেকেই পূরণ হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা এখানে ভর্তি হতে আগ্রহী, তাঁদের যোগাযোগের জন্য ইনস্টিটিউটের ঠিকানা জানিয়ে রাখছি। প্রিন্সিপাল, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, দার্জিলিং ৭৩৪১০১ ঠিকানায় পাঁচ টাকার পোস্টাল অর্ডার বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে আবেদনপত্র এবং প্রসপেক্টাস পাওয়া যাবে।

নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট

উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং

সব মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটেই প্রায় এক ধরনের পাঠক্রম অনুসৃত হয়। উত্তরকাশীর নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করানো হয় মার্চ-এপ্রিল, জুন-জুলাই, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। প্রত্যেক টার্মেই ৪০ জন শিক্ষার্থী নেওয়া হয়। জুন-জুলাই মাসের কোর্সটি কেবলমাত্র মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য, আর সব কোর্স পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট।

অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করানো হয় মার্চ-এপ্রিল, জুন-জুলাই, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। এ-ক্ষেত্রেও জুন-জুলাই মাসের কোর্সটিতে শুধুমাত্র মহিলাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। জেনে রাখা ভাল, বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সে 'এ' গ্রেড পেয়ে পাশ না করলে অ্যাডভান্স কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় না।

অ্যাডভেঞ্চার কোর্স করানো হয় এপ্রিল ও মে মাসে। মে মাসে দুটি কোর্স। একটি মেয়েদের জন্য, আর-একটি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্য। প্রথম এই তিনটি টার্মে ৪০টি করে আসন আছে। নভেম্বর মাসের কোর্সটি মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের জন্য। আসন রয়েছে ২০টি। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের অ্যাডভেঞ্চার কোর্সে আসন সংখ্যা ৬০; শুধুমাত্র ছেলেদের নেওয়া হয়। জানুয়ারি মাসে আরও একটি কোর্স করানো হয়, আসন সংখ্যা ৩০। এটিও শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য।

এই ইনস্টিটিউটে দার্জিলিং ইনস্টিটিউটের চেয়ে বেশি আরও তিনটি কোর্স শেখানো হয়। (ক) সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কোর্স, (খ) মেথড অব ইনসট্রাকশন কোর্স, (গ) গাইড কোর্স। সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কোর্স করানো হয় এপ্রিল-মে মাসে। আসন সংখ্যা ২০। স্ত্রী-পুরুষ, সবাইকেই ভর্তি করা হয়। মেথড অব ইন্সট্রাকশন কোর্সও এপ্রিল-মে মাসে হয়। আসন সংখ্যা ২০। এটিও মিশ্র কোর্স, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সে 'এ' গ্রেড না পেলে সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় না।

গাইড কোর্স তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট, যাঁরা বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স অথবা অ্যাডভেঞ্চার কোর্স শেষ করেছেন এবং বিশেষভাবে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে নিজের কর্মজীবন ব্যস্ত রাখতে চান। তাঁদের পক্ষে জীবিকার জন্য এই কোর্সটি খুবই উপযোগী।

কোর্স-ফি

এবার বিভিন্ন কোর্স-ফি সম্বন্ধে আলোচনা করছি। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের জন্য বেসিক, অ্যাডভান্স, সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ এবং মেথড অব ইন্সট্রাকশন কোর্সের ফি ৬০০ টাকা এবং গাইড কোর্সের জন্য ৫০০ টাকা। বিদেশীদের জন্য গাইড কোর্স ফি ৩০০০ টাকা। অ্যাডভেঞ্চার কোর্স ফি—ভারতীয়দের জন্য ২০০ টাকা এবং বিদেশীদের জন্য ৫০০ টাকা। এক্ষেত্রে বলে রাখি, দার্জিলিঙের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে বেসিক এবং অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সে বিদেশীদের ভর্তি করা হয় না। তাঁরা অ্যাডভেঞ্চার কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। সেক্ষেত্রে ফি ঠিক করা হয়েছে ১০০০ টাকা, এই টাকা আগেই জমা দিতে হয়। কোর্স-ফি-র মধ্যেই থাকা-খাওয়ার খরচ ধরা আছে।

ভর্তির যোগ্যতা

বেসিক, অ্যাডভান্স, সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ, মেথড অব ইন্সট্রাকশন, গাইড এবং লেডিজ অ্যাডভেঞ্চার কোর্সে ভর্তি হতে হলে শিক্ষার্থীর বয়স হওয়া চাই ১৭ বছর থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ছেলেমেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট অ্যাডভেঞ্চার কোর্সে ভর্তির বয়স ১২ থেকে ১৭ বছর। শিক্ষার্থীদের দৈহিকভাবে শক্ত-সমর্থ হতে হবে। তাদের আউটডোর স্পোর্টসে নৈমিত্তিক অনুশীলন থাকা দরকার। এ ছাড়া অসমতল রাস্তায় মোটবহর নিয়ে যাতায়াতের অভ্যাসও থাকা বাঞ্ছনীয়।

কোর্সের মেয়াদ

এই ইনস্টিটিউটে বেসিক এবং মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সের মেয়াদ ২৮ দিন, সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ, মেথড অব ইন্সট্রাকশন এবং অ্যাডভেঞ্চার কোর্সের মেয়াদ ২০ দিন; গাইড কোর্স এবং মূক-বধির ছেলেদের জন্য কোর্সের মেয়াদ ১৫ দিন। তবে জানিয়ে রাখা ভাল, এবার জানুয়ারি মাসের অ্যাডভেঞ্চার কোর্সের সব আসন আগে-ভাগেই পূরণ হয়ে গিয়েছে। যাঁরা এই ইনস্টিটিউটের কোর্স সম্পর্কে আগ্রহী, তাঁরা সরাসরি নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং, উত্তরকাশীর অনুকূলে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, উত্তরকাশী শাখার ওপর কাটা দশ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠালে প্রিন্সিপাল, নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং, উত্তরকাশী-২৪৯১৯৩ (উত্তরপ্রদেশ) থেকে প্রসপেকটাস এবং আবেদনপত্র পেতে পারেন। সবশেষে বলি, ১৯৯০-৯১ সালের বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের এখনই ৬০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়ে আসন সংরক্ষণ করতে হবে। কেননা, এ-সবই কোর্সের চাহিদা সবসময়ই বেশি।

পাহাড়ে চড়ার মিলকথা সাহস

তনুকা ভৌমিক

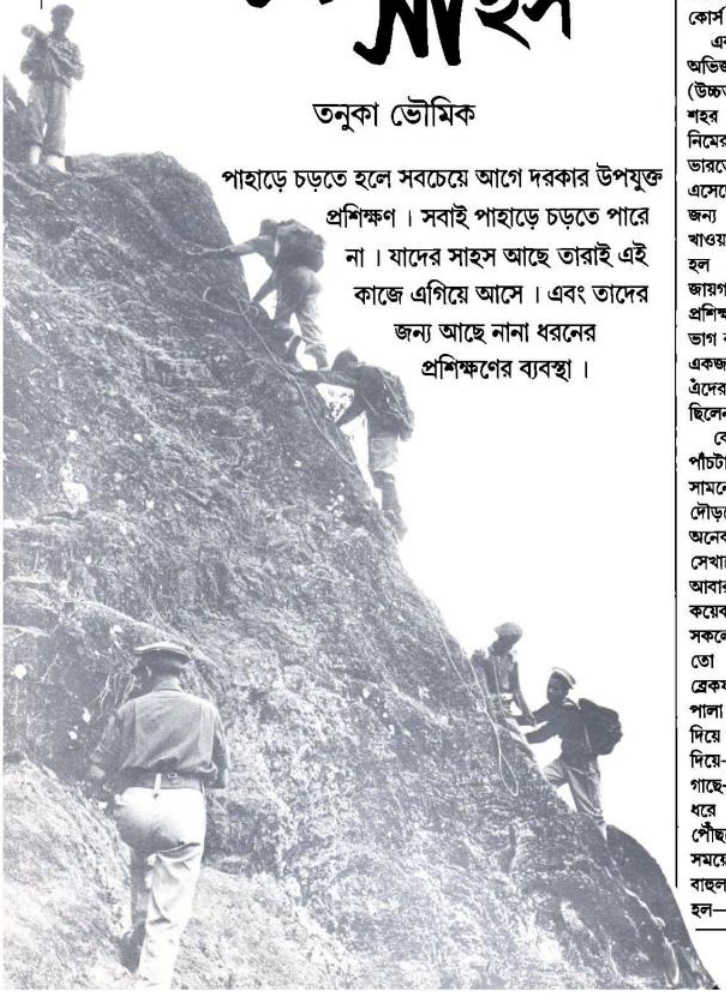

পাহাড়ে চড়তে হলে সবচেয়ে আগে দরকার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। সবাই পাহাড়ে চড়তে পারে না। যাদের সাহস আছে তারাই এই কাজে এগিয়ে আসে। এবং তাদের জন্য আছে নানা ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

পাহাড়ে চড়া শিখতে হলে সবচেয়ে আগে কোনও রক ক্লাইম্বিং কোর্স করে নেওয়া ভাল। পশ্চিমবঙ্গের শুশুনিয়াসহ নানা জায়গায় চার-পাঁচ দিনের এ-জাতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই কোর্স করা থাকুক বা না থাকুক, পর্বতারোহী বা ক্লাইম্বার হতে হলে 'বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স' করতেই হবে। দার্জিলিং-এর হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন (এইচ এম এ) বা উত্তরকাশীতে নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং (নিম)-এ এই ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিম-এ ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা বেসিক কোর্সের ব্যবস্থা আছে। আমি এই কোর্স করতে যাই ১৯৮৫ সালের মে মাসে।

এবার বেসিক কোর্সে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছি। ট্রেনে উত্তরকাশী (উচ্চতা ১১৬০ মিটার) পৌঁছে, উত্তরকাশী শহর থেকে অনেক উঁচুতে পাহাড়ের মাথায় নিমের বিরাট বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মেয়েরা এসেছে এই কোর্স করতে, তাদের থাকার জন্য ডরমিটরির ব্যবস্থা রয়েছে, খাওয়া-দাওয়ার জন্য আছে বিরাট ডাইনিং হল এবং ইনস্টিটিউটের বাগানসহ জায়গা-জমিও অনেকটা। আমাদের সকলকে প্রশিক্ষণের সুবিধার জন্য কয়েকটি রোপে ভাগ করে দেওয়া হল, প্রত্যেক রোপের জন্য একজন ইনস্ট্রাকটর বা শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ঐঁদের আমরা 'সার' বলতাম। আমাদের সার ছিলেন রানা-সার।

কোর্স শুরু হওয়ার প্রথম দিন ভোর পাঁচটায় সবাই জমায়েত হলাম নিমের গেটের সামনে। এর পর শুরু হল জগিং বা দৌড়নো। দৌড়তে দৌড়তে পাহাড়ের অনেক নীচে যেখানে উত্তরকাশী শহর, সেখানে গিয়ে খোলা মাঠে কিছু ব্যায়াম করা, আবার দৌড়ে উপরে ওঠা। হাতেগোনা কয়েকজন মেয়ে ছাড়া, আমরা আর সকলেই ততক্ষণে হাঁফিয়ে পড়েছি। কিন্তু এ তো সবে শুরু। ইনস্টিটিউটে ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরে আবার লাফানো-ঝাঁপানোর পালা। এবার কখনও জল-ভর্তি নালার উপর দিয়ে লাফ দেওয়া, কখনও বা দড়ির গাঁটে পা দিয়ে-দিয়ে উপরে ওঠা, কখনও আবার গাছে-টাঙানো দড়িতে ঝুলে হাত দিয়ে দড়ি ধরে দড়ির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে পৌঁছনো। পাহাড়ি নদী পার হতে অনেক সময়ে এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই সব শারীরিক কসরতের উদ্দেশ্য হল—পাহাড়ে ওঠার জন্য নিজের শরীরটাকে

তৈরি করে নেওয়া, যাতে শরীরে বিন্দুমাত্র জড়তা না থাকে। এইসঙ্গে চাই সাহস। সাহসই পাহাড়ে চড়ার মূলকথা। রোপের সার নিজের দলের মেয়েদের শেখালেন কীভাবে নানারকম দড়ির গিঁট বাঁধতে হয়—যেমন রিফ নট, ফিশারম্যান্‌স্ নট, ক্লোভ হিচ্ ইত্যাদি। বিভিন্ন নট ছাড়াও, পাহাড়ে চড়া সম্বন্ধে আমরা নানা তথ্য জানলাম, যাকে বলা চলে পাহাড়ে চড়ার অ-আ-ক-খ। আমাদের এটাও বলা হল যে, এইসব 'থিয়োরিটিক্যাল' ক্লাসও মন দিয়ে করতে হবে, কারণ কোর্সের শেষে যখন 'এ', 'বি', 'সি' গ্রেড দেওয়া হবে তখন পাহাড়ে চড়ার দক্ষতাই শুধু নয়, থিয়োরির জ্ঞানও দেখা হবে।

পরের দিন শুরু হল সত্যিকারের পাহাড়ে চড়া। এর আগেই ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমাদের রাকস্যাক, স্লিপিং ব্যাগ, পাহাড়ে চড়ার পোশাক, জুতো, দড়ি, আইস-অ্যাক্স ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিস দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইসব ভারী রাকস্যাক কাঁধে নিয়ে ভোরবেলা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে হেঁটে কয়েক কিলোমিটার দূরে এক পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের পাহাড়ে চড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

প্রথম দিকে সহজ সব পাথরে চড়া শেখানো হল, যেগুলোতে দড়ির সাহায্য না নিয়ে খালি হাত ও পায়ের সাহায্যে ওঠা যায়। প্রথমেই শেখানো হয় থ্রি-পয়েন্ট হোল্ড। এ ছাড়া আমাদের শেখানো হল কোন পাথরের কোন খাঁজে পা রাখা যাবে, কীভাবে পাথরের গায়ের সঙ্গে নিজের দেহকে সমান্তরাল রেখে পাহাড়ে চড়তে হবে, ইত্যাদি।

ক্লাইম্বিং টেকনিক শেখার ফাঁকে-ফাঁকে চলছিল থিয়োরিটিক্যাল ক্লাসের পালা।

বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং-এর রক-ক্লাইম্বিং-এর এই পর্যায় চলে দিন চারেক। এতে পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে কঠিন, নানা পদ্ধতিতে পাহাড়ে চড়া শেখানো হয়। সবই কোমরে বাঁধা দড়ির সাহায্যে পাহাড়ে ওঠা-নামা করা। কোনও অভিযাত্রী-দল যখন কোমরে বাঁধা দড়ির সাহায্যে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং একের পর এক পাহাড়ের উপরে উঠতে থাকে, তখন যে-কোনও একজন ক্লাইম্বার কীভাবে তার পরবর্তী ক্লাইম্বারকে দড়ির সাহায্যে উঠতে সাহায্য করবে তা এই রিলে করার পদ্ধতি থেকে শেখা যায়। 'র‍্যাপেলিং' দূর থেকে বেশ বিপজ্জনক দেখতে লাগলেও, আসলে খাড়া পাহাড় থেকে চট করে নীচে

একটু অবসর, তারই মাঝে অভিযানের নানা পরিকল্পনা

নামার খুব সহজ পদ্ধতি এটি। মাটি থেকে প্রায় ৯০ ডিগ্রি কোণে উঠে যাওয়া পাহাড়ের গা বেয়েও র‍্যাপেলিং করা যায়।

এ ছাড়াও নতুন যা শিখেছিলাম, তা হল—নদী পার হওয়ার কৌশল। পাহাড়ি নদীতে নেমে ঠাণ্ডায় পা জমে যাচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। লম্বা-লম্বা লাঠি দিয়ে কীভাবে জলের গভীরতা আন্দাজ করে ধীরে-ধীরে এগোতে হবে, লাঠি না থাকলে কীভাবে চার-পাঁচ জন হাত ধরে বা কোমর জড়িয়ে একসঙ্গে এগোবে, রাফ্‌ট-এর সাহায্যে কীভাবে জলে ভেসে থাকা যায়, এসব পদ্ধতি আমরা সেদিন শিখেছিলাম।

দেখতে দেখতে উত্তরকাশী-পর্যায়, প্রথম চার-পাঁচ দিনের রক-ক্লাইম্বিং শেখা শেষ হল। এবার বাসে করে আমরা চললাম হরসিলের উদ্দেশ্যে —সেখানে আরও দুর্লঙ্ঘ্য কিছু পাহাড়ে দু'দিনের রক-ক্লাইম্বিং শেখা হবে। হরসিল জায়গাটি ছোট্ট, উচ্চতা ৮৪০০ ফুট।

পরের দু'দিন হরসিলে কঠিন সব পাহাড়ে ওঠা অভ্যাস করলাম। ইতিমধ্যে পাহাড়ে ওঠার কৌশল ছাড়াও শিখলাম পাহাড়ে চড়তে গিয়ে কী-কী বিপদ ঘটতে পারে, কী অসুখ হতে পারে, সেসবের মোকাবিলা কীভাবে করতে হবে, ইত্যাদি।

এর পর রাকস্যাক গুছিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম গঙ্গানানির দিকে। গঙ্গানানির উচ্চতা ৩৫২০ মিটার। পৌঁছে রাকস্যাক নামিয়ে রেখে রোপ ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশে সবাই লেগে গেলাম বড়-ছোট নানা মাপের পাথর কুড়োতে।প্রতিটি রোপের মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের তাঁবু খাটাবে তাই পাথরের জোগাড়। হাওয়ায় যাতে তাঁবুর চারপাশ না ওড়ে, সেজন্য তাঁবুর বাইরের অংশ যেটা মাটিতে ছড়ানো থাকে, ভারী-ভারী পাথর দিয়ে চাপা দেওয়া হয়। গঙ্গানানিতে কিছু শেখার জন্য আসা হয়নি, পরের গন্তব্যস্থলের পথে এটা হল্‌ট।

পরদিন ভোরবেলা তাঁবু গুটিয়ে ভার কাঁধে নিয়ে আবার হাঁটার শুরু। প্রতিদিনই চলা আরম্ভ করার সময় মনে হত, সারা গা-হাত-পায়ে এত ব্যথা নিয়ে এতটা পথ যাব কী করে। আবার একটু হাঁটলেই ব্যথাবেদনা আর গায়ে লাগত না। চলতে চলতে আমরা পৌঁছলাম এক সবুজ উন্মুক্ত প্রান্তরে। গোটা প্রান্তরকে ঘিরে আছে বরফে ঢাকা পাহাড়।

কিন্তু বরফের উপর হাঁটা যে কতটা কষ্টকর তা অল্প সময়েই আন্দাজ করলাম। বরফের পাহাড়ে চড়ার জন্য বুট দিয়ে বরফে আঘাত করে করে ওঠা শিখলাম। এ-ব্যাপারে আইস অ্যাক্সের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনমতো এর সাহায্যে উপরে চড়া যায়, বরফে এর উপর বসে বিশ্রাম নেওয়া যায়, বরফের ঢালে হঠাৎ পিছলে গড়িয়ে নীচে পড়তে থাকলে আইসঅ্যাক্স বরফে পুঁতে পতন রোধ করা যায়। এমনকী ইচ্ছে হলে আইসঅ্যাক্সকে স্কি-এর লাঠির মতো ব্যবহার করে বরফের ঢাল বেয়ে অনায়াসে স্কি করতে পারা যায়। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়লে রক্ষা করবে এই অ্যাক্স। কিয়ারকোটির তুষাররাজ্যে এ ছাড়াও শিখলাম বরফে রিলে করার পদ্ধতি। এবার মনে হতে লাগল যেন সত্যিকারের একজন মাউন্টেনিয়ার হয়ে উঠেছি। তখনও জানি না যে আসল মাউন্টেনিয়ার হওয়ার পথে আরও কত শেখার জিনিস অপেক্ষা করছে আমাদের

জন্য।

কিয়ারকোটিতে কয়েকদিন স্নো-ক্র্যাফ্‌ট্ অভ্যাস করার পর তাঁবু গুটিয়ে আবার রওনা হলাম। এবার আমাদের বেস ক্যাম্প-এর উদ্দেশ্যে। এটাই হবে আমাদের শেষ 'স্টপ'। কিয়ারকোটি থেকে খুব দূরে নয়, একটি পাহাড়ি নদীর পাশে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের তাঁবু আবার ফেলা হল। নাম-না-জানা এই জায়গাটির উচ্চতা ৪০০০ মিটার অর্থাৎ সাড়ে- তেরো হাজার ফুটের একটু বেশি। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হল আরও উঁচু পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। প্রায় দু'হাজার ফুট চড়াই অতিক্রম করে আবার পৌঁছলাম বরফের রাজ্যে। সেখানে সাদা বরফের সমুদ্রের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে আছে কিছু কালো কালো পাথরের দ্বীপ। সেই পাথরের চাঁইগুলো আমরা ব্যবহার করলাম বসে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। চারদিকে যতদূর চোখ যায় বরফে ঢাকা পাহাড় উঠে গেছে; একটু দূরে দেখি আরও উঁচু সব পাহাড়ের ঢালে আমাদের কয়েকজন ইনস্ট্রাকটর আইসঅ্যাক্স নিয়ে বরফের দেওয়ালে ঠোকাঠুকি করছেন। পরে শুনলাম সেখানে আমাদের আইসক্র্যাফ্‌ট্ শেখানো হবে—তারই জন্য পাহাড়ের ঢালের কিছু নুড়ি-পাথর সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা যে বরফ পেরিয়ে এসেছি, তা সবই নরম সাদা বরফ কিন্তু দূরে যা দেখছি, তা নীলাভ-সাদা শক্ত বরফ। সেই শক্ত বরফের দেওয়াল বেয়ে কীভাবে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়, তাই শিখতে হবে এবার।

আইসক্র্যাফ্‌ট্ মোটামুটিভাবে রপ্ত হয়ে গেলে আমাদের শেষ দিন নিয়ে যাওয়া হল লমখাগা পাস অবধি। ৫২৮০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ১৮০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই পাসে গিয়ে আবার বেস ক্যাম্পে ফিরে আসতে হবে, তাই খুব ভোরে সকলে রওনা হলাম। এই পাসে যাওয়ার রাস্তায় পাথুরে পাহাড়, উঁচুনিচু ও সমান্তরাল জমি, নদী, সুদৃশ্য হ্রদ, আবার বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ—সবই পড়ে। বৈচিত্র্যময় এই পথ। আমাদের দলের সবাই পাস অবধি পৌঁছতে পারিনি বিভিন্ন কারণে—শারীরিক শক্তি সকলের সমান নয়, অসুস্থতাজনিত দুর্বলতাও ছিল অনেকের, কেউ হাঁটার পথে পায়ে চোট পায়, কারও আবার রোদ-চশমা না আনার দরুন প্রচণ্ড রোদের মধ্যে বরফে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আমি নিজে ১৭০০ ফুট উচ্চতার পর আর উঠতে পারিনি।

পাহাড়ের উঁচুতে চড়বার সময়ে ক্লাইম্যাটাইজ করে নিতে হয়, অর্থাৎ উঁচু জায়গার কম অক্সিজেন, তার নিজস্ব জলবায়ুর সঙ্গে শরীরকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়।

এবার বেস ক্যাম্পের একটা মজার গল্প বলি। যখন বেস ক্যাম্পে আস্তানা গেড়েছি আমরা, তখন জুন মাস, কলকাতায় সকলে দরদর করে ঘামছে। সেই সময় বেস ক্যাম্পে একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি চতুর্দিক সাদায় সাদা। চারদিক অন্যরকম লাগছে, অন্য তাঁবুতে যাওয়ার পথ চিনতে অসুবিধে হচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, তাঁবুর মাথাটা দেখি অনেকখানি নীচে নুয়ে পড়েছে। বরফের ভারে। আমরা তখন তাঁবুর ভিতর থেকে লাঠি দিয়ে ঠেলে ঠেলে সেই বরফ ঝাড়লাম, তাঁবুর মাথাটা একটু হাল্কা হল।

লমখাগা পাস অভিযানের পর এবার উত্তরকাশী ফেরার পালা। যে পথে আগে দেখে গেছি শুধু সবুজের সমারোহ, ফেরার পথে সেই একই পথ দেখি নানা ফুলে ঢাকা, হয়তো আমাদের জন্যই প্রকৃতির এই উপহার।

ঘুম পাহাড়ে ধুম

গিরিধারী কুণ্ডু

পাইনের বনে-বনে শাঁ-শাঁ হাওয়া দিচ্ছে। জোড়বাংলো পাহাড়ে মেঘের ঝড় ! ঘূর্ণিমেঘের ওড়না ছিঁড়ে-ছিঁড়ে এগিয়ে আসছে একটি মানুষ। চোখের তারা দুটি জ্বলজ্বল জ্বলছে। গাল-ভর্তি খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মাথায় ফুলে ফেঁপে ওলট-পালট হওয়া চুলের ঝাড়। গায়ের জামায় বাহারি রঙের ধুম। পরনের প্যান্ট ঢলঢল। বাঁ কাঁধে ঝুলছে লাল ঝোলা ব্যাগ।

অনেকটা পথ এসে পড়েছিল। জোড়বাংলোর মোড় শেষ হয়নি, সানাইয়ের সুর কানে যেতে থমকে দাঁড়ায়। উড়ু চোখের চাউনি ঘোরে এদিক-ওদিক। ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের শেষে ডান হাতের ওই দোতলা কাঠের বাড়ির সদর দরজা হলুদ গাঁদা ফুলের মালায় কী সুন্দর করে সাজানো ! সানাইয়ের সুর ও-বাড়ির মাথা থেকেই তো ভেসে আসছে !

পেছন ঘুরে মানুষটি আবার পা ছোটায়। দরজার সামনে এসে কাঠের ওপর ঠকঠক আওয়াজ করল একটু। আস্তে-আস্তে খুলতে থাকে দরজার পাট। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোটাসোটা, গোলগাল সুন্দর চেহারার মাঝবয়সী এক মহিলা। গোলাপি-রেশমি শাড়ি-পরা। বাঁ কোমরের পাশে লাল-হলুদ উজ্জ্বল উল দিয়ে বোনা টাকা-পয়সার থলি ঝুলছে !

মহিলা খুশি চোখে একপলক দেখলেন। তারপর হেসে-হেসে অবাক গলায় বলেন, "ভরতভাই, তুমি !"

ভরতের কালো চকচকে ভুরু দুটি কপালে প্রায় উঠে আসে। চটপট উত্তর দেয়, "হ্যাঁ দিদি। ঘরদোর রং করেছ। সুন্দর সাজিয়েছ ! তোমাদের বাড়িতে কিসের অনুষ্ঠান ?"

প্রশ্ন শুনে বিষম খেলেন মহিলা। চমকানো গলায় উত্তর দেন, "আমাদের মেজ মেয়ে মনিতার আজ বিয়ে যে !"

গলার স্বরে অভিমান এসে যায় ভরতের, "মনিতার বিয়ে ?"

এক মুহূর্ত এদিক-ওদিক তাকিয়ে জবাব দেন মহিলা, "হ্যাঁ গো !"

গম্ভীর হয়ে গেল ভরত, "তোমরা তো আর আমাকে নেমন্তন্ন করলে না। বোনঝির বিয়েতে নিজে থেকে তাই চলে এলাম।"

মহিলা বাড়ির কর্তা গুনুঠাকুরের গিন্নি। মানুষটির কথা শুনে দারুণ চমকে গেলেন, "তোমার দাদা নিজে সেদিন নেমন্তন্ন করতে গেছিল। অবশ্য তুমি তখন বাড়ি ছিলে না। বাজারে সওদা আনতে না কোথায় যেন বেরিয়ে ছিলে। নেমন্তন্নের চিঠি তাই তোমার খোকার কাছে রেখে এসেছিল তোমার দাদা। তুমি তা হলে সে-চিঠি পাওনি ?"

ভরতের ভুরু আবার কুঁচকে আসে, "না দিদি, আমি কোনও নেমন্তন্নের চিঠি পাইনি !"

তারপর নিজের খেয়ালে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে আবার বলতে লাগল, "তুমি কি আর মিথ্যে বলবে ! তা হলে নিশ্চয় আমার দুষ্টু ছেলেটা ইচ্ছে করে ব্যাপারটা চেপে দিয়েছে। বাড়ি ফিরে যাই, আমাকে বেকায়দায় ফেলার মজা বুঝিয়ে দেব।"

মহিলা হেসে বলেন, "এত চটে যাচ্ছ কেন ! বেচারি বোধহয় ভুলে গেছে !"

কথা বলতে বলতে ঘরের ভেতর ঢুকে যায় দু'জনে। কোণের দিকে সরে দাঁড়াল গুনুঠাকুরের গিন্নি। বলেন, "ছেলেকে আর বকে লাভ নেই। চলে যখন এসেছ, ভালই হল।"

বাড়ির কর্তা তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে দু'জনের মাঝখানে উপস্থিত। ভদ্রলোকের চোখে আনন্দ এবং বিস্ময়ের ঝিলিক। "যাক, তুমি তা হলে আমার নেমন্তন্নের চিঠি পেয়েছ ?"

মানুষটি আবার যেন রেগে উঠল, "না দাদা, আমি কোনও চিঠি-টিঠি পাইনি। তোমাদের সবার কথা ভাবতে-ভাবতে একরকম আকস্মিকভাবে এসে পড়লাম।"

কর্তামশাই ভরতের কথা শুনে ভীষণ খুশি। "বাঃ, বেশ বলেছ। ভাল কথা, তোমার শরীর কুশল তো ? পেটের ব্যথা এখন কেমন আছে ?"

ভরত চোখ নামায়। পেটের দিকে চাউনি রেখে বলতে লাগল, "পেটের অসুখ ! হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুর ওষুধ এখনও খেয়ে যাচ্ছি। মনে হচ্ছে একটু যেন নরমের দিকে। ওষুধ বলতে কতগুলো সাদা বড়ি আর লাল মিকশ্চার। ওসব বড়ি-মিকশ্চার খেলে পেট নরম থাকে। আবার খাওয়ার অনিয়ম হলে, ব্যথাটা পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। অত নিয়ম মেনে চিকিৎসা করা পোষায় দাদা ! তুমি তো জানো, আমার খাওয়ার কোনও টাইম নেই। গভীর রাতে এ-জঙ্গল সে-জঙ্গল ঘুরে কাঠ কাটা ··· ভোরের আলো না ফোটার আগে পিঠে ভারী নিয়ে বাড়িমুখো দৌড়নো। তারপর মহাজনের দোকানে কাঠ পৌঁছে দিয়ে দাঁড়ানো। নগদ টাকা পেলে ভাল, তা না হলে হাঁ-চোখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা। টাকা নিয়ে আর-এক মহাজনের দোকানে ছুটে যাওয়া। সওদা নিয়ে তারপর লম্বা রাস্তা দৌড়ে-হাঁপিয়ে, সাত মাইলের পর বাড়ি, সেখানে গিয়েও ঝামেলা। বুঝলে দাদা, ছেলেটাকে কিছুতে বাগে আনতে পারছি না। এক দণ্ডও বাড়ির ভেতর থাকে না। খুঁজে-খুঁজে ধরে আনতে হয়। অত ঝক্কির পর যা হোক করে রান্না চাপানো। তা আমাদের মনিতা-মা কোথায় ?"

মানুষটির মস্ত এক দোষ। একবার কথা বলা শুরু করলে সহজে থামতে চায় না।

গুনুঠাকুরের গিন্নিও বলে ওঠেন, "পাশের ঘরে ভর্তি লোকজন। ওখানেই মনিতা।"

ভরত আবার জিজ্ঞেস করল, "বর আসেনি, বর ?"

মহিলা বলেন, "না, বর বা বরযাত্রীরা এখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। আসার সময় অবশ্য হয়ে গেছে।"

এবার জানতে চাইল ভরত, "বর কী করে দিদি ?"

মহিলার মুখে হাসি ছড়ায়, "ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ভাল কাজ করে। পারমানেন্ট হয়ে গেছে।"

"কত টাকা মাইনে পায় গো দিদি ?"

ভরতের এ-প্রশ্ন কানে যেতে মহিলার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "বেতনটা যা খারাপ। মাত্র সাড়ে পাঁচশো। উপরি টাকাটাই দেখার মতো ! সব মিলিয়ে তা হাজার দেড়েক টাকায় গিয়ে দাঁড়ায়।"

উপরি আয়ের অঙ্ক শুনে মানুষটি এবার চোখ মটকায়, "উপরি, এ কী বলছ দিদি ?"

ভরতকে গুনুঠাকুরের গিন্নি বোঝালেন, "হ্যাঁ ভাই, আজকাল মানুষের আসল মাইনের থেকে উপরি আয়ই বেশি ! জঙ্গলের অফিসারবাবু তো !"

ঘাড় কাত রেখে মাথা দোলাতে হয় ভরতকে, "তা যা বলেছ। ব্যাপারটা বুঝলাম।"

"মেয়ে সুখে থাকলেই হল, সংসারে অভাব না থাকলেই হল। তাই না দিদি ?"

"হ্যাঁ।"

গুনুঠাকুরের গিন্নিকে বেশ খুশি-খুশি দেখায়।

হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, এমন ভাব করেন মহিলা, বললেন, "ভরত ভাই, তুমি তো অনেক পথ হেঁটে এসেছ, পেট নিশ্চয় এতক্ষণে খালি হয়ে গেছে। কী খাবে বলো ?"

মনে-মনে ভরত ভীষণ খুশি হয়। খাওয়া-দাওয়ার নাম শুনলে ওর ভালই লাগে। বলল, "এখন আর কী ঝামেলা করবে ! দুধ থাকলে খাওয়া যেতে পারে। আমার আবার তেল-ঝাল-মসলার জিনিস খাওয়া বারণ। হেলথ সেন্টারের ডাক্তার কুণ্ডু না বাতিকের লোক, খালি বড়ি-মিকশ্চার দিয়ে চিকিৎসা করেন। আর সেই সঙ্গে মুখে তাঁর এক কথা— নেমন্তন্ন বাড়িতে ভুলেও ঢুকবেন না। খুব বেশি এদিক-সেদিক ঘুরবেন না। তারপরই বলবেন, পেট খালি থাকে না যেন ! পেটের অসুখের রোগীকে তিন ঘণ্টা পর-পর খাবার খেতে হয়। আচ্ছা দিদি, আমাদের মতন খেটে-খাওয়া মানুষের পক্ষে খাওয়ার ব্যাপারে খুঁতখুঁতে হলে চলে ?"

এর পর ভরত নিশ্চয় চব্বিশ ঘণ্টায় লম্বা ফিরিস্তি আর একবার বলে যাবে। ওকে চুপ করিয়ে দেবার জন্য হাঁক দেন মহিলা, "সূর্য,ও সূর্য কোথায় গেলি ?"

সামনে এসে দাঁড়ায় বছর পনেরোর দীর্ঘ চেহারার একটি ছেলে। এর নামই সূর্য বাহাদুর ঠাকুর। গুনুঠাকুরের বড় ছেলে। মহিলা ওকে দেখতে পেয়ে বলেন, "সূর্য, ভরতের জন্য একটু দুধ নিয়ে আয় বাবা !"

তির্যক দৃষ্টিতে সূর্য ভরতকে একবার দেখল, "এঁকে তো চেনা-চেনা লাগছে ! কে মা ?"

তাড়াতাড়ি মহিলা বলেন, "ভরত, আমাদের পারিবারিক বন্ধু। তোর বাবাকে একদিন ভীষণ বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিল।"

কী বিপদ, কবে সেই বিপদ ঘটেছিল, সেসব কথার জালে ছেলেটি ঠিক এ-মুহূর্তে জড়াতে চায় না। গুনুঠাকুরের গিন্নিও চেপে গেলেন। সূর্য শুধু বলল, "ও, তাই বুঝি !"

তারপরই নরম সুরে বলতে থাকে, "ভরতদাদু, মার সঙ্গে গল্প করো। আমি তোমার দুধ জোগাড় করে আনছি।"

একটু বাদে ছেলেটি গ্লাস-ভর্তি দুধ নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। দেখতে পেয়ে ঠোঁটে হাসি ফেলে যায় ভরতের। গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে আবার বলল, "সূর্য ভাই, তোমার কী আক্কেল ! শেষ পর্যন্ত কাঁসার গ্লাসে দুধ নিয়ে এলে ? আমার তো গ্যাসট্রিকের অসুখ আছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দেয় সূর্য, "হাতের কাছে যা পেলাম, তাতেই নিয়ে এলাম।"

মাথায় চুলের ঝাড় কেঁপে ওঠে, "কেন ? তোমার মা যে সেদিন পশুপতি থেকে স্টেনলেস স্টিলের কয়েক ডজন গ্লাস-বাটি কিনে নিয়ে এলেন !"

ভরতের কথা শুনে সূর্যর গলায় রাগ ভাব ফুটে উঠল, "তোমার এত কম আক্কেল কেন ভরতদাদু ? ওসব জিনিস দিদির বিয়ের বরাতের। এখন কী করে ব্যবহার করা যাবে ? শুভ কাজ হয়ে যাক,

তারপর ওগুলোতে হাত ছোঁয়ানো ঠিক হবে।"

"কথায় আজকাল বেশ মারপ্যাঁচ দিতে শিখেছ। আমি একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ। পদবি ছেত্রী। শরীরের জন্যই মাছ-মাংস ছুঁতে হয়। তা ছাড়া মা-বাবা- কাকা- আপন আত্মীয়কে কোনও জিনিস দেওয়ার সময় এত বাছবিচার করতে আছে?"

গুনুঠাকুরের গিন্নির সামনে ছড়ানো-ছিটনো অনেক কাজ। বর আসেনি। একসঙ্গে সব এসে গেলে হুলুস্থুলু কাণ্ড বেধে যাবে! মহিলা তাই ভরতের পক্ষে সায় দিয়ে বলেন, "এত বকছিস কেন? যা না অন্য কোনও গ্লাস নিয়ে আয়!"

কথা বলতে-বলতে "একটু আসছি" বলে ঘরের বাইরে মহিলা চলে গেলেন।

সূর্যও এক দৌড়ে স্টিলের বাটি হাতে ফিরে আসে। কাঁসার গ্লাস থেকে বাটিতে দুধ ঢালতে গিয়ে মাটিতে গড়ায়। ভরত বাটির গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে আঁতকে উঠল, "এ কী ভাই, দুধ যে একেবারে বরফ! একটু গরম করা সম্ভব নয়?"

ছেলেটির হয়েছে বিপদ। আবার দৌড়তে হয় রান্নাঘরের দিকে।

এদিকে চোখ ছোট করে চারপাশে চোখ বোলায় ভরত। এ-পাশের ঘরে কাউকে নজরে ঠেকল না। মেঝেতে পড়ে থাকা দুধটুকুর জন্য কেমন মায়া হল। আঙুলে টেনে-টেনে জিভে ঠেকিয়ে ভাবে, বাঃ, খাঁটি দুধই বটে!

মেঝে মোছার জন্য কাপড়ের টুকরো আনতে ছুটেছিল সূর্য। ফিরে এসে দেখল, দুধ পড়ার জায়গা লেপা। কাঠের মেঝে যা একটু ভিজে।

দুধের বাটির ওপর ফুফু করে ঠোঁটের পাশে নিয়ে গিয়েছিল, এমন সময় অবাক গলায় বলে উঠল সূর্য, "ভরতদাদু, তুমি তো এখনও দুধ খাওনি। গোঁফে দুধের সর লাগল কেমন করে?"

ছেলেটি কম চালাক নয়। চটপট মাথায় বুদ্ধি খেলিয়ে নিল ভরত। বলল, "এখানে আসব বলে রাস্তায় বেরিয়েছি, এমন সময় আমাদের গাঁয়ের রাজমনদাদু পেছনে ডাক দিল। জানতে চাইল, আমি কোথায় চললাম? বললাম, বোনঝির বিয়ে, খেতে যাচ্ছি। রাস্তা আটকে সাধাসাধি করল, আমার ছেলে হয়েছে। বড়িতে হইচই ব্যাপার! মাংস- বিরিয়ানি কত কিছুর আয়োজন। অনেক লোক আসবে-যাবে। তোমার পেটে তো ওসব ভাল জিনিস সইবে না। তুমি অন্তত এক গ্লাস দুধ গলায় ঢেলে রওনা হও।"

কথা বলতে-বলতে দেওয়াল-আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। তারপরই মুখ ফিরিয়ে বলল, "দুধের আর দোষ কী! যা ঠাণ্ডা পড়েছে। গোঁফে লেগে যাওয়া দুধ এতক্ষণে জমে গেছে।"

সোজা হেঁটে ভেতরে ঢুকে যায় ভরত। মানুষ-ভর্তি ঘর। সাজগোজ করে মুখ শুকিয়ে বসে থাকা মনিতার কাছে গিয়ে বলে উঠল, "মামণি, তোমার রুমালটা একবার দেখি।"

অপরিচিত একজন মেয়েদের আসরে হঠাৎ ঢুকে এসে রুমাল চেয়ে বিপদে ফেলবে, স্বপ্নেও ভাবেনি। মেয়েটি তাই কম অবাক হয় না। দরজা ঘেঁষে গুনুঠাকুরের গিন্নি দাঁড়িয়ে। ইশারায় রুমাল দিয়ে দিতে বলেন যেন।

রুমাল নিয়ে ভরত আবার ফিরে আসে আয়নার পাশে। গোঁফের রেখায় জমে যাওয়া দুধের সর তোলে রুমালে। হঠাৎ চোখ সরে যায়। দ্যাখে, মোটা কালো একটা লেজ জানলা দিয়ে ছিটকে পড়ল।

টুলের ওপর রাখা দুধের বাটি চোখ টানে। যাঃ, বাটি ফাঁকা! মেজাজটাই খারাপ করে দিল। বাউণ্ডুলে হতচ্ছাড়া বেড়ালটা ওর ওপর বাটপাড়ি করে কেটে পড়ল। গুনুঠাকুরের গিন্নির কাছে এখন আবার দুধের কথা বলতে যাওয়া ভাল দেখায় না।

মন হালকা করার জন্য মনিতার কাছে যায়, "দারুণ লাগছে তোমাকে। এমন সুন্দর সাজিয়ে দিল কে?"

মাথা না উঠিয়ে লাজুক মনিতা উত্তরে জানায়, "আমার বন্ধুরা।"

এমন সময় একনাগাড়ে গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

"বর এসেছে, বর এসেছে।" চিৎকার চেঁচামেচির ধুম পড়ে যায় বরের গাড়ি ঘিরে।

মনিতা একা হয়ে যায় ঘরে। মানুষজনের ঠেলাঠেলি আর পা-দাপাদাপিতে কাঠের বাড়ি, সিঁড়ি শরীর ঝাঁকাল কিছুক্ষণ। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে! সানাইয়ের সুর থেমে গেছে। শঙ্খধ্বনি বেজে উঠল। পাহাড়ি নিঝুম পথ হ্যাজাকের আলোয় এখন ঝলমল।

গোটা ঘুম পাহাড়ের মানুষ হুমড়ি খেয়ে আছে বরের গাড়িতে। কে কাকে ঠেলে আগে বর দেখবে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি-ফোঁটা উড়ে এল। সবাইকে সরিয়ে-সরিয়ে গুনুঠাকুরের গিন্নি এবং বয়স্কারা বর বরণ করে ঘরে ঢুকলেন। সিঁড়ির এক কোণে একাকী দাঁড়িয়ে রইল ভরত। ঘরের ভিড় ঠেলতে মন চাইল না।

আচ্ছা ঝামেলায় পড়ল। পেটের ভেতর গুড়গুড় ডাক গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। সমানে হাওয়া ঠেলে ঠেলে পেট্ শুঁতোচ্ছে। হতচ্ছাড়া পেট। মানুষটির স্টমাকের দেওয়ালে কে যে অটো-অ্যালার্ম-ক্লক সাঁটিয়ে রেখে গেছে কী জানি! ঘড়ির ছোট কাঁটা তিন-তিন ঘর সরলেই এরকম কাণ্ড বাধে। বাড়ির সবাই বর, বরযাত্রীদের নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে, নিজের জন্য খাবার চাওয়া বোকামি।

গুনুঠাকুরের গিন্নি এদিকে আসছেন। ওঁকে দেখে ভরত বলে ফেলল, "তোমাদের মেয়ের জামাই ভাল হয়েছে দিদি।"

মহিলা একগাল হেসে বলেন, "কেমন করে বুঝলে?"

গোঁফের ফাঁকে হাসি ছড়ায় ভরত, "আপেলের মতন টকটকে ফরসা রং। দেখতেও তেমনই। যাই বলো, বুদ্ধিমান।"

এবারও মুচকি হাসলেন মহিলা, "তাই বুঝি!"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ভরত, "বয়স তো হয়েছে। চোখ-মুখ দেখে এখন বেশ বুঝতে পারি কে ভাল, কে মন্দ!"

মহিলা আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন। ভেতরের ঘরে জামাই-মেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসে। সামাজিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে।

ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ···

তারপরই বর-কনের কপালে চাল এবং আবিরের টিকা পরানোর ধুম। ভরত এসব খিড়কি জানলা দিয়ে লক্ষ করল। পাশ দিয়ে সূর্য যাচ্ছিল। কথা ছুঁড়ে দেয় ভরত, "সূর্যভাই, খাবারের কী মেনু হয়েছে?"

"শেলরুটি, নেপালি আলুর দম, খাসির মাংস আর দার্জিলিং চা-পাতির এক-এক গ্লাস চা!"

মাথা দোলায় ভরত, "তা ছাড়া এ-বাজারে কী-ই বা করা সম্ভব! রান্নার ব্যবস্থা কোথায় হয়েছে?"

সূর্য যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আশেপাশে ছড়ানো-ছিটনো মানুষজনের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভরত আবার মুখ খোলে, "গুনুঠাকুর রামরো মানুষ। লোকের ভিড় তো হবেই।"

আঙুল তুলে সূর্য জানায়, "পাহাড়ের খাঁজে ত্রিপল দিয়ে ঘেরা ওই যে জায়গাটা দেখছ, ওখানে রান্নাবান্না হচ্ছে।"

কাঠের রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে সরু রাস্তার ওপিঠে চোখ ফেলল ভরত। হালকা মেঘের ঝড়ে হলুদ আলোর ফোঁটা লেপা। ওর তলায় ত্রিপল টাঙানো আবছা ঘর-ই। পেটের ওপর হাত চলে গিয়েছিল। হাত সরিয়ে হাঁটতে থাকে। ··· যত সামনে এগোচ্ছে, মাংসের ভুরভুরে

সুবাস ততই যেন নাক চেপে ধরছে।

রান্নার জায়গায় এসে ভরত চুপ হয়ে দাঁড়ায়। একসময় গলার স্বর মৃদু করে বলল, "রান্নার কত দূর ?"

কোমরে বাঁধা তোয়ালেতে একটু হাত ঘষে প্রকাণ্ড ডেকচির ভেতর লম্বা খুন্তির খোঁচা মারল রান্নার ঠাকুর। গম্ভীর মুখে জানায়, "শেলরুটি, আলুর দম রেডি। মাংস হতে মিনিট দশেক সময় লাগবে।"

মুখ-চোখ কাচুমাচু হয়ে গেছে ভরতের, "দেখি তো, একটু টেস্ট করি।"

যেই না এ-কথা বলা, ভেতরের আবছা আলোয় আর-একটি মুখ নড়ে উঠল, "সকাল থেকে মেয়ের বাড়ির কত লোকের সঙ্গে আলাপ হল, আপনাকে বাবু ঠিক চিনলাম না তো !"

রান্নার লোকজনদের চটানো ঠিক নয়। গলার স্বর আগের মতন মিষ্টি রেখে বলল ভরত, "আমার সঠিক পরিচয় তোমরা পাবে কোত্থেকে ? আমি হচ্ছি গুনুঠাকুরের অনেক দিনের বড় কুটুম।"

রান্না নিয়ে ব্যস্ত ঠাকুর মাথা ঝাঁকায় কিছুক্ষণ। তারপর ডেকচির মাথায় ঠং-ঠং কয়েক ঘা মারে। খুন্তির মাথায় এক টুকরো মাংস উঠিয়ে জানতে চাইল, "এখানে কোনও জায়গা নেই। কিসে নেবেন বাবু ?"

জ্বলন্ত আংগাঠির পাশেই লাল মাটির গ্লাস পড়ে ছিল। মুহূর্তে হাতে তুলে নেয় ভরত। ডেকচির মাথা ঠেকিয়ে গ্লাস ধরে রইল। তর সয় না। পেট ওলটাচ্ছে।

"চটপট দাও তো ঠাকুর।"

মাটির গ্লাসের ভেতর মাংস ফেলে দিয়ে, "বলছেন বড় কুটুম। না দিলে রাগ করবেন। এদিকে বাড়ির কর্তা গুনে-গুনে মাংস রান্না করতে দিয়ে গেছেন !"

গরম মাংসের ছোঁকা লাগে আঙুলে। উলটে-পালটে একটু ঠাণ্ডা করে নেয়। দাঁতে শব্দ তুলে মাংস চিবোয় ভরত। আবার গ্লাস উঠিয়ে ধরল। "দারুণ রান্না হয়েছে। তুলনা হয় না। আর-এক টুকরো দাও তো ভাই।"

রান্নার ঠাকুর চোখ গোল-গোল করে তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়। মুখে বিরক্তি প্রকাশ পায়। "রান্নার সময় এত ডিসটার্ব করছেন কেন ?"

ভরতের গলার স্বর গম্ভীর, "বললাম তো আর-এক টুকরো দাও।"

আংগাঠির সামনে থেকে এক লাফ মেরে সরে যায় ঠাকুর, "বড় কুটুম যখন, ডেকচি থেকে নিজেই যত খুশি তুলে নিন।"

লাজ-লজ্জা পাবার পাত্র ভরত নয়। পেট ওলাচ্ছে যখন, এক টুকরোয় কী আর হবে ! কথার শব্দে আকুতি মিশিয়ে তাই বলল, "এঁটো হাতে ডেকচি ছুঁয়ে দেব ? তা ভাল দেখায় না। তুমিই দাও।"

একজন এগিয়ে এল। রান্নার ঠাকুরের কানে-কানে বলল, "দিয়ে দাও। সাত মাইলের এই ভরত ছেত্রী না হলে আঠার মতন তোমার পেছন লেগে থাকবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর-এক টুকরো মাংস গ্লাসের ভেতর ফেলে দিল ঠাকুর। ওপর থেকে ফু-ফু শব্দ করে ভরত। বারবার আঙুল ঠেকিয়ে গরম বোঝে। তারপর দাঁতে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে মাংস খায় আর জানায়, "মাংস এখনও শক্ত আছে গো ঠাকুর। জল কম হয়েছে।"

বলেই রান্না করার জায়গা ছেড়ে সরে পড়ল ভরত। ও-ঘরের মানুষজনের চাপা হাসি কানে উড়ে এল। সেদিকে ভরতের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই !

॥ দুই ॥

টাইগার পাহাড়ের ঠিক নীচে ঘুম পাহাড়, যেখানে কোমর মোচড় খেয়ে পেশক এক নম্বর রাস্তা হয়েছে, সেখানেই গুনুঠাকুরের বসতবাড়ি। আর এই বিয়েবাড়ির ধুম জোড়বাংলোর ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে ! ভরত ফিরে এসে কাঠের রেলিং ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। ... দূর ছাই, পেটের ভেতরটা আবার কেমন যেন করছে। বেশি ঝালের মাংস খেয়ে ফেলার ফল এখন ভুগতে হবে। পেট ফুলে-ফেঁপে ঢোল ! মুখ দিয়েও হাওয়া উঠছে না। গুনুঠাকুরকে বর-কনে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ডাক দিল ভরত, "দাদা,দাদা তোমারও তো গ্যাসট্রিকের অসুখ আছে। কেমন যেন করছে পেটের ভেতরটা। একটু কারমিনেটিভ মিকশ্চার পাওয়া সম্ভব ?"

ঘাড় নেড়ে গুনুঠাকুর জানাল, "আছে তো বটেই। এখন এই ভিড় বাড়িতে মিকশ্চারের বোতল হাতড়াতে কাকে পাঠাব ?"

আবার একজন লোক দৌড়ে এসে সামনে দাঁড়ায়। হাঁফাতে-হাঁফাতে বলতে লাগল, "গুনুঠাকুর, এক বস্তা কাঠ-কয়লা দাও না !"

সরল গলায় ভদ্রলোক শুধু বলেন, "বাড়িতে অনুষ্ঠান চলছে। এ-সময় গুদাম ঘরে ঢুকতে বলছ ?"

লোকটি নাছোড়বান্দা। খরখরে গলায় উত্তর দিল, "আমার বাড়িতে কলকাতার কুটুম এসেছে। শীতে মরে যাচ্ছি, হাড় কাঁপছে ! ঘর গরম করার ব্যবস্থা করো বলে মানুষগুলো সব চেঁচাচ্ছে। তাই তোমাকে বিরক্ত করতে ছুটে এলাম।"

গুনুঠাকুর অগত্যা গলার স্বরে মিষ্টতা এনে বলেন, "এ-কথার ওপর আর কী বলা যায় ! আচ্ছা, ব্যবস্থা করছি।"

তারপরই ভরতের দিকে মুখ ফিরিয়ে ভালমানুষ গুনুঠাকুরকে বলতে হয়, "সূর্যর হাতে তোমার দাওয়াই পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটা দেন গুনুঠাকুর।

পাহাড়ি গাঁয়ে এই হচ্ছে মুশকিল। যে-যা ব্যবসা করে তার কাছে কেউ একজন ছুটে এলে, মুখে না বলার কোনও উপায় নেই। বারণ করলে ভাল মানুষের সম্পর্কও সেখানে ফুরিয়ে যায়। আবার সেই মধুর সম্পর্ক জোড় লাগবে কখন, কেউ জানে না ! কাঠ-কয়লার ব্যবসা করলে কী হবে, ভদ্রলোকের ব্যবহারের তুলনা নেই। সব সময় সবার কাছে আপনজন।

সূর্য ভরতের দৃষ্টি কাড়ে। ওর হাতে দাওয়াইয়ের শিশি, "ভরতদাদু, তোমার ওষুধ।"

হাতের এক মোচড়ে শিশির ঢাকনা খুলে ফেলল ভরত। ঢকঢক শব্দে গিলতে থাকে ওষুধ। তারপর সূর্যর হাতে ফিরিয়ে দিল শিশি।

চোখের সামনে সেটি আনতে বিস্ময়ে চোখ ছোট হয়ে যায় ছেলেটির। "ওষুধ প্রায় শেষ করে দিলে !"

মাথা কাত করল ভরত, "কুইক কাজ হবার জন্য একসঙ্গে অনেক ডোজ খেয়ে নিলাম ভাই।"

অবাক গলায় সূর্য এবার বলল, "ভালই করলে ভরতদাদু ! এখনই আবার একশিশি ওষুধ কিনে এনে ঘরে রাখতে হবে। বাবার দরকার হলে চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন।"

চুপচাপ না দাঁড়িয়ে কেটে পড়ল ছেলেটি।

প্রায় হাঁফাতে-হাঁফাতে গুনুঠাকুরের গিন্নি এসে বলে ওঠেন, "ভরতভাই, তোমার শরীর খারাপ লাগছে ? তোমার যা ইচ্ছে এখন খেয়ে নাও।"

গলা পরিষ্কার করে ভরত জানায়, "না না, শরীর খারাপ করবে কেন ! পেটের ঘড়িটা একটু বিগড়ে গিয়েছিল। এখন অল রাইট।"

মহিলা তবু আবার বলেন, "অনেক দূরে তোমাকে ফিরতে হবে।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে ! তুমি খেয়ে নাও না ভাই।"

আপত্তি করল ভরত, "তা কী করে হয় দিদি ! বরযাত্রীদের পেট খালি রয়েছে। ওঁরা না খেলে, আমি কী করে খেতে বসি ?"

ভরত ভীষণ একগুঁয়ে। মহিলাকে তাই বলতে হয়, "ওকথা বললে আমি আর কী বলব !"

॥ তিন ॥

রাত গভীর হচ্ছে বাইরে। পাহাড়ি পথও ঝিম মেরে আছে। অতিথিদের খাওয়ানোর পালা শুরু হয়েছে এই একটু আগে। পাইনের ঘন জঙ্গলে ঝিঁঝির ডাক। রাস্তায় একলা দাঁড়িয়ে ভরত। পাহাড়ি-মানুষ হলে কী হবে, শীতের কাঁপুনি লাগছে গায়ে। সোয়েটার বা শাল গায়ে চাপিয়ে আসেনি। আশেপাশে আগুন থাকলে হাত বাড়িয়ে হাত সেঁকে শরীর গরম করা যেত। একবার রান্নার জায়গায় দৌড়তে মন চাইল। পরক্ষণে ভাবে, ভুলেও সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। ওখানকার মানুষগুলো যা খেপে আছে !

এদিকে যা একটু হইচই কাঠ-কয়লার মহাজন গুনুঠাকুরের ঘরের ভেতরেই। মাঝে-মাঝে দু'-একজন দৌড়-পায়ে ত্রিপল-ঘেরা রান্নাঘরের দিকে বালতি-ঝুড়ি হাতে দৌড়চ্ছে ; আবার বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হচ্ছে।

সবে বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিচ্ছিল ভরত। হঠাৎ চমকে যায়। চোখ বরাবর কে বা কারা যেন হেঁটে আসছে। সামনের মানুষটির হাতে বাক্সমতন কিছু একটা। সাদা মেঘের হালকা ঢেউ ওদের সামনে দিয়ে উড়ে যায়। রাস্তার ধারের টিমটিমে আলোয় স্পষ্ট তাই দেখতে পাচ্ছে না।

খুব অবাক হয়ে ভাবল, এদিকেই তো আসছে। চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে ধরা বিড়ি রাস্তায় মুখ ফসকে পড়ে গেল ! ভরতের ভাবনা তখনও শেষ হয়নি। চোখের সামনে দেখতে পেল ঘুম হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুকে। পেছনে ডাক্তার-গিন্নি। ডাক্তার-গিন্নির হাতে কাগজের লম্বা বাক্স। নিশ্চয় এঁরা বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন।

অপ্রস্তুত দেখায় ভরতকে। ভাবল, ডাক্তারবাবু এসময়ে এখানে দেখতে পেয়ে ওকে আবার কী উপদেশ দেবেন, কী জানি !

ডাক্তার ভদ্রলোক কৌতূহলী চোখে তাকালেন। তারপর ভরতের মনের অবস্থা আঁচ করে শান্ত গলায় বলে ওঠেন, "ভরত, কী খবর ? সব ঠিকঠাক চলছে তো ?"

মাথা ঝাড়া দিয়ে ভরতও উত্তর দেয়, "হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমি এখন সুস্থ আছি।"

ডাক্তার-গিন্নি আগে-আগে পা চালিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন। কাঠের সিঁড়ির ধাপে তখনও ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে। আবার বলেন, "তা তো বটেই। নয়তো বিয়েবাড়ির সামনে দেখা হবে কেন ?"

হাসবার চেষ্টা করল ভরত, "আপনার কথা সব মেনে চলছি। সুস্থ না হয়ে পারি !"

কথার মাঝে সূর্য এসে দাঁড়ায়, "ডাক্তার আঙ্কল্, বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ? ভেতরে চলুন।"

নির্মল হাসি ডাক্তার ভদ্রলোকের ঠোঁটে, "যাচ্ছি, যাচ্ছি। ভরত ছেত্রীর সঙ্গে এই একটু গল্প করছিলাম।"

সূর্য এবার বলল, "ভরতদাদু অনেকক্ষণ এসেছেন।"

হঠাৎ ডাক্তারবাবু উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেন, "ওর সামনে সুখ্যাতি করা ঠিক নয়। মানুষটি খুব ভাল। মাঝে-মধ্যে অবাধ্য হয়ে যায় ! খাবারের নিয়ম মেনে চলে না। অনেকদিন পেটের ট্রাবলে ভুগছে ! ডাক্তারদের করার কী আছে, রোগী যদি নিজে থেকে বুঝতে না চায় !"

সূর্যর গলার স্বর খুব গম্ভীর হল, "এই তো একটু আগে পেট গোলাচ্ছে বলে মিকশ্চার চাইলেন। তারপরই প্রায় সব ওষুধ গলার ভেতর ঢেলে দিলেন ঢকঢক করে। আমাকে আবার বলেন, কুইক কাজ হবার জন্য একসঙ্গে অনেক ডোজ খেয়ে নিলাম।"

আর কথা বাড়ায় না দু'জনে। মাথা নামিয়ে রাখে ভরত। কোনও প্রতিবাদ জানায় না। মনে-মনে যা একটু ক্ষুণ্ণ হয়। সূর্য ছেলেটি সায়েন্স নিয়ে দার্জিলিং সরকারি কলেজে পড়াশুনো করে। তা ছাড়া ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে খাতির থাকায় অনেক-কিছু জেনে ফেলেছে। নেমন্তন্ন বাড়িতে এসে যে ডাক্তার ভদ্রলোকের দেখা পাবে, ভাবতে পারেনি।

গুনুঠাকুর হাত ধরে ডাক্তারবাবুকে ঘরে নিয়ে গেলেন। এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে ভরত মন হালকা করতে পারল।

সূর্যও চলে যাচ্ছিল। ভারী গলায় ভরত ডেকে উঠল, "এই সেদিনও হাফপ্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। এখন কত কথা মুখে ফুটেছে তোমার !"

প্রতিবাদ জানায় সূর্য, "মানে ?"

কথায় সামান্য উত্তেজনা এসে পড়ে ভরতের, "মানে আর কিছু নয়। ডাক্তারবাবুর কাছে নালিশ করলে কেন ?"

সূর্য ভরতের কথায় এবার হেসে ফেলল। দু' কোমরে দু' হাত

রেখে বলল, "সেই জন্য তোমার রাগ হয়ে গেল ভরতদাদু ?"

"রাগ হবে না ! আমি তো তিনমাস হেলথ সেন্টারমুখো হইনি। এবার সেখানে গেলে ডাক্তারকুণ্ডু কথা শোনাবেন।"

সূর্যর মুখের ভাবে দুঃখ এসে যায়, "আমার কথা সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন ?"

ভরত গম্ভীর হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর গলার স্বর স্বাভাবিক করে নিয়ে বলল, "খুশির দিনে অসুখ-বিসুখের কথা ভুলে থাকাই ভাল।"

খপ করে মানুষটির হাত ধরে ফেলল সূর্য, "সরি ভরতদাদু। এবার তুমি খাবে চলো।"

ঘরে পা রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই। বাড়ির মানুষ এবং অতিথির ভিড়ে থিকথিক করছে। বর-কনেকে নিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। বরযাত্রীদের দু'-একজন নতুন বউয়ের কানের পাশে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে ফিসফিস গলায় কথা বলায় ব্যস্ত। এদের নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া শেষ। বাড়ি ফেরার চিন্তা মাথায় আসতে একজন তাড়া দিয়ে উঠল, "বিয়ে দেখা, খাওয়া শেষ। মিছিমিছি আর এখানে বসে থেকে কী লাভ ! চলো, যাওয়া যাক।"

এ-কথায় ধমকে দিল অন্যজন, "নিজেদের পেট-পুজো সারলেই চলবে ! ড্রাইভারদের খাওয়া হবে, তবে তো যাওয়া !"

এই হল মুশকিল। গাড়ির এক ড্রাইভার এখনও বসে আছে আড্ডায়। ওকে ডাকলে অবশ্যই চলে আসবে। আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা সেরে, অন্যজন সবে মাত্র ফিরেছে। চোখে পড়তে বেচারিকে দু'-একজন কথা শোনায়, "লছমনদাদু, তোমার আচ্ছা আক্কেল বটে। রাত প্রায় ন'টা বাজে। সবাই তোমার অপেক্ষায়। আর তুমি কিনা কোথায় আড্ডা দিতে চলে গেলে যে, তোমাকে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না।"

শোরগোলের ভেতর এক মহিলা আবার বলল, "এত কথা বলার কী আছে ! বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব তো এদের আছে। কোথাও এলে এক-আধঘণ্টা এদিক-ওদিক হতেই পারে। তা নিয়ে এত হইচই করার কী থাকতে পারে ?"

পাশ থেকে একজন ফস করে বলল, "তা বললে কী চলে ! ঘণ্টার হিসেবে গাড়ি বুক করা আছ।"

সঙ্গে-সঙ্গে আগের মহিলা মাথা দুলিয়ে বলল, "হোক না ! খরচ দেবেন গুনুঠাকুর। সে-রকমই কথা হয়েছে।"

লছমন-ড্রাইভার কোনও রকমে খাওয়া শেষ করে ফিরল। এসে চটেমটে বলতে লাগল, "আমার গাড়িতে কে-কে যাবেন উঠে পড়ুন।"

ধাক্কাধাক্কিতে ঘর ফাঁকা হবার উপক্রম। লছমনের পায়ে ব্যস্ততা। সে-ও বেরিয়ে এল।

লছমনের মাথা খোলা ল্যান্ড-রোভারে চৌদ্দজনের মতন যাত্রী এসেছিল। এখন সে-গাড়িতে কোলে-পিঠে শরীর গুঁজে উনিশ-কুড়িজন জায়গা করে নিয়েছে। দেখতে পেয়ে গাড়ির সামনে রাস্তায় পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লছমন, "সবাই মিলে আমার গাড়িতে চাপলে, দ্বিতীয় গাড়ি কি এখানে শুয়ে পড়বে ?"

বরযাত্রীদের একজন উত্তরে বলল, "তোমার গাড়িখানা তো ব্রিটিশ আমলের। পাঁচজনের জায়গায় কুড়িজন চাপলেও একই সময়ে পৌঁছবে !"

যাত্রীদের কথা শুনে রাগ বাড়ে লছমনের, "এত মানুষ এক গাড়িতে যেতে চাইলে যাওয়া তো দূরের কথা, গাড়ি স্টার্টই নেবে না ! তা ছাড়া অন্ধকার রাস্তা, চাকায় হাওয়া কম !"

অন্য ড্রাইভারের এখনও পাত্তা নেই। খোঁজা শুরু হল। কোথায় কোন দোকানে ঢুকে আড্ডা মারছে !

শোরগোল শুনে গুনুঠাকুর ছুটে এলেন। বরযাত্রীদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, "লছমনের গাড়িতে যাঁরা-যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বাদে নেমে আসুন। হরকমন কোথায়, আমি দেখছি।"

রাস্তার ও-পাশের ভুটানি দোকানের ভেতর চলে গেলেন। ঘরময় অন্ধকার ধোঁয়া। ধোঁয়ার জাল ছিঁড়ে কোণের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ান। হরকমন তো আর গাড়ি চালাবে না। জোড়বাংলো থেকে ঢালু হড়হড়ে রাস্তায় চাকা চারটে আপনা-আপনি তরতরিয়ে নেমে যাবে। সতর্ক চোখ সামনে ফেলে ড্রাইভার শুধু স্টিয়ারিং-এ হাত ছুঁইয়ে রাখবে।

হরকমন গুনুঠাকুরকে তেরছা দৃষ্টিতে একবার লক্ষ করল। মুখে কোনও শব্দ করল না। ভদ্রলোক মিষ্টি গলায় তাই বলেন, "হরকমন, তুমি এবার ওঠো ভাই। তোমার জন্য গাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে সবাই।"

কথায় সুন্দর কাজ হল। ভদ্রলোককে সবাই মান্য করে, শ্রদ্ধার চোখে দেখে !

যে যেমনভাবে এসেছিল, ঠিক তেমনভাবে গাড়িতে চেপে বসল চুপচাপ। টলতে-টলতে গাড়ি দুটি এগোতে থাকে। বাহারি কাগজে তৈরি শিকল এ-মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে ! ওরা উড়ে-উড়ে চড়াইপথে দাঁড়ানো অন্ধকার-মানুষগুলিকে বিদায় জানাল কিছুক্ষণ। তারপরই মেঘের ঝড়ে হারিয়ে গেল।

॥ চার ॥

বাড়ির মানুষ, আশেপাশের পড়শি এবং বরকনে এখন শুধু ঘরে। খেতে ব্যস্ত ছিল ভরত। কাগজের প্লেট থেকে খাবার সব পটাপট মুখের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত ধুয়ে এসে কাঠের সিঁড়ির পাশে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, সূর্য ডেকে নিয়ে যায়।

গুনুঠাকুর ঠাণ্ডা গলায় শুধু বলেন, "ভরত আমাদের অনেক দিনের পুরনো বন্ধু। সেদিনের দুর্যোগ রাত্রির কথা আমি, আমার গিন্নি আর এই ভরত ছেত্রী ছাড়া কে-ই বা মনে রেখেছে।"

মনিতার মনের ভেতর চাপা উত্তেজনা। লজ্জার ভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এতক্ষণে বলল, "ভরতদাদু, সেদিনের গল্পটা বলো না। শুনতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।"

ভরত ছেত্রীর মনেও ভিড় করছে পুরনো সেইসব ঘটনার মিছিল। না-বলার জন্য পেটে এতক্ষণ ধরে চাপা বিদ্রোহ চলেছে ? পেটের কথা খালি হয়ে যাওয়াই ভাল।

জানলার পাশে এসে ভরত দাঁড়াল। চোখে চড়াই-উতরাই পাহাড়ি পথের সব ভাঁজ স্পষ্ট ধরা পড়ে না ! নীচের খাদ থেকে শুধু গানের হালকা সুর উঠে আসছে। ওখানে আবার কিসের উৎসব চলছে, কী জানি !

ভরতের গা ঘেঁষে সূর্য তখনও দাঁড়িয়ে। হাতে মোড়া। সূর্যর কথায় বা ব্যবহারে ওর প্রতি খিটখিট ভাব আর প্রকাশ পায় না। মোড়ায় বসল ভরত, বলল, "অনেক দিনের বাসী কথা। সবাই শুনতে চাইছে যখন, বলি তা হলে। তা বছর-কুড়ি নিশ্চয় হবে !"

ভুল বলে ফেলেছিল ভরত। গুনুঠাকুর শুধরে দেন এই বলে, "ভরতভাই, কুড়ি নয়। পাক্কা আঠারো বছর।"

"আঠারো বছর আগের গভীর এক রাত। পাহাড় অথবা সমতলের মানুষজনও মনে হয় না তখন জেগে। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে পিঠে চাপিয়ে নীচের জঙ্গল থেকে উঠে আসছিলাম। আমি একা। পিঠের বোঝায় মাথা, ঘাড় ঝুঁকে ছিল সামনে। ঝপঝপিয়ে

বৃষ্টি হয়েছে এই একটু আগে। খাড়া পাহাড়ে উঠতে গিয়ে একসময় জান কেমন করে। শ্বাস নিতে-ছাড়তেও কষ্ট। চারপাশে ছায়া-ছায়া গা-ছমছম নিস্তব্ধতা। দাঁড়িয়ে পড়লাম। আবার হাঁটছি। হঠাৎ চেঁচামেচিতে মেজাজ গেল বিগড়ে। বিরক্তিতে পিঠের বোঝা নামিয়ে রেখে চারপাশে জুলজুল চোখে তাকিয়ে রইলাম। একবার মনে হল এক দঙ্গল কুকুর নিজেদের ভেতর শোরগোল করছে। তারপরই কেন যেন মনে হল, না-না শেয়াল।

"নিজেই নিজেকে ধমকে দিই। জঙ্গল নিয়ে যার জীবন কাটছে তার আবার শেয়াল-কুকুরে ভয়! রাত্তিরে আমরা যেমন পেটের দায়ে কাঠ কাটতে এসেছি, বেচারিদেরও তো পেটের জন্য খাবার খোঁজার প্রয়োজন রয়েছে। ভাগাভাগিতে গণ্ডগোল হলে মারামারির আগে একটু-আধটু চেঁচামেচি হতেই পারে। ঠোঁটে বিড়ি রেখে এসব ভাবি আর টান মারি। পিঠে বোঝা তুলে নিলাম আবার। পা-পা হেঁটে যত এগোচ্ছি, জন্তুগুলোর চিৎকার তত কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি।

"মনের ভুল ভাঙল। কুকুর-শেয়াল নয়। এক দল হায়েনা। দীর্ঘ সাদা জিনিসটাকে ঘিরে নিজেদের ভেতর ঝগড়া করছে। আমার সমস্ত শরীরে ভয়, উত্তেজনা। কী করব, তারস্বরে বলতে থাকি— সরে যা সব, সরে যা! না হলে দা-পেটা করব।

"আমার ধমক আর রাগের চোটে এদিক-ওদিক জন্তুগুলো দৌড়ে পালাতে লাগল। দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে বোকার মতন সাদা জিনিসটার কাছে ছুটলাম। হাওয়ার টানে আগুন গেল নিভে। আবার একটা কাঠি জ্বাললাম। সেটাও দপ করে নিভে গেল। দেশলাই-এর বাক্স শেষ হবার জোগাড়। বুকপকেটের ওপর হাত চলে গিয়েছিল। আঙুলের মাথায় শক্ত কিছু ঠেকল। দারুণ ব্যাপার, পকেটে টুকরো মোমবাতি রাখা আছে।

"মোমবাতি হাতের কাছে থাকলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। এমন পাগলা হাওয়ার টানে কতক্ষণ আর জ্বলে থাকবে? যাক, এতক্ষণে হাওয়া থেমেছে। অনেক ভিজে কাঠি ঠুকতে ঠুকতে জ্বলল। মোমবাতির কৃপণ আলো ছড়ায় সামনে। দৃষ্টি আছড়ে পড়ল। উপুড় হয়ে শোয়া মানুষের শরীর। কম রসিক মানুষ নয়। শোবার আর জায়গা খুঁজে পেল না? খোলা আকাশের নীচে, পাহাড়ের পিঠে দিব্যি ঘুমিয়ে রয়েছে। ঘুমিয়েছে, না মরে গেছে!

"ডান হাত ধরে হেঁচকা টানে চিত করে দিলাম। মানুষটার বুকের ওপর কান পেতে দিই। বুকের বাঁ পাশে ধুকধুক শব্দ শুনতে পেয়ে আঁতকে উঠি। মানুষটা তা হলে জীবন্ত! বোজা দু' চোখের দরজা তবু বন্ধ। ভীষণভাবে তন্দ্রাচ্ছন্ন।

"একটু জল ছিটোলে, মুখে-চোখে জলের ঝাপটা মারলে তড়াং করে উঠে বসতে পারে। কে জানে, কী খেয়ে মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

"দূর ছাই, জলের খোঁজে গভীর এই রাতে কোথায় ছোটাছুটি করব? ঝোরা সেই নীচের খাদে বা ওপরকার গুদাম ঘরের পাশে। তা ছাড়া জল নিয়ে ফিরে আসতে-আসতে মানুষটাকে জন্তুগুলো কামড়াকামড়ি করে নির্ঘাত খেয়ে ফেলবে।

"হাত পিছলে জ্বলন্ত মোমবাতি বেহুঁশ মানুষটার পায়ের ওপর পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অস্ফুট গোঙানির শব্দ কানে এল। টুকরো মোমবাতি আর জ্বালানো সম্ভব নয়। দেশলাই-বাক্সের সব কাঠি শেষ। কোথায় বা সরিয়ে রেখে যাবে। নিজেরই পা টলমল করছে। ··· ভোর না হওয়া পর্যন্ত কোনও উপায় করা এ-মুহূর্তে অসম্ভব! ভারীর ওপর চুপচাপ বসে পাহারাদারের কাজ করতে লাগলাম।

"আকাশ থমথমে। হাওয়া বন্ধ হয়ে বৃষ্টি পড়া শুরু হল। বড় ফোঁটার বৃষ্টিতে মানুষটার স্নান শেষ। তবু ঘুম ছুটবার লক্ষণ নেই। কখনও-কখনও গোঙানির মৃদু শব্দ না শোনার মতন লাগছিল।

"গান? গান কে গাইছে? নীচের ঢালু খাদে চোখ আছড়ায়। লোক একজন উঠে আসছে। ভাবলাম, চেনাজানা কেউ নিশ্চয় হবে। আমার গলায় আকুল আর্তনাদ।

"'কো হো? কে? এতা আউনু হোস। এখানে একটু এসো।'

"মাথা তুলল না লোকটা। উত্তরে বলল শুধু, 'আউদে না। আসব না।' কথা শোনার সময় হাতে নেই। ভোরের আলো ফুটতে বেশি দেরি কোথায়? তার আগেই কাঁচা কাঠ নিয়ে পাহাড় টপকাতে হবে।

"আমিও এবার বলে উঠলাম, 'কী ধরনের মানুষ তুমি ভাই? এদিকে বিপদ ঘটেছে বলেই তো তোমাকে ডাকছি।'

"লোকটা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। মাথা তুলে জানতে চাইল, 'কিসের বিপদ? গভীর রাতে আবার বিপদ-আপদ কোত্থেকে এল।'

"উপর থেকে একরকম ঝাঁপ দিয়েই ওর কাছে নেমে এলাম। লোকটাকে চিনতে পারলাম। টাইগার পাহাড়ের কাছাকাছি থাকে। আপনভোলা মানুষ। নিজের ছাড়া অন্যের ব্যাপারে বিশেষ ঝোঁক নেই! সেই জন্য ওকেও গাঁয়ের অনেকে পছন্দ করে না।

"আকুল গলায় তবু আবার বললাম, 'দ্যাখো ভাই, একটা বেহুঁশ মানুষ পড়ে আছে ওখানে। হায়েনারা ছেঁকে ধরেছিল। আমাকে দেখে পালিয়েছে!'

"বাঁকা কথায় উত্তর শোনাল সে। 'বাঘ-ভাল্লুক তো নয়! অত চিন্তার কী আছে?'

"ধমকে উঠলাম আমি, 'হাসি-ঠাট্টার সময় এখন নয়। একটা ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।'

"লোকটার কথাবার্তায় কোনও মিষ্টতা নেই। বলল, 'না ভাই। ওসব মরা মানুষেরা ধারে-কাছে আমি যাচ্ছি না। পুলিশ আমাকে নিয়েও টানাটানি করবে।'

"আবার একবার উঁচু গলায় আমি বললাম, 'দূর ছাই। এসব অলুক্ষুণে কথাবার্তা বলছ কেন? মানুষটা মরেনি।'

"জিজ্ঞেস করল লোকটা, 'কী করে বুঝলে?'

"উত্তরে বললাম, 'বুকের ধুকধুকানি আমি শুনতে পেয়েছি। মুখে গোঁগোঁ শব্দও করছে।'

"টানতে টানতে ওকে সামনে নিয়ে এলাম। হাঁটু মুড়ে মাটিতে লোকটা বসল। আমার মতন করে শোয়া-মানুষটার বুকের ওপর কান পাতল। তারপরই হাসতে-হাসতে বলল, 'মিথ্যে বলোনি। বুকের ভেতর শব্দ হচ্ছে। শ্বাস ফেলছে।'

"দু'জনে মিলে যুক্তি করে তল্লাশি চালিয়ে জামার পকেট থেকে একটা রুমাল আর কিছু টাকা পাওয়া গেল। রুমালে রঙিন সুতোয় লেখা— 'গুনুঠাকুর। জোড়বাংলো'।

"আমার আনন্দ আমার কাছে। সঙ্গের লোকটার ভেতর কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। কেটে পড়তে পারলে যেন ওর ভাল হয়। মুখ-চোখে এমন ভাব।

"ওকে বললাম, 'তুমি এখানে মানুষটাকে পাহারা দাও। জোড়বাংলো থেকে লোকজন নিয়ে এই এক্ষুনি আমি ফিরে আসব।'

"আমার কথায় লোকটা খেপে উঠল, 'তুমি কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। আমি এখানে হাঁ-চোখে বসে থাকি। তারপর কাঁচা ধুপি-গাছ কাটার দায়ে চাপরাশি এসে ধরুক।'

"শেষ পর্যন্ত অবশ্য লোকটাকে রাজি করানো সম্ভব হল। নিজের পকেট থেকে দশ টাকা বকশিশ ওর হাতে আগেই দিয়ে দিতে হল।

"রুমাল হাতে পড়ি-মরি করে কীভাবে যে সেদিন দৌড়েছিলাম, সে-কথা নিজেও এখন মনে করতে পারব না।

"জোড়বাংলোয় পৌঁছে ভুটানি দোকানের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম। দরজার পাট খুলে লাকপা ছিরিং জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তোমার ? এমনভাবে দরজা ভাঙে কেউ ?'

"হাঁফাতে-হাঁফাতে উত্তর দিই, 'তোমার দোকানের দরজা ভাঙছি না। বিপদে পড়ে এলাম। জোড়বাংলোয় গুনুঠাকুরের বাড়ি কোথায় ?'

"চোখ ঘষতে-ঘষতে লাল বকুপরা লাকপা উত্তরে জানায়, 'ওই তো উলটো দিকের বাড়িটাই গুনুঠাকুরের বাড়ি।'

"এক লাফে উলটো দিকের বাড়ির দরজায় আছড়ে পড়লাম। কাঠের ওপর দুমদাম কিল-চড় মারতেও কেউ দরজা খুলল না। কোণের জানলার ওপর একটা মুখ নড়ে উঠল।

"'কী হল, ভোর না হতে এমন দরজা পেটাচ্ছে কে ?'

"'এটা কি গুনুঠাকুরের বাড়ি ?'

"মহিলা কাতর গলায় উত্তর দেন, 'দাঁড়াও ভাই, আসছি।'

"দরজা খুলে মহিলা সামনে দাঁড়াতে হাতের রুমাল দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'একজন মাঝবয়েসী মানুষ নীচের খাদে পড়ে আছেন। ওঁর পকেটের ভেতর এই রুমালটা ছিল।'

"মহিলা হাতে রুমাল টেনে নিলেন। ততক্ষণে চোখের ঘুম পালিয়ে গেছে। সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেছে ভেবে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন সুর করে, "'কী সর্বনাশের খবর তুমি নিয়ে এলে ভাই ?'

"ওঁকে শান্ত করার জন্য এবার বললাম, 'কান্নাকাটি করছেন কেন ? মানুষটা বেঁচে আছে। ঘুম থেকে শুধু উঠছে না, এই যা।'

"তাড়াতাড়ি কেরোসিন ঢেলে শিশি দুটো ভর্তি করল একজন। শিশির মাথায় আগুন জ্বলল। আপাতত এগুলো মশালের মতন আশ্চর্য কাজ দেবে। পাহাড়ি মানুষ এ-ধরনের আলো হাতে নিয়েই রাতে পথ চলে !

"বাড়ির এক দঙ্গল মানুষকে নিয়ে আমার পেছন-পেছন পা ছোটান মহিলা। পাহাড়ের খাদে নেমে দেখি, অবাক কাণ্ড ! হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন শোয়া মানুষটা। পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব যাকে দিয়ে গেছি, সে লোকটা কোথায় ? নিজের পকেটে দশ টাকার নোট গুঁজে চুপচাপ কেটে পড়ল ? দায়িত্বজ্ঞান বলে কিছু নেই ? অদ্ভুত লোক তো ?

"অনেক করে ডাকাডাকিতেও ভদ্রলোক কোনও সাড়া দিলেন না। ঝিম মেরে বসেই রইলেন। কপালের সামনের দিক ফোলা-ফোলা। অনেকটা থেঁতলে গেছে। রক্তের ঘষা দাগ। কেউ একজন নিজের খেয়ালে বলে উঠল, 'কী ব্যাপার, এখানে,এখানে তুমি কখন এলে গুনুঠাকুর ? বন্ধুর ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে তিন মাইলে কাল রাত্তিরে গিয়েছ। এসব কখন আবার ঘটল ?'

"কোনও কথার জবাব দেন না গুনুঠাকুর। বাড়ির সবাই যুক্তি করতে লাগল, কীভাবে মানুষটাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। আমিও তখন উসখুস করছি। আর দেরি করা চলবে না। আকাশে নীলচে আলোর রেখা ফুটব-ফুটব ভাব।

"সোজা হেঁটে পাহাড় ডিঙনো বুদ্ধির কাজ নয়। বরং ঘুরপথে চড়াই ভাঙা ভাল। হেলথ সেন্টারের পেছন দিকের জঙ্গলে মিনিট পনেরোর পথ। সেই ধুপি গাছের জঙ্গলটার এক-পা এক-পা লুকোচুরি রাস্তা দিয়ে সোজা উঠে গেলে তবে কালিম্পং-তাকদা রোড।

"পিঠে বোঝা তুলে হাঁটা দেবার সময় আমি শুধু বললাম, 'যাচ্ছি। বাড়ি তো চেনা হয়ে গেছে। পরে গুনুঠাকুরের খোঁজ নেব।'

"গুনুঠাকুরের গিন্নি এই বিপদের মধ্যেও বলতে ভোলেন না, 'হুজুর, হজুর ! তপাইলাই, ধন্যবাদ।'

"না দাঁড়িয়ে আমিও বলতে-বলতে এগোতে থাকি, 'ধন্যবাদ দেওয়ার কী আছে ! মানুষকে তো ভালবাসতেই হবে।'

"চারদিন বাদে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গুনুঠাকুরকে। রোগীকে দেখতে সেখানে ছুটলাম। যাই-আসি। গুনুঠাকুরের গিন্নি রোগীর বিছানায় বসতে বলেন একদিন। পরিচয় করে দেন এই বলে, 'তোমাকে ভরতভাই বাঁচিয়েছে। ওর সঙ্গে একটু কথা বলো।'

"ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টি শূন্য। হাঁ-চোখে কিছুক্ষণ আমাকে দেখলেন। তারপরই বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

"কথায়-কথায় জানা গেল, অত উঁচু পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ায় মাথার সামনের দিকে বেশ চোট লেগেছে। সেইজন্যই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন গুনুঠাকুর। কখনও যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, কখনও কিছু মনে থাকছে না— মাঝে-মাঝে খাপছাড়া কথাবার্তা বলছেন।

"তারপর তো অনেকদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে হয়েছে। পাক্কা তিন মাস। সুস্থ হবার লক্ষণ একটু দেখা গেল। কলকাতা-দিল্লি ... কত শহরে অসুখের ঠেলায় আরও এক বছর দৌড়লেন। ভাল হওয়ার আনন্দে এ-বাড়ির সবাই নেমন্তন্ন খেতে ডেকে আনল আমাকে। সেই খাবারের মেনু শুনলে এখনকার ছেলে-মেয়েরা রীতিমত আপসোস করবে। খাওয়া শেষ হতে গুনুঠাকুর মহাকাল মন্দির থেকে আনা লাল সুতোর মাঝখানে বাঁধলেন সোনার লকেট। তারপরই পরিয়ে দিলেন আমার গলায়। আপত্তি করতেও শোনেননি। সেই থেকে নিজের ঘর-দোর হয়ে গেছে এ-বাড়িটা ! আর হ্যাঁ, পাহাড়ের খাদে পড়ে যাবার রহস্য অনেকদিন পর আবিষ্কার করা গেল।

"বন্ধুর ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন গুনুঠাকুর। সামনে-পেছনে কুয়াশার ঢেউ। রাস্তার গোল্লা মতন বাঁকে পৌঁছে শুনতে পেলেন গাড়ির হর্ন। চোখের ওপর হেড লাইটের রাক্ষুসে আলো পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। পায়ের পাতা ডান পাশে সরে নরম মাটির কিনারে পিছলে যায়। তারপরই পাহাড়ের খাদে গড়াতে থাকে গুনুঠাকুরের শরীর। ব্যস, এ-পর্যন্তই আমার গল্প !"

গল্প বলা শেষ করে বিরাট এক হাই তুলল মানুষটি। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েন গুনুঠাকুরের গিন্নি, "বিছানা দিচ্ছি। এখানেই শুয়ে যাও ভরতভাই। এত রাত্তিরে আর বাড়ি গিয়ে লাভ নেই !"

বাড়িসুদ্ধু লোক রাত কাটাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল ভরতকে। মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়, "তা হয় না। বাড়ি আমাকে ফিরতেই হবে। না হলে ছেলেটা ঝিম মেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে।"

কথাবার্তায় ভরত এখন স্বাভাবিক। মনিতার হাতের মুঠোয় ভরতের দেওয়া সোনার জিনিস। এমন সাঙ্ঘাতিক গল্প শোনার পর উপহার ফেরানো ঠিক নয়। সেই সঙ্গে অদ্ভুত চরিত্রের এই মানুষটির স্মৃতি হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেবে।

কথা খুঁজে পাচ্ছে না ভরত। মুখ-চোখ ঘুরিয়ে ঘরের সবাইকে দেখল।

বাইরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। ঘুম পাহাড়ের ঘুম-জোড়বাংলোয় বারো মাসে বৃষ্টির উৎসব। এই টিপির-টিপির বৃষ্টি... পরক্ষণে আকাশ ফরসা ! আবার আকাশ থমথম... ঝাপুর-ঝুপুর বৃষ্টির ফোঁটা। ... গুনুঠাকুরের বাড়ির লোকজনের দৃষ্টি সামনে। রাস্তার মৃদু আলোয় টলমলে পায়ের পাতা কিছুক্ষণ দেখা গেল। তারপরই ভরত অদৃশ্য !

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

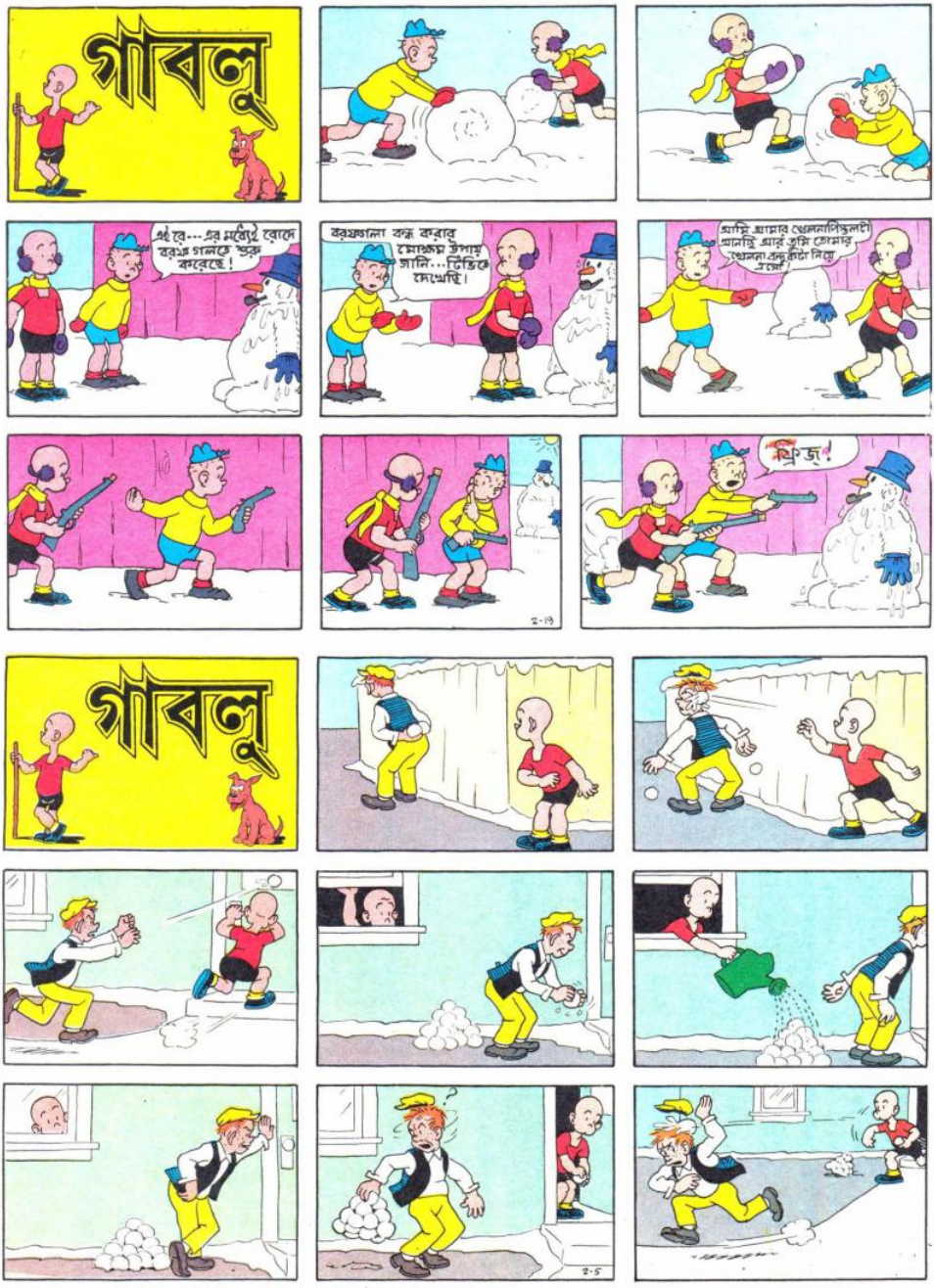

গাবলু
এই রে… এর মধ্যেই রোদে বরফ গলতে শুরু করেছে!
বরফগলা বন্ধ করার মোক্ষম উপায় জানি… টিভিতে দেখেছি।
আমি আমার খেলনাপিস্তলটা আনছি আর তুমি তোমার খেলনা বন্দুকটা নিয়ে এসো!
2-19
ফ্রিজ!

গাবলু
2-5

হালুম হলেই বাঘ হয় না

আবুল বাশার

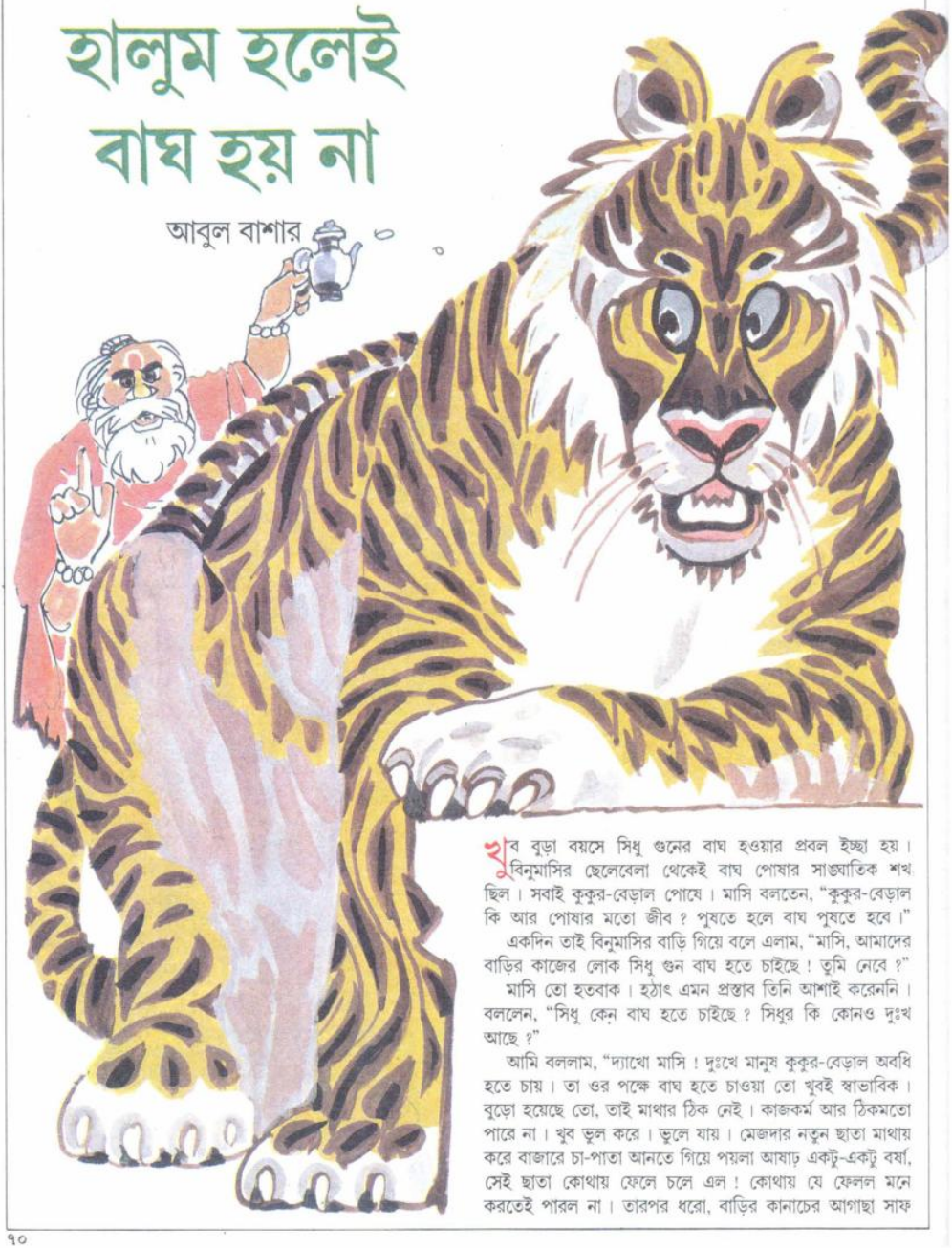

খুব বুড়া বয়সে সিধু গুনের বাঘ হওয়ার প্রবল ইচ্ছা হয়। বিনুমাসির ছেলেবেলা থেকেই বাঘ পোষার সাঙ্ঘাতিক শখ ছিল। সবাই কুকুর-বেড়াল পোষে। মাসি বলতেন, "কুকুর-বেড়াল কি আর পোষার মতো জীব ? পুষতে হলে বাঘ পুষতে হবে।"

একদিন তাই বিনুমাসির বাড়ি গিয়ে বলে এলাম, "মাসি, আমাদের বাড়ির কাজের লোক সিধু গুন বাঘ হতে চাইছে ! তুমি নেবে ?"

মাসি তো হতবাক। হঠাৎ এমন প্রস্তাব তিনি আশাই করেননি। বললেন, "সিধু কেন বাঘ হতে চাইছে ? সিধুর কি কোনও দুঃখ আছে ?"

আমি বললাম, "দ্যাখো মাসি ! দুঃখে মানুষ কুকুর-বেড়াল অবধি হতে চায়। তা ওর পক্ষে বাঘ হতে চাওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। বুড়ো হয়েছে তো, তাই মাথার ঠিক নেই। কাজকর্ম আর ঠিকমতো পারে না। খুব ভুল করে। ভুলে যায়। মেজদার নতুন ছাতা মাথায় করে বাজারে চা-পাতা আনতে গিয়ে পয়লা আষাঢ় একটু-একটু বর্ষা, সেই ছাতা কোথায় ফেলে চলে এল ! কোথায় যে ফেলল মনে করতেই পারল না। তারপর ধরো, বাড়ির কানাচের আগাছা সাফ

করতে বলা হল ওকে, ও করলে কি, উঠোনের আস্ত তুলসীগাছটা গোড়াসুদ্ধু কেটে ফেললে। এইরকম সব করছে! পেয়ালাপিরিচ ভাঙার তো বিরাম নেই।"

শুনতে শুনতে বিনুমাসি চোখ বড়-বড় করে বললেন, "সে কী রে! এত দূর?"

আমি বললাম, "তবে তোমায় আর বলছি কী! ওকে দিয়ে আর চলছে না। কিন্তু সেকথা ওকে মোটেও বলা যাবে না। খেপে যাবে। খেপে গিয়ে আরও ভাঙাভাঙি শুরু করে দেবে, এটা-সেটা উপড়ে ফেলবে। অভিমান করে সিঁড়ির উপর গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে। তাই দেখে, মা বলবেন, 'সিধু খুব লজ্জা পেয়েছে।'"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? লজ্জা পেয়েছে বললে ওর খুব আমোদ হয়। মিটকি-মিটকি হাসে। পিত্তি জ্বালা-করা হাসি। মেজদা রাগে ফায়ার। মাকে দুষবে আর বলবে, 'তুমিই ওকে আশকারা দিচ্ছ মা!'"

ঘটনা সত্যিই এরকম। গালে হাত দিয়ে সিঁড়ির উপর সিধু গুন বসে আছে। তাই দেখে মেজদার মেজাজ গেল চড়ে। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেল। মেজদা বললে, "ওই কি লজ্জা পাওয়ার ছিরি, ওর সব হল বদমায়েশি! তিন কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখন বলে কিনা, বাঘ হবে। মানুষ হয়ে থাকতে আর ভাল্লাগছে না। বাঘ হওয়া যেন মুখের কথা!"

মুখের কথা তো নয়ই। সবাই আমরা সেকথা জানি। মা তবু বললেন, "আহা! সিধু কি আর সত্যিই ওরকম হতে পারে নাকি! ওর ইচ্ছে হয়েছে তাই! যেমন ধর, বাংলার বাঘ সার আশুতোষ! রয়েল বেঙ্গল টাইগার! মানুষ যে বাঘ না-হয়, তেমন তো নয়। কালেভদ্রে হয় বইকী! সার আশুতোষের মুখের গোঁফ জোড়া দেখেছিস? ওই দেখে ইংরেজ-সাহেবরা পর্যন্ত ভয় পেত। একেবারে বাঘের মতন গম্ভীর গোঁফ চকচক করছে! ইতিহাস বইতে ছবি দেখেই বুঝেছি মানুষটি সত্যিকার বাঘ।"

মায়ের কথার সায় পেয়ে সিধু গুনের বিশ্বাস আরও গাঢ় হল। এমনিতেই গতকাল থেকে ওর মুখে শুনছি, মানুষ বাঘ হয়। মন্ত্রপড়া জল গায়ে পড়লে মানুষ তো বটেই, এমনকী কুকুর-বেড়ালও বাঘ হতে পারে। বনের এক মুনিমশাই একটা ভিতু ইঁদুরকে মন্ত্র পড়ে বাঘ করে দিয়েছিলেন। সে গল্প কে না জানে! বাঘ হওয়ার পর ইঁদুরটার সে কী দম্ভ! ঋষিকেই তেড়ে গেল খেতে! বাবা এই গল্প আকছার করেন। সিধুও সেই গল্প সহস্রবার শুনেছে। ওরও অক্ষরে-অক্ষরে মুখস্থ। প্রথমে ইঁদুরটাকে ঋষি বেড়াল করে দিলেন। তারপর করলেন কুকুর। অবশেষে বাঘ। ইঁদুরটাকে বাঘ হতে তিনটে স্টেজ পার হতে হয়েছিল। সিধু বলে, মানুষ উচ্চ জীব। তাকে বাঘ হতে গেলে মাত্র একধাপ উপরে উঠতে হবে। মন্ত্রপড়া জল গায়ে পড়া মাত্রই সে বাঘ হতে পারবে। সিধুর ব্যবস্থা জানা আছে। সে এতকাল এই পরিবারটির উপর দয়া করে বাঘ হয়নি।

সামনে-সামনে চলেছেন এ-বাড়ির কর্তা আর পিছু-পিছু বাজারের থলে হাতে করে হেলেদুলে চলেছে সিধু-বাঘ। পোস্ট আপিসে চিঠি ফেলতে চলেছে একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ভাবা যায়!

সিধু রাগ করে বললে, "ভাবা তো যায়ই না। তোমাদের অমন করে তেড়ে ভাবতেও কেউ বলছে না। আমার ভাবনা আমিই ভাবব। এই সংসারে কুকুর-বেড়াল হয়ে থাকলাম।"

এই একটা ধুয়ো ওর রয়েছে, দুঃখও রয়েছে। যেন সে কোনও কালেই মানুষ ছিল না। মাত্র দু'টাকার মাইনের কাজের লোক হয়ে সে এ-বাড়িতে ঢুকেছে। মাত্র দু'টাকা মাইনে। তখনকার কালে দু'টাকারই কত দাম ছিল। তবে হ্যাঁ, যতই দাম থাক, দু'টাকার বেশি তো নয়। মাত্র দু'টাকা—এটাই হয়েছে ওর কাল। এখন ওর মাইনে বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু দু'টাকার দুঃখ তো দুঃখ নয়, যেন হাহাকার। হঠাৎ আজকাল ওর মনে হয়, ভয়ানক ঠকে গেছে সিধু গুন। মাকে মাঝে-মাঝেই বলে, "তোমার শ্বশুরমশাই আমাকে দু'টাকার বেশি তো দিতই না। এদিকে কাজ করাত সারাক্ষণ। মানুষ মানুষকে খাটাতে পারলে আর কিচ্ছুটি চায় না। খাটতে-খাটতে এমন হত এক-এক দিন যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতাম। তারপর আর কাউকে চিনতে পারতাম না। তোমার শ্বশুর ভাবত, আমি যাত্রাপালা করছি। পাড়াতে খবর হয়ে যেত যে, অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পর আমি আর কাউকে চিনতে পারছি না। তাই শুনে কত লোক আসত আমাকে দেখতে! আসলে খাটনির চোটে যে আমার এরকম হয়েছে, তা কেউ বিশ্বাসই করত না। ঘনঘন এরকম হওয়াতে আমার তিন টাকা মাইনে বেড়েছিল। তবে হ্যাঁ, চিনতে না পারাটা কোনও দোষের না।"

মা জিজ্ঞেস করেন, "কেন?"

"কেন কী গো! সেটাই তো নিয়ম। ও-পাড়ার নরেন সাউ ডিমের ব্যবসা করে ফেঁপে গেল! তারপর ধরলে কাটা-কাপড়ের ব্যবসা। এখন আর কাউকে চিনতেই পারে না। আমি যখন বাঘ হব, দেখবে কাউকে চিনব না। আমার তো আর পেনশন নেই। বুড়ো হয়েছি, পায়ের উপর পা তুলে খাওয়া নেই। কে দেবে? বিনুদিদি যদি নেয়, তা হলে ব্যবস্থা করে বাঘ হয়ে আসব। বনের নাম সপ্তবটী। পীঠের নাম ছায়াপীঠ। সেই বনের ভিতর গ্রাম কুমড়োজোল। বটপাকুড়ের তলে থাকে এক সাধু। নাম চটবাবা। যাব আর আসব। হালুম! হালুম! হালুম! এই আমি তিন সত্যি করলাম।"

কথায়-কথায় বাস্তবিক সিধু তিন সত্যি করে ফেললে। আর রাখলে ইয়া মস্ত সাদা গোঁফ। তারপর সিঁড়িতে পায়ের উপর পা তুলে বসল চুপচাপ। নড়ে না, চড়ে না। কুটোটি পর্যন্ত নড়ায় না। যেন সে হরতাল করেছে। বাবা সেদিন সকালবেলা ওকে ওইভাবে গম্ভীর হয়ে বসে থাকতে দেখে খুবই আশ্চর্য হলেন। তারপর সিধু প্রকাণ্ড গোঁফ রেখেছে দেখে বাবা অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে। সিধু তো শিশুদের মতো ফোকলা। একটিও দাঁত নেই। তায় ফের গোঁফ রাখা। গালের থলথলে চামড়া কোনও কারণে নড়ে উঠলেই গোঁফ জোড়া ভূমিকম্পের মতো কাঁপে। মনে হয় একটা বাচ্চাছেলেই বুঝি বা নকল গোঁফ রেখে বসে আছে। দেখে খুব হাসি পায়। বাবা প্রথমে হাসবেন-না-কাঁদবেন বুঝতেই পারলেন না।

সিধু গোঁফ নেড়ে আপন মনে বলে উঠল, "ফুঁস্ ঘটি আর হুঁশ্ ঘটি। কুমড়োজোলের চটবাবার দুই তরফা মন্ত্রপড়া জল। বাঁ হাতের কাছে রয়েছে ফুঁস্! ডান হাতের কাছে রয়েছে হুঁশ্!"

সবাই আমরা সিধুর কথা শুনে একেবারে থ। বাবা কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন, লোকটার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

বাবা দু'পা সিধুর দিকে সভয়ে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "দ্যাখ্ সিধু! আমি তো তোকে কখনওই তেমন করে খাটাই না! বাবা তোকে সারাক্ষণ খাটাতেন, সেকথা ঠিক। মাইনে দিতেন সামান্য, দু'টাকা, সেকথাও অস্বীকার করিনে। তবে কিনা বাবা আলাদা লোক। আমরা আলাদা লোক!"

সিধু বাঘের গলায় কথা বলল, "চোপ্! তুমি তো বংশধর! হালুম!" বাবা দু'পা এগিয়েছিলেন, ভয়ে এক পা পিছিয়ে এলেন। বললেন, "তাই বলে হালুম বলবি! ভয় দেখাবি!"

"হ্যাঁ বলব।" নির্লিপ্তস্বরে বলে ওঠে সিধু। বলে, "বলব বইকী! হালুম-হলুম বলে, বলব না! কলকেতার বাবুরা বলে খেলুম-গেলুম। আমি বলছি হালুম-হলুম। ওদের যদি ওই মানায়, আমার তবে এই

মানায়। ডাকটাই তো আসল। তোমার বাপের ডাক শুনে আমার আধেক কলিজা শুকিয়ে যেত না ? আমাকে দাবড়াত কী দিয়ে ? ওই গর্জন। মেরে গেল। আমাকে মেরে গেল কুলভূষণ ! আস্ত রাখল না !

ঠাকুদ্দা কুলভূষণের ডাক ছিল খুব খারাপ। সেই কুখ্যাত ব্যাঘ্রগর্জনের কথা বলতে আমাদের খুবই লজ্জা করে। সেই গর্জনের ধাক্কায় তিন-তিনবার সিধু গুন ছেলেবেলায় নারকোল গাছের মাথা থেকে পড়ে যায়। সেই থেকে ওর বুকের হাড় ত্যাড়াবাঁকা হয়ে গিয়েছে। বুকের খাঁচার দিকে চাইবার জো নেই। ওর বুকের ধুকধুকি দেখা যায়, যেন ঘড়ির হৃৎপিণ্ড নড়ছে। একটা মানুষ টিক্‌টক করছে ক্রমাগত বুকের ভিতর। চেয়ে দেখতে দেখতে খুব মায়া হয়। আমার খুব ছেলেবেলায়, ওর বুকে কান পেতে আমি বাঁশি শুনতাম। মনে হত একটা পাখি ওর বুকের ভিতর ঢুকে একটা ডালের উপর, মানে একখানা বাঁকা ভাঙা ঢেউখেলানো হাড়ের উপর বসে অবিরাম শিস দিচ্ছে লেজ নাচাতে-নাচাতে।

সিধু চোখ নাচিয়ে শুধোত, "কেমন শুনছ ? তিন-তিনবার গাছ থেকে ভূতলে পড়েছি। রাখে হরি মারে কে ? তোমার ঠাকুদ্দা পারল ? তবে হ্যাঁ, একখানা ডাক বটে ! শুনলে জাহান্নম তক কাঁপে। কেঁপে পড়ে যাওয়া আমার কোনও অন্যায় নয়। অন্যায় বলতে খুব কচি-কচি ডাব কেটে ফেলেছি। নীচে থেকে বাবু মাথা গরম করে অ্যাইসা হাঁকলে যে, গা হিম হয়ে গেল। তবে হাসপাতাল আমার সয় না, তোমায় বলি ! বুকে ব্যান্ডেজ বেঁধে লোহার খাটে পড়ে থেকে গা ব্যথা করা ! চলে এলাম। সেদিন বৃষ্টিতে আকাশ ভেঙে পড়ছে। ঠাণ্ডা ধরে গেল। হাড় আর ঠিক করে জোড়ে না। তা যাকগে ! মুফতে লাভ হল এই বাঁশি। সব জিনিসেরই একটা কমিশন আছে। কান পাতলে আমি নিজেও একটু-আধটু শুনতে পাই।" বলেই সিধু গুন হা-হা করে হাসত। বুঝতে পারতাম, ঠাকুদ্দার উপর ওর ভয়ানক অভিমান ছিল। সেই অভিমান রাগের মতো জ্বালা ধরাত ওকে। ও তাই ছেলেবেলা থেকেই নাকি বাঘ হওয়ার কথা ভাবত। বাঘ হওয়ার পর অবশ্য কী করবে তা ওর জানা নেই। থাকলে ও সেকথা বলত। ইদানীং কেবলই বলছে, শুনতে পাচ্ছি, বিনুমাসি যদি নেন, তা হলে ও বাঘ হয়ে আসবে। তা হলে ও সপ্তবটী যাবে। এখন মাসির উপর নির্ভর করছে, সিধু গুন বাঘ হবে কি হবে না !

আর সে কারণেই আমাকে মাসির কাছে আসতে হল।

বিনুমাসি, শুনেছি ছেলেবেলা থেকেই নাকি খুব পাকা। মানুষের মনের কথা খুব সহজে পড়ে ফেলতে পারেন। কথারও খুব আঁটুনি বাঁধুনি। এখন কিছুটা বয়েস হওয়ার পর বুদ্ধি আরও পেকেছে। কথার গোড়াতেই তিনি একটা করে 'প্রথমত' বসান, দ্বিতীয় দফায় বাক্যের গোড়ায় 'দ্বিতীয়ত' বসিয়ে কথায় যুক্তির তেজ ধরিয়ে দেন। তার ফলে হয়েছে কী, প্রথমত দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত করা ওঁর এখন মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে।

সিধু গুনের অতীত বৃত্তান্ত তাঁর কম জানা নেই। কেবল সাম্প্রতিক ঘটনার কথা তাঁকে চোখ বড়-বড় করে বর্ণনা করে শোনাতেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "আমার কুকুরটা তুই দেখেছিস ? নেকড়ের মতো থলথলে, ভয়ে কোমর বেঁকে যায়। এদিকে মেনিমুখো, সোয়া বিঘতের মতো লম্বা, হয়তো চার ইঞ্চি বেশিই হবে, উচ্চতা বলার নয়। অথচ আমি বাঘ পোষার কথা ভেবেছি। ছেলেবেলায় স্বপ্ন দেখতাম। বাবা বলতেন, আমার বিনু পাগল। কিন্তু কখনও অস্বীকার করতে পারতেন না, বাঘ, মানুষ পুষতে পারে না। মেনিমুখো কুকুরটা আমার লজ্জার কারণ হয়েছে। পায়ের তলা থেকে নড়ে না। বাড়িতে গেস্ট এলে, লজ্জায় মুখই তুলবে না। দাঁড়া, ওকে আমি ডেকে দেখাচ্ছি !"

বললাম, "আমি তো চিকিকে দেখেছি মাসি, আবার দেখাতে চাইছ কেন ?"

মাসি বললেন, "দ্যাখ, শ্রীদীপ ! প্রথমত তোকে আমার প্রবলেম বুঝতে হবে। বাড়ির বাইরে গেটের কাছে, 'কুকুর হইতে সাবধান' কথাটা যে লিখে রেখেছি, দেখেছিস তো ?"

বললাম, "হ্যাঁ, দেখেছি। কেন দেখব না ?"

মাসি বললেন, "সেটা কি আদৌ দেওয়ালে সেঁটে রাখা যায় ? ডগ যদি অলটাইম ক্যাট হয়ে থাকে, মুখ তুলবে না, পায়ের তলায় পড়ে থাকবে। কেউ এল তো, লজ্জায় মরে গেল ! মাংস খেতে পারে না। শোঁকে কেবল। বিস্কুট খায় আর শাঁখআলু চিবোয়। অথচ দেওয়ালে লিখে রেখেছি, কুকুর হইতে সাবধান। ইস্ ! ভারী লজ্জার কথা ! ভাবলে মাথা কাটা যায় ! তুই এসেছিস শ্রীদীপ ! আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে।"

বললাম, "তা হলে তুমি সিধুকে নিচ্ছ ? সিধু যদি বাঘ হতে পারে, তা হলে ?"

বিনুমাসি চুপচাপ গম্ভীর হয়ে আছেন দেখে বললাম, "দ্যাখো মাসি, মেনিমুখো চিকি তোমায় যে লজ্জায় ফেলেছে, তা বুঝি !"

হঠাৎ মাসি কাঁদুনে গলায় ভেজাস্বরে বলে উঠলেন, "কেউ বুঝবে না, শ্রীদীপ ! পাশের বাড়ির ন'বউ এসে সেদিন যাচ্ছেতাই বলে গেল রে ! 'এটা কি কুকুর না কি ! ন্যাদা, লোমঅলা ঠিক, কিন্তু ঘিয়ে ভাজলে ইঁদুর ছাড়া কেউ বলবে না। তা ফের কুকুরের নামে প্লেট বসানো হয়েছে ! ছিঃ ছিঃ ! লজ্জাও করে না। মানুষের কি প্রেসটিজ বলে কোনও কিছু থাকতে নেই ! আমরা হলে পারতাম না। শুনেছি, এই মেয়ে নাকি ছেলেবেলায় বাঘ পুষতে চেয়েছিল ! হত যদি তাগড়া শিববাবুদের মতো একটা প্রকাণ্ড কুকুর, তবু না হয় কথা ছিল !"'

বলতে-বলতে মাসি প্রায় কেঁদেই ফেললেন। মাসিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "বলছিই তো তুমি সিধুকে নাও ! তোমার প্রেসটিজ বাড়বে। লিখে রাখবে 'বাঘ হইতে সাবধান' বা আরও গম্ভীর করে লিখবে, 'বাঘ আছে'। কী ? ঠিক বলিনি ?"

শুনতে-শুনতে বিনুমাসির মুখে এবার খাসা হাসি ফেটে গেল। সহসা আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "দ্বিতীয়ত, তোকে কথা দিতে হবে। কখনও কাউকে বলবি নে যে, সিধু বাঘ হয়েছে। সিধুকে আমি পুষছি ! নইলে ন'বউ বলে বেড়াবে, আরে ওটা তো মানুষ ! ভেবে দ্যাখ্ !"

বললাম, "খুব ভেবেছি মাসি ! তুমি ভেবো না। আগে হতে দাও। সিধু বাঘ হোক, তখন দেখবে ! ওই ন'বউ যখন দেখবে, রা পর্যন্ত কাড়বে না। সিধুর এমন ভয়ঙ্কর চেহারা হবে যে, মানুষ বলার সাহসই হবে না। তবে তোমাকে কথা দিচ্ছি, কাউকে বলব না। ভাবনা হচ্ছে, বাঘ হওয়ার পর সিধু না মেজদাকে অ্যাটাক করে !"

বিনুমাসি আশ্বাসের সুরে বললেন, "বাঘ হওয়ার পর আমিই তো ওকে নিচ্ছি। তোদের বাড়ি তো থাকছে না সিধু। তাই না ? অতএব অ্যাটাক করার চান্সও থাকছে না। হল তো ? তৃতীয়ত, বাঘ হওয়ার পর সিধুকে রাতে আসতে বলবি, নইলে দিনের বেলা খুব হইচই হবে।"

হাসতে হাসতে বললাম, "তুমি ভাবছ দিনের বেলা এলে লোকে চিনে ফেলবে তাই তো ?"

মাসি বললেন, "আরে না না। বাঘ হওয়ার পর সিধু তো আর মানুষ থাকছে না। ধর, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা, 'কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে !' তাই না ? মাথার উপর দিয়ে ডানা মেলে একটা ফুল যদি সত্যিই ওড়ে, মানুষ কী বলবে ? বলবে পাখিটা ফুল ছিল

এখন পাখি হয়ে গিয়েছে। না বলে পারবে ? সেই রকম। সিধু যদি বাঘ হয়, পুরোটা বাঘ হতে পারে, কমপ্লিট বাঘ, তা হলে ন'বউ যদি বলে, এটা আগে মানুষ ছিল, বাড়ির কাজের লোক ছিল, বুড়ো হয়ে গিয়েছিল, মনিব আর রাখতে চাইছিল না, সেই প্রতিবাদে সে বাঘ হয়ে এসেছে ! ন'বউ বলবে তো ? বলুক। আমার কোনও আপত্তি নেই।"

বললাম, "তা হলে সেই কথাই রইল !"

মাসি বললেন, "হ্যাঁ। ওকে রাত্রেই আসতে বলবি। এখন কথা হচ্ছে ও কি পারবে ? ফুঁস্ ঘটি আর হুঁশ্ ঘটি—কথাটা খুব গোলমেলে লাগছে !"

বলতে-বলতে মাসি হাতের কাছের জানালাটা খুলে দেন। জানালা দিয়ে দুধুলির অরণ্য চোখে পড়ে। গভীর অরণ্য নয়। কিন্তু নানান গাছপালা রয়েছে। লতাগুল্ম তত নেই। পরিচ্ছন্ন বাগানের মতো ছিমছাম বন। তবে কোথাও কোথাও এই অরণ্য নাকি নিবিড় হয়েছে দূরে কোথাও। শোনা যায়, সেসব দিকে বাঘ থাকে। মাসি কিন্তু হঠাৎ ভীতস্বরে অন্য কথা বলে ওঠেন। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। গোধূলির আলো ডালপাতার ফাঁক দিয়ে কেঁপে-কেঁপে জানালায় এসে পড়েছে।

বললেন, "নস্করপুরে ছোট একটা সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। দলে একটাই বাঘ ছিল। সেটা কী করে ছাড়া পেয়ে, রিং-মাস্টারকে খাবলে দিয়ে পালিয়ে এসে না কি দুধুলির জঙ্গলে ঢুকেছে। তাই শুনে সারা তল্লাট রীতিমত ভয়ে কাঁটা। আমি তিনদিন এই জানালাটাই খুলিনি। তোকে বলব-বলব করছি সেই কখন থেকে। ভেবে দ্যাখ, প্রথমত, এটা কত সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, সেটা যদি বাড়ি চড়াও হয়, কী করে সামলাব ! মানুষের গা খাবলানো বাঘ, ভয়ঙ্কর !"

বললাম, "তুমি তো আর এরকম বাঘ পুষতে চাইছ না, তোমার ভয় কী ?"

মাসি বললেন, "তা হলে খুলেই রাখি !"

"হ্যাঁ, তাই রাখো !"

ঠিক এই সময় দরজা খোলা পেয়ে সিধুর মতো দেখতে একটা লোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। সিধুর মতো আদল বটে, কিন্তু বয়সে বেশ জোয়ান। আমি কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চেয়ে থেকে চিনতে পারলাম। সিধুর ভাই টংকা। সার্কাসের জোকার। ভবঘুরে। এর আগে একবার আমাদের বাড়ি সিধুকে দেখতে এসেছিল। কোথায় থাকে কোনও ঠিকঠিকানা নেই। ওর বাড়ি কুমড়োজোল। নানারকম সাজপোশাক পরে লোক হাসায়। দু'-একটা খেলাও জানে। পায়রার মতো ডিগবাজি খেতে পারে। আমাদের উঠোনে সেবার খেলা দেখিয়েছিল।

বলল, "শুনলাম, দাদা তো বাঘ হতে চাইছে ! দাদার মাথাটা গেছে ! গোঁফ রেখে হালুম করলেই কি বাঘ হওয়া যায় ! তা হলে তো আমাকেই সবাই বাঘ বলত ! আমি সার্কাসের লোক। সত্যিকার বাঘটা হারিয়ে গেছে। একটা হ্যারিকেন কি টর্চ পেলে জঙ্গলটা খুঁজে দেখতাম। আর দাদা যদি বাঘ হতে পারত, তা হলে দাদাকেই খাঁচায় নিয়ে গিয়ে পুরতাম।"

মাসি বললেন, "না না, তুমি কেন নেবে ? সিধু বাঘ হতে পারলে আমিই ওকে পুষব। আমার বাঘ পোষার শখ। তুমি নিয়ে যেও না।"

টংকা মাসির কথায় হেসে ফেলে বলল, "দেখুন, মন্ত্রে সবই হয়। তবে সেটা আসল মন্ত্র হওয়া চাই। তা হলে দাদাকে সপ্তবটীর ছায়াপীঠে চটবাবার কাছে যেতে হবে। ফুঁস্ ঘটির জল গায়ে পড়লে বাঘ হবে ঠিক, কিন্তু দাদার মৃত্যুর আগে ঠিক সময়মতো গিয়ে হুঁশ্ ঘটির জল গায়ে ছিটিয়ে মানুষ করে আনবেন। মানুষের তো বাঘ হয়ে

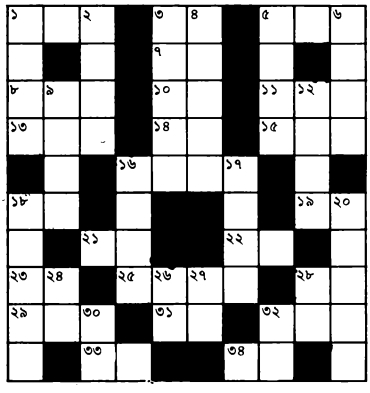

সংকেত : পাশাপাশি : (১) পাখির পোশাক। (৩) পাড়াগাঁ এমনও হয়। (৫) পাখি। (৭) সমস্ত। (৮) ছানা, তবে দুগ্ধজাত নয়। (১০) নশ্বর। (১১) ভাগ, অংশ। (১৩) বিখ্যাত গায়ক ফকির। (১৪) তৎকালে। (১৫) হিন্দি সূর্য। (১৬) কাকলি। (১৮) কার না শুনতে ভাল লাগে ? (১৯) 'আমার মাথা — করে দাও হে প্রভু...'। (২১) শরীর। (২২) ফলিত জ্যোতিষে গ্রহ, গণিত জ্যোতিষে নয়। (২৩) অধীন, আয়ত্ত। (২৫) এক-ঘোড়ার গাড়িবিশেষ। (২৮) চর্বি, মেদ। (২৯) যা খেলে অনেক শিশু কেঁদে ফেলে। (৩১) রবীন্দ্রনাথের এক বিখ্যাত কবিতার নামের প্রথমেই এই মসলাটি আছে। (৩২) স্বচ্ছ নয়। (৩৩) দশরথকন্যা। (৩৪) কোন্ প্রাচীন কবি বাংলা মাস ?

উপর-নীচ : (১) চটি। (২) ব্যথা বা অত্যন্ত ঠাণ্ডাভাব প্রকাশ করতে এই শব্দ। (৩) বন্ধুর। (৪) খুব জুলুমবাজ। (৫) একই শব্দে সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র। (৬) ফুলবিশেষ। (৯) শক্তিশালী। (১২) অত্যন্ত ধারালো। (১৬) অঞ্জলি। (১৭) হলধর। (১৮) অর্জুন। (২০) অন্ধকারাবৃত। (২৪) শান্তি, মনের স্থিরতা। (২৬) পৃথিবী। (২৭) খুব রেগে গেলে এমন হয়। (২৮) কোন্ শহর অরণ্যও বটে ? (৩০) 'কে তারে সহসা/ মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের —'। (৩২) পাপ, দুষ্কৃতি।

গত সংখ্যার সমাধান

অ	কা	ল	বো	ধ	ন	■	জ	ট	লা
ভি	র	মি	■	ন্ব	■	■	ল	■	ঠা
শা	■	■	ধ্বা	ন্ত	■	চাঁ	দ	মা	লা
প	র	খ	■	রি	য়া	দ	■	কু	ঠি
■	■	ই	হ	■	■	মা	■	ন্দ	■
■	বে	■	ট্ট	■	■	রি	পু	■	■
রা	হা	■	গো	লা	প	■	মা	ন	স
গা	লা	গা	ল	■	রি	ক্ত	■	■	রো
লা	■	য়	■	■	ত্রা	■	র	বা	ব
প	ল	ক	■	লো	হি	ত	সা	গ	র

মরা উচিত না। মানুষের জীবনটা খুব দুর্লভ। দাদা যেন মানুষ হয়েই মরতে পারে, সেটা দেখবেন।"

মাসি বললেন,"তা দেখব। সময়মতো না গেলে কী হবে?"

টংকা বলল, "হুঁশ্ ঘটির জল যদি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তা হলে মন্ত্রের জল হয়ে গেল মেঘ। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি নামিয়ে ঘটিতে ধরতে হবে। সে মন্ত্র চটবাবা জানে না।"

"কে জানে সেই মন্ত্র?" জানতে চাইলাম।

"খড়কেবাবা জানে। সে থাকে পাহাড়ে। সেখানে আপনারা যেতে পারবেন না। বাষ্প হওয়ার আগেই দাদাকে মানুষ করে আনবেন। বাঘের তো আর মুখাগ্নি করা যায় না। মানুষ কি আর শখ করে বাঘ হতে চায়! কুমড়োজোলে গেলে দেখবেন, ওখানকার সব নরনারী চট পরে আছে। পায়ে পরে কাঠের খড়ম। এত গরিব, জামা-কাপড় কিনতে পারে না। জুতো পায় না। যাক গে। একখানা হ্যারিকেন না হয় একটা টর্চ দিন, জঙ্গলটা হাতড়ে দেখি। এ তো মন্ত্রের বাঘ নয়। সত্যিকার নেকড়ে।"

মাসির কাছে টর্চ নিয়ে টংকা চলে গেল। নেকড়ে শুনে মাসির মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, "টংকার একটা কথা আমার ভাল লাগল না, সত্যিকার নেকড়ে আর মন্ত্রের বাঘ—টংকা কী বলতে চাইছে?"

এক ঘণ্টা পর জঙ্গলটা আঁতিপাতি করে খুঁজে ফিরে এসে টংকা বলল, "রাত হয়েছে, সাবধানে থাকবেন! বলা যায় না কিছু, রক্তের স্বাদ পেয়েছে নেকড়েটা। কখন কী করে বসে বলার জো নেই। অনেক করে খুঁজলাম, একবার গর্জালি না পর্যন্ত। বাঘটা এত জোচ্চোর!"

টর্চ ফেরত দিয়ে চলে গেল টংকা। বিচিত্র ওর কথাবার্তা। চালচলনে কেমন একটা রহস্যময়তা, পোশাক-আশাক দেখলেই হাসি পায়। মাছি-গোঁফ চকচক করছে। হাতে কপালে গালে উল্কি। বিচিত্র এই লোকটিই যে সিধুর ভাই, ভেবে অবাক লাগে। জঙ্গলে বাঘ খোঁজার জন্য বিনুমাসির কাছে হ্যারিকেন চাইতে এসেছিল!

জানলা দিয়ে ফের মাসি জোনাকি-জ্বলা পাতায়-পাতায় পুঞ্জ-পুঞ্জ আলোয় ছয়লাপ দুধুলির দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "এই জঙ্গলের পথ ধরেই কুমড়োজোল যেতে হয়। শুনেছি ছায়াপীঠ সাঙ্ঘাতিক জায়গা। খড়কেবাবার পাহাড়ের নাম চিতামুণ্ডি। বাবা মানুষের মাথার খুলির স্তূপের উপর বসে ধ্যান করে। শুধু মানুষের খুলিই না, বাঘের মাথাও থাকে। খুলির ভিতর দিয়ে হু-হু করে হাওয়া ছোটে আর মন খারাপ করা ভয়ঙ্কর নিশ্বাস শিস দেয়। খুলিগুলো না কি আরবি অক্ষরে সুর করে কথা বলতে পারে, বাঘের খুলি সংস্কৃত আউড়ায়।"

মাসির কথা শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। খড়কেবাবা যে তান্ত্রিক তা বুঝতে পারছিলাম, চটবাবা তো তারই চেলা। বললাম, "তুমি যে অনেক কিছুই জানো দেখছি! কিন্তু এইসব আজগুবি জিনিস বিশ্বাস করো?"

মাসি বললেন, "বেঘোরে পড়লে মানুষ কত কিছুই বিশ্বাস করে।"

বলেই বিনুমাসি দুধুলির অরণ্যের দিকে চেয়ে আপন মনে আউড়াতে লাগলেন।

"কতদিন ভাবে ফুল,/ উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব,/ ভারী মজা হবে।
তাই ফুল একদিন/ মেলি দিল ডানা।
প্রজাপতি হল, তারে/ কে করিবে মানা?"

বললাম, "ফুলটা তো পাখি হতে পারেনি। প্রজাপতি হয়েছিল।"

মাসি বললেন, "সেটাই বা কম কিসে! সিধু যদি রয়েল বেঙ্গল না হয়, নিদেন একটা চিতেই হোক।"

ঠিক এই সময় জঙ্গল থেকে বাঘের একটা ভয়ানক গর্জন ভেসে এল। মাসি ভয়ে সঙ্গে-সঙ্গে জানালার কপাট ঠেলে বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "দেখেছিস! হয় কি না! এ ঠিক কেঁদো বাঘের গলা। নেকড়ে বলল বটে টংকা, ও ঠিক চেনে না।"

বললাম, "অমনি একটা ভিটকে ডাক শুনেই তোমার বিশ্বাস হয়ে গেল! সিধু বাঘ হবে, শুধু আওয়াজ দিলেই সব হয়ে গেল বুঝি! বাঘটা কিন্তু সত্যিই বাঘ। সিধু নয়।"

মাসির গলা কিঞ্চিৎ কেঁপে গেল, "সত্যিই যদি চলে আসে।"

বললাম, "মনে হচ্ছে, টংকা আবার খুঁজতে আসবে। একটা বাঘের দাম কত জানো?"

"যেই আসুক, আমি আর দরজা খুলছি নে।" বলেই মাসি দরজা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ মাসির গলায় বোবা বিকৃত অদ্ভুত চাপা স্বর চকিতে ভেসে ওঠে। মাসি দ্রুত ঘরের ভিতর ছুটে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কেমন মিইয়ে গিয়ে বলেন, "দরজার ওপাশে সিঁড়ির মুখে কী-একটা বসে আছে শ্রীদীপ! নড়ছে না।"

টংকা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। মাসি ভয়ে জানালা বন্ধ করেছেন, এদিকে দরজা যে হাট-খোলা খেয়ালই করেননি। মাসি সত্যিই কী দেখেছেন, বোঝা যাচ্ছে না। চোখের ভুল তো মানুষেরই হয়। বাঘ পোষার নেশা যাদের থাকে তাদের মনে একটা বাঘ বাস করে। সেটা ছায়ার মতো বাইরে বেরিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। মাসি হয়তো সেই ছায়াটাই দেখে এলেন সিঁড়ির মুখে। এমনিতেই চারিদিকে বাঘ-বাঘ গন্ধ। মনের ভিতরটা পর্যন্ত হালুম-হালুম করছে। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে অবধি বাঘের ঘ্রাণ। এই অবস্থায় বাঘের ছায়া দেখে ভয় পাওয়া আশ্চর্যের নয়।

পুব আকাশের গোড়ায় কিছুটা রাত্রি ঘন হলে মেটে সিঁদুরি রঙের চাঁদ উঠেছে। তারই ঘোর-লাগা আলো পড়েছে দরজায় আর সিঁড়ির মুখে। মাসি বললেন, "দরজা তুই ভেজিয়ে দিয়ে আয়। ঢুকে পড়তে পারে।"

খানিকটা দম ধরে সাহস সংগ্রহ করে নিঃশব্দে পা ফেলে ধীরে-ধীরে দু'-চার পা দরজার দিকে এগিয়ে যাই। খানিকটা ঝুঁকে গলুই তুলে দেখবার চেষ্টা করি, ছায়াটা কোথায়। ঘোর-লাগা চাঁদের আলোয় সিঁড়ির মুখে চোখ পড়তেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। বাঘেরই মতো দেখতে একটা জানোয়ার বসে আছে চুপচাপ। মাসিও কাঁপতে কাঁপতে আমার পিছু-পিছু এসেছিলেন, আমার কাঁধের উপর গলা তুলে দেখছিলেন বাঘটাকে। হঠাৎই ভয়ে দরজার পাল্লায় ধাক্কা লেগে যায়।

শব্দ হতেই বাঘ গম্ভীরভাবে আস্তে করে ঘাড় ঘোরায় আমাদের দিকে। ঘোর-লাগা আলো। স্পষ্ট নয় দৃশ্যটা। এটা যে ঠিক দেখছি, মনেই হয় না। দেখছি না, তাই বা বলি কী করে? মনের ছায়া না কি সত্যিকার সার্কাসের বাঘ বুঝতে পারি না। মনে হল, চাঁদের আলোটা যদি আর-একটু স্পষ্ট হত।

সিঁদুর রাঙানো, শুঁড়ো সিঁদুরের ছোপ-অলা গোল প্রকাণ্ড ফুটবলের মতো চাঁদ, আকাশের একেবারে তলায় যেন গড়াচ্ছে, তায় আকাশ ধরতে চাওয়া অস্পষ্ট আলো এসে বাঘের চামড়ায় লেগেছে। মনে হচ্ছে বাঘটা ভূতের মতো দেখতে। ভূতের মতোই মুখ হাঁড়ি-করা বাঘ, ব্যাটা ভারী সেয়ানা। একফোঁটা শব্দ করছে না পর্যন্ত। একে টংকা জঙ্গল হাতড়ে পাবে কী করে?

বাঘটা ফের অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নেয়। এখন মনে হচ্ছে গর্জানো বাঘকে যত ভয়, তারচেয়ে অনেক বেশি ভয় চুপ করে থাকা গম্ভীর বাঘকে। বিভীষিকার মতো ঠাঁইবসা বাঘটা মানুষের রক্ত খেয়েছে ভাবলে পায়ের তলা শিরশির করে ওঠে। চোখের সামনে

সেই বাঘটাকে দেখছি, যদি সে তেড়ে আসে প্রাণে বাঁচব না ভেবে ঠকঠক করে কাঁপছি, এত ভয় যে দরজার পাল্লা দুটো ভাল করে ঠেসে ভেজিয়ে দিতে অবধি পারছি না।

মাসি পিছনে থেকে চুপিচুপি পাল্লার দিকে হাত বাড়িয়ে ঠেলতে গিয়ে সাহস পেলেন না। হাত গুটিয়ে নিলেন বাঘটা আবার ঘাড় ঘুরিয়ে আমাদের দুজনকে দেখতে পেয়ে কেমন চমকে উঠে হালুম করে ছোট এক লাফ দিয়ে ছাদের কার্নিসের দিকে চলে গেল। তারপর ছাদের এক কোণে বসল। নেড়া ছাদ। বসে-বসে বাঘটা পুবপারের গোল লাল চাঁদটা দেখতে থাকল। আবার সে ছোট করে হালুম করে সিঁড়ির দিকে এল। বাঘ যে এমন করে চাঁদ দ্যাখে, আমাদের জানা ছিল না।

সিঁড়ি থেকে সহসা এক লাফে দরজার কাছে চলে এসে বাঘটা অবিশ্বাস্যভাবে কথা বলল, "পুষবা নাকি গো মাইয়া !" বলে একদণ্ড মাসির মুখের দিকে চেয়ে আছে মনে হল। চূড়ান্ত ভয়ে আমরা ঘরের ভিতর সরে চলে এসেছি। বাঘের এরকম লাফালাফিতে আমরা উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেছি। কিন্তু বাঘটা তার কথা পেশ করেই এবার একটা মস্ত লাফ দিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

চাঁদের আলো যখন সাদা দুধের মতো হয়েছে, সব ঘোর কেটে গিয়েছে, দুধুলির জঙ্গল জ্যোৎস্নায় টসটস করছে, ভয়ে-ভয়ে দরজার পাল্লা খুলে দিলাম। জ্যোৎস্নায় স্নান করা সিঁড়ির উপর কাউকে দেখা গেল না। সিঁড়ির উপর কোনও ছাদ নেই। চাঁদের আলো স্পষ্ট হয়ে পড়েছে। কোনও কিছুর চিহ্নই দেখা গেল না। অবাক লাগল, এতক্ষণ তা হলে কী ঘটল ?

মাসি বললেন, "তাই তো রে শ্রীদীপ ! সার্কাসের বাঘটা তবে কোথায় গেল ! বাঙালের মুখের কথায় সে ডায়ালগ করেছে, স্পষ্ট শুনেছি। আচ্ছা, কেঁদো বাঘটা ঠিক এসেছিল তো ? নাকি চোখের ভুল ? আমার মাথা ঘুরছে রে।"

আমি এত বিহ্বল হয়ে গেছি যে, কথাই বার হতে চাইছে না। মাসির উপর রাগও হচ্ছিল। বললাম, "মাথা তো ঘুরবেই তোমার। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে নিশ্চয়ই ঘুরবে। সিধু বাঘ হচ্ছে শুনে তোমার আর সবুর হল না। সারাক্ষণ কেবল বাঘ-বাঘ করলে। কেঁদোটা কেন ডায়ালগ করবে না। হলই বা বাঘ, তারও তো একটা মস্তিষ্ক আছে। তাঁবু থেকে পালিয়ে ওর বুদ্ধি পরিষ্কার ঝরঝরে হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, এমনও হতে পারে, কোনও বাঘই হয়তো আসেনি।"

"পুষবা নাকি গো মাইয়া ! কথাটা কি ফালতু।" মাসি রাগত গলায় বলেন। একটু চুপ করে থেকে আবার বলেন, "এই ডায়ালগ আমি স্পষ্ট শুনেছি। তুই শুনিসনি ?"

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমার মাথায় চকিতে একটা ভাবনা এসে গেল। বললাম, "এ নির্ঘাত সিধু। সিধু আমাদের মেজদার অত্যাচার আর সইতে পারেনি। বাঘ হয়ে গিয়েছে। ও মাঝে-মাঝে বাঙাল ভাষায় কথা বলে। ভারী মিষ্টি লাগে শুনতে। ফুঁস্ ঘটির জল ওর গায়ে পড়েছে। একবার ভোরে বাড়ি গিয়ে দেখে আসা দরকার। এখানে আমার তিনদিন হয়ে গেল মাসি। আমি ভোরেই রওনা দিচ্ছি। তোমাকে খবর দিয়ে যাব। চিন্তা কোরো না।"

মাসি বললেন, "সিধুই যদি হবে, তবে চলে গেল কেন ! কোথায় গিয়ে থাকবে এখন। চাঁদ দেখে সারাটা রাত কাটাতে পারবে। কুমড়োজোল থেকে এল, কতটা পথ এসেছে ভেবে দ্যাখ। প্রথমত, ওর খিদে পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, বনের পশু তো ও নয় যে চাঁদ দেখে রাত কাটিয়ে দেবে। তৃতীয়ত, বুড়ো মানুষ। জঙ্গলে দারুণ মশা।"

বললাম, "তোমার কিন্তু মাসি খুব বাড়াবাড়ি।"

"কেন ?"

"তুমি কি বলছ আমি জঙ্গলে গিয়ে বাঘটাকে একখানা মশারি খাটিয়ে দিয়ে আসি।"

ক্ষুদে গোয়েন্দা অর্জুন, দুঁদে গুরু অমল সোম

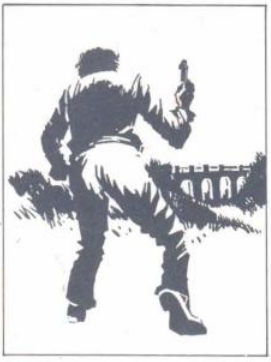

সমরেশ মজুমদারের

জমজমাটি রহস্যোপন্যাস

দেড়দিন

দাম ১৪·০০

একে ক্ষুদে গোয়েন্দা অর্জুন এবং দুঁদে গুরু অমল সোমের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের কাহিনী, তায় পটভূমিকা উত্তরবাংলা— বলতে গেলে মণিকাঞ্চণ যোগ। উত্তরবঙ্গের মেঘ পাহাড়, অরণ্য ও মানুষজন একেবারে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে সমরেশ মজুমদারের কলমে। এদিকে অর্জুনও এখন আর ছোট্টটি নেই। তার একলা গোয়েন্দাগিরির কীর্তিকাহিনী ইতিমধ্যে ভারত ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও সুবিস্তৃত। সেই অর্জুনকেই এবার স্বয়ং অমল সোম দিয়েছেন বিচিত্র এক কাজের ভার। দিল্লি থেকে কয়েকজন কিশোরী ছাত্রী বেড়াতে আসছে উত্তরবঙ্গে, অর্জুন হবে তাদের 'গাইড' তথা নিরাপত্তারক্ষক। কাজটা শুনতেই হালকা, আসলে কিন্তু একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়। এয়ারপোর্টে পা রাখতে না রাখতেই সেটা টের পেয়ে গেল অর্জুন। অ্যাডভেঞ্চারপ্রবণ বয়সে পা-রাখা এই মেয়েদের নিয়ে ক্রমশ অর্জুন জড়িয়ে পড়ল গভীরতর রহস্যের জালে। কীভাবে শেষ পর্যন্ত সেই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এল তারা, তাই নিয়েই এক দুর্দান্ত জমজমাটি রহস্যোপন্যাস 'দেড়দিন'। প্রচ্ছদ : অনুপ রায়।

অর্জুন ও অমল সোমের রহস্যভেদের কাহিনী নিয়ে সমরেশ মজুমদারের অন্যান্য কিশোর-উপন্যাস

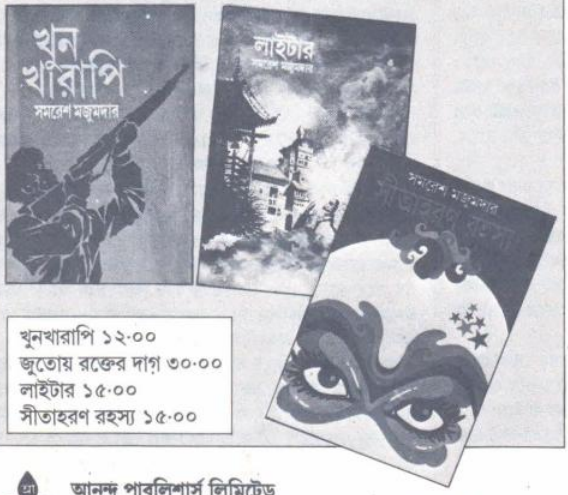

খুনখারাপি ১২·০০
জুতোয় রক্তের দাগ ৩০·০০
লাইটার ১৫·০০
সীতাহরণ রহস্য ১৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, ফোন : ৩১-৪৩৫২

আরও 'আনন্দ'-উপহার

হাসির গল্প

সত্যজিৎ রায়ের
মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প ১০·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের
তপনচরিত ১০·০০
ঘন্টাদার কাবলুকাকা ৮·০০
বিমল করের
ওয়াণ্ডারমামা ১০·০০
লীলা মজুমদারের
কাগ নয় ১০·০০
চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্তের
মেজদার নানারকম ৮·০০

খেলা নিয়ে লেখা উপন্যাস

দিব্যেন্দু পালিতের
ইয়াসিন ইয়াসিন ১৫·০০
মতি নন্দীর
ননীদা নট আউট ৬·০০

কলাবতী ১২·০০
এম্পিয়ারিং (গল্প গ্রন্থ) ১০·০০
স্ট্রাইকার ১২·০০
স্টপার ১২·০০
কোনি ৮·০০
অপরাজিত আনন্দ ১২·০০

"বাঘটা যদি সিধুই হয়, তা হলে তাই করতে হবে। তোর ঠাকুদ্দা কখনও ওর শোবার জন্য একখানা ছেঁড়া ফোকর-অলা সুতির মশারিও দেয়নি। বেচারি গোয়াল ঘরের নাদার পাশে একখানা ছোট চালায় শুয়ে সারারাত পা আছড়াত গোরুর মতো আর মশা তাড়াত। কাঁথায় মুখ ঢেকে কি শোয়া যায় ?"

বললাম, "লজ্জা দিও না মাসি। সেসব হয়েছে বইকী। তবে আমরা ওকে যথেষ্ট দেখেছি।"

মাসি বললেন, "ও তিন-তিনবার গাছ থেকে পড়ে গিয়েছে। বুকখানা ভাঙাচোরা। শুধু গলায় মাদুলি ঝুলিয়ে এই এতটা কাল বেঁচে রইল। ওর ধারণা ওই তাবিজ-কবচের জোরে ও বেঁচে আছে। ওর তো কখনও ভালমতো চিকিৎসাও হয়নি। তোরা যথেষ্ট দেখেছিস বলছিস। তাই বা কী করে বিশ্বাস করব ? তোদের মেজদা ওকে প্রতিদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলে। যাচ্ছেতাই করে বকে। এটা-সেটা ভেঙে ফ্যালে বলে মারতে তেড়ে যায়। ও কি আর ইচ্ছে করে ভাঙে। ইচ্ছে করেই কি সবকিছু ভুলে যায়। ছাতা হারায়। বাজারে গিয়ে জিনিস ভুলে আসে। সবই সত্যি বটে। কিন্তু ভেবে দেখেছিস কখনও সিধুও একটা মানুষ। বুড়ো হলে মানুষ বাহাত্তুরে হয়। মাথার জোর কমে। দেহের বল কমে যায়। তখন ওর বিশ্রামের সময়। তা বলে কাজের লোক তো আর সেই সুযোগ পায় না। বুড়ো হলেও তাকে খাটাতে হয়। যেসব কাজের জন্য ওকে রাখা, তা যখন সে পারে না, তখন কেই-বা তাকে রাখতে চাইবে। তা হলে সিধু এখন কোথায় যাবে ?"

বললাম, "এই জন্যই বলছি, ওটা সিধুই নিশ্চয়। কালই আমি চলে যাচ্ছি মাসি।"

মাসি বললেন, "ও ছিল বলবান আর সাহসী মানুষ। খাটুনির গা-গতর। তেজের চোটে শরীর চমকাত দেখেছি। বুড়ো হওয়ার পর সেই জোর চলে গিয়েছে বলে ওর কি কম দুঃখ। বাঘ মানুষ সাধে হতে চায় না রে। বুড়ো হলে সবারই হালুম করতে ইচ্ছে হয়।"

কাঠের গোল বড় টেবিলে রাখা চিমনি ল্যাম্পটা শিখাসুদ্ধু ভারী চমকে-চমকে উঠছিল। ভয় হচ্ছিল, এই বুঝি নিভে যাবে। এখন আলো না থাকলে ভয় করবে। আবার আলো লাফাচ্ছে বলে দেওয়ালে আমাদের ছায়া লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে। চিকির ছায়াটা পড়ে নেকড়ের মতো দেখাচ্ছে। ছায়া জিনিসটাই এই ধারা—যা নয় তাই হতে পারে। আসলে মনের ভিতর যে বাঘের কল্পনা করা ছায়াটা রয়েছে তা চিকির চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। আলো নিভলে কী হবে কে জানে !

বললাম, "সিঁড়ির উপর বসে হালুম করার পর সিধু ভারী লজ্জা পেয়েছে। তাই 'পুষবা নাকি গো মাইয়া' বলার পর পালিয়ে গেল। যদি সিধুই হয়, নিশ্চয় আবার আসবে। তবে আমরা ভুলও তো শুনতে পারি !"

ঠিক তখনই দপ্ করে আলোটা নিভে গেল। একটু বাদেই দরজায় নখ দিয়ে আঁচড়ানোর শব্দ। গলার গরগর করা গোঁঙানি। ঘর অন্ধকার। বাইরে তীব্র জ্যোৎস্না। বাঘটা কোনওই কথা বলছে না। এ যদি সিধুই হয়, তা হলে নিশ্চয় বাঙাল গলায় ডাকবে। যেভাবে সে কথা বলছে, সেই রকমই বলবে আবার। বলবে, "আইলাম গো মাইয়া। বুনে থাইকা গতর ডুমা-ডুমা কইরা খাইছে। জ্বালা করে। মাকড়ে দংশন করে। মশা-ডাঁশা হকল জীব বুক চিতাইয়া ঘোরাফেরা করে। পাতার তলে যাওনের শব্দ হয়। পাতার গা বাইয়া চাঁদনি-রোশনাই ঝরে। বাঘের খুলির ভিতরে হাওয়া চলে হু-হু কইরা। বাবা দক্ষিণরায় বাঘের দেব্তা ! রাত জাইগা কান্দেন। বুড়া বাঘের নখে ধার নাই। শিকার যাওনের শক্তি নাই। দুই পা নড়ন-চড়নের বল নাই। ভুখা ফাঁকা থাইকা দিনে ব্লাইতে মরণের চিন্তা। বাঘ বুড়া হইলে না খাইয়া মরে। উপোস কইরা মরণের লাইগা এই দ্যাশে সুন্দর বনে বাঘ জন্মায়। গতর যাইলে বাঘের আর কিছুই থাকে না। মুখের কাছে খাইদ্য জুগাইবে এমন কপাল বাঘ করে নাই। বুনে থাইকা কী কইর্‌ব ? তুমার কাছে আইলাম মাইয়া। আমারে রাইখা দেও।"

আবার গরগর করে উঠল বাঘটা। কিন্তু কোনও কথাই উচ্চারণ করল না। এই রাতে জ্যোৎস্নার ভিতর কোথা থেকে একখানা মেঘ এসে বৃষ্টি ঝরাতে লাগল। জ্যোৎস্নার সমুদ্রে মেঘের ছায়া পড়েছে, আবার সেই ছায়া সরে-সরে যাচ্ছে, ঝিরঝির করে মুক্তো ঝরছে, বাতাসে ঠাণ্ডার জোর ধাক্কা লাগছে ক্রমশ। গায়ে চাদর জড়ানো ছাড়া উপায় নেই। দরজায় বৃষ্টির ছাঁট লাগছে, বাঘের গলা কাঁপছে শীতে। গরগর করল সারারাত। কিন্তু আমরা দরজা খুলে দিতে পারলাম না। একটা বুড়ো বাঘ বাইরে দুয়ার আঁচড়াল তামাম রাত্রি।

ভোরে আমি বাড়ি ফিরে এলাম।

বাড়িতে পা দিয়েই আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। সিধু শুন বাড়িতে নেই। বাড়ি কেমন চুপচাপ। মা তুলসীতলা নিকোচ্ছেন, মুখ কেমন থমথমে। মনে হল, মায়ের চোখ দুটিও ভেজা-ভেজা। চাপা অশ্রু চিকচিক করছে চোখের কোণে। মা একবার আমার দিকে চোখ তুলে দেখলেন, কিন্তু কথা বললেন না। বাবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, বাবা ম্যাগাজিন পড়ছেন, আমার দিকে ঘাড় তুলে চেয়ে আবার পড়ায় মন দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে জানতে চাইলেন, "তোর মাসি কেমন আছে ?"

বাবার কথার সিধে জবাব না দিয়ে জানতে চাইলাম, "সিধুকাকা কোথায় ?"

বাবা এবার সোজা হয়ে নড়েচড়ে বসে বললেন, "ও নেই। তোর মেজদা ওকে মেরেছে। অবশ্য ওর বজ্জাতি সহ্য করা মুশকিল। মারা ঠিক নয়। গলাধাক্কা দিয়ে বলেছে, 'যাও সত্যিকার বাঘ হয়ে এসো দেখি কেমন মুরোদ !'"

বললাম, "তোমরা ওকে তাড়িয়ে দিলে বাবা !"

এমন সময় পাশের ঘর থেকে মেজদা এসে এ-ঘরে ঢুকে বলল, "কেন দেব না ? রাতদিন সিঁড়ির উপর বসে পায়ের উপর পা তুলে হালুম-হালুম করা। সেদিন বাবা নস্যির ডিবেটা এগিয়ে ধরে বললেন, যা তো সিধু, দোকান থেকে ডিবেটা ভরে নিয়ে আয়। তা সে কথা কানেই গেল না। কাছে যেতেই এমন হালুম করে ফাঁকা আওয়াজ দিলে যে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। গলায় ধাক্কা দিয়ে বললাম, যাও,চলে যাও। অন্যায় তো করিনি। বাঘ হওয়ার জো থাকলে কেউ এভাবে পড়ে থাকে না।"

মা দরজা ধরে কখন এসে দাঁড়িয়েছেন। কান্না ভেজা গলায় বললেন, "সে কথা যদি জানতে, তা হলে ওকে ওভাবে ধাক্কা দিতে মায়া হল না তোর ! বুড়ো মানুষ, ধাক্কা খেয়ে সামলাতে না পেরে চৌকাঠের কাছে হুড়মুড় করে ভাঙাচোরা বুক নিয়ে পড়ে গেল। ওই মানুষটা তোকে কাঁধে করে সকালবেলা চাঁদনির বিলে সাদা বক দেখাতে নিয়ে যায়নি ! তখন তুই এতটুকু পোনা। সব ভুলে গেছিস্ বাবা ! হায় হায় !"

"আহ্ !" মেজদা বিরক্তির সুরে বলে ওঠে, "এত হায়-হায় করার কী আছে ! সিধুকাকাকে দিয়ে সংসারের কোন্ কাজটা সুচারু করে হত বলো তো ? তা ছাড়া আমি ওকে প্র্যাকটিক্যালি গলাধাক্কাই দিইনি। হাত ধরে হেঁচকা একটা টান দিতেই চৌকাঠের কাছে মায়ের পায়ের উপর পড়ে গেল।"

মা বললেন, "অত বড় জোয়ান মানুষটা, এককালে গতরে কী জোরই না ছিল ! দু'মনি সরষের পেল্লায় বস্তা কাঁধে ফেলে সামনে ঝুঁকে টেনে নিয়ে যেত, একেবারে দানো যাচ্ছে পায়ে-পায়ে, চেয়ে দেখে বুকে খিল ধরে যেত ভয়ে আর বিস্ময়ে ! সেই কিনা বুড়ো হওয়ার পর দেখতে হয়ে গেল এতটুকু টুনটুনি। সেই পাখির সমান মানুষটা পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল ! পড়ে গিয়ে হঠাৎ ককিয়ে উঠল। বুড়ো বয়েসে হঠাৎ সাদা গোঁফ রাখলে মানুষকে বোকা-বোকা লাগে। মিয়োনো গলায় বললে, 'দিদি গো ! তাড়িয়ে দিও না। বাঘ হওয়ার সাধ্য কি গরিবের থাকে, তোমায় মিছে বলেছি দিদিসোনা !' তবু মেজোটা ওকে থাকতে দিলে না। যাওয়ার সময় সিধু গুন মুখ কাঁচুমাচু করে বলে গেল, 'কুমড়োজোলেই যাচ্ছি, এ-জন্মে আর সিধুর মুখ দেখবে না।'"

বলতে-বলতে মায়ের কান্না পেয়ে গেল। মুখে আঁচল চাপা দিয়েও মা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে মা ঈষৎ ফুঁপিয়ে উঠে ধরা গলায় বললেন, "কতদিন রাগ করে সিধু চলে গেছে বাড়ি থেকে। হয়তো সেদিন চায়ের কাপ কি চিনেমাটির একখানা বাসনই ভেঙে ফেলল, তাইতে হয়ে গেল রাগ ! বান্দার সে কী রাগের বহর ! কার ওপর রাগ করেছে নিজেও জানে না। সারাদিন গজগজ করল আপন মনে। কার সঙ্গে কথা হচ্ছে কেউ বুঝবে না। যেই বললে কিসের অত কথা সিধু ! অমনি তোমাকে নিয়ে পড়ল। আর যায় কোথা ! কাজিয়া বাধাবে তোমার সঙ্গে। প্রমাণ করার চেষ্টা করবে তুমিই বাসন ভেঙেছ। যদি তুমি স্বীকার করো যে, তুমিই ভেঙেছ, তোমার জন্যই কাপটা গুঁড়িয়ে গেছে, তাতেও ওর রাগ। যদি একবার কথার ফাঁকে তুমি হেসে ফেললে তো হয়ে গেল। চিড়বিড় করে লাফাতে শুরু করে দেবে সিধু। তারপর কথার ছুতো তৈয়ের করে দু'দিন কোথায় পালিয়ে গিয়ে বসে থাকবে। আবার ফিরে আসবে দু'দিন বাদে। কিন্তু ও যদি এবার সত্যিই বাঘ হয়ে যায়, তা হলে কী হবে শ্রীদীপ ?"

বললাম, "বাঘ তো হয়েই গেছে মা ! সিধু আর মানুষ নেই !"

"সে কী রে !" সমস্বরে মা-বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন।

বললাম, "ফিকে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নার ভিতর বিনুমাসির সিঁড়ির উপর গতরাতে বাঘরূপী সিধুকে দেখেছি। তবে সে এখনও বাড়ির ভিতর এনট্রান্স পায়নি। দুয়ার আঁচড়াচ্ছে !"

মেজদা বলল, "ইট ইজ ডাউটফুল।"

বাবা সোৎসাহে বললেন, "না। ইট ইজ বিউটিফুল। সিধু বাঘ হয়েছে এ কি কম কথা !"

মা বাবা-দাদার কাণ্ড দেখে সভয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে দিলেন, "ওরে কী হবে রে ! সিধু যে অভিমান করে বলে গেল, এ-জন্মে যদি মানুষের বাচ্চা হই, তা হলে তুমি আমার বাঘের মুখ দেখবে। সেই কথাই যে সত্যি হল রে ! তোর মাসির বাড়ি আমায় নিয়ে চ' শ্রীদীপ। আমি একবার সিধুকে দেখব বাবা !"

মা অত্যন্ত কাতর গলায় বলে উঠলেন। মায়ের কাতরতা দেখে মেজদা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, "দ্যাখো মা। এ-হল স্রেফ ধাপ্পা। বলছি না যে শ্রীদীপ তোমায় মিছে কথা বলছে। কী বলছে না বলছে, কী দেখল না দেখল, সেটা যাচাই করার ব্যাপার। বাঘটাকে মাসি এখনও বাড়িতেই ঢুকতে দেয়নি। তা ছাড়া শ্রীদীপ মাত্র তিনদিন মাসির বাড়ি ছিল। যেদিন ও বাড়ি থেকে যায়, ওর যাওয়ার পর-পরই ঝগড়া করে সিধুকাকা বেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে সে কুমড়োজোল গিয়ে বাঘ হয়ে ফিরে এল এ আমি বিশ্বাস করি না। সবচেয়ে বড় কথা, ফুঁস ঘটি হুঁশ ঘটি এসব হল বুজরুকি। চটবাবা খড়কেবাবা এসব হল..."

বললাম, "তা হলে এটা সার্কাসেরই বাঘ।"

"সার্কাসের বাঘ !" বাবা চমকে উঠলেন।

বললাম, "হ্যাঁ, একটা নেকড়ে সার্কাসের তাঁবু থেকে পালিয়ে দুধুলির জঙ্গলে এসে আছে। সেটাই তবে রাত্রে এসে দরজা আঁচড়াচ্ছিল। যাক বাবা, বেঁচে গেছি খুব। বাঘটা মানুষের রক্ত খেয়েছে, রিং-মাস্টারকে খুবলেছে। কিন্তু..."

হঠাৎ কানের কাছে স্পষ্ট সিধুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, "পুষবা নাকি গো মাইয়া।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা মেজদাকে পেশ করলাম। বললাম, "আমি স্পষ্ট শুনেছি মেজদা ! সার্কাসের বাঘ কখনওই কথা বলতে পারে না। তুমি কখনও শুনেছ ?"

মেজদা ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেছে দেখে মা ফের আর্তনাদ করে উঠলেন। বললেন, "এ নির্ঘাত সিধু। সাধুজনকে অবিশ্বাস করতে নেই রে ! হলই বা নাম চটবাবা। তা বলে তার দাম নেই বলছ ? রাক্ষসরাজা রাবণ যদি পুষ্পকরথে চড়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে, সামান্য হনুমান যদি পাহাড় কাঁধে করে আকাশে ভেসে যেতে পারে, মেঘের আড়ালে থেকে একজন বীরের পক্ষে যদি যুদ্ধ চালানো সম্ভব হয়, তা হলে সিধু কেন বাঘ হতে পারবে না ?"

মা আঘাত পাবেন ভেবে মেজদা আর তর্ক করল না। নইলে সে বলতে পারত, এ সব হল কল্পনা। তা হলে বাড়িতে মায়েপোয়ে এমনই তর্ক বাধত যে, বাবা বলতেন, 'এ তবে রামায়ণ নয়, কুরুক্ষেত্র।' শেষে মা কাঁদতেন। তবে মাকে এখন রোখা মুশকিল হল, তিনি বাঘ দেখতে চাইছেন।

মেজদা বলল, "আমরা চটবাবার কাছেই তবে যাচ্ছি। হুঁশ ঘাটির জল তো রয়েছেই, সিধুকাকাকে মানুষ করে ফিরিয়ে আনা যাবে। যদি অবশ্য কাকা আর মানুষ হতে না চায় তবে আলাদা কথা। আমারই ঘাট হয়েছে, আমিই যাচ্ছি। শ্রীদীপ যদি যায়, আমার আপত্তি নেই। তবে মাসিকে বলে যেতে হবে, কুমড়োজোল থেকে আমরা না ফেরা পর্যন্ত যেন দরজা না খোলে। কথা-বলা বাঘকেও বিশ্বাস করতে নেই। যে বাঘ চাঁদ দেখে হাঁ করে থাকে, তার মাথার ঠিক নেই, একথা বলা যায়।"

সপ্তবটী ছায়াপীঠ কুমড়োজোল চিতামুণ্ডি পাহাড়। সব কেমন রহস্যময় নাম। মাসিকে বলে আমরা দুই ভাই দুধুলির অরণ্যের গা-ঘেঁষা পথ ধরে যাত্রা করলাম চটবাবার দেশে। মাসি বললেন, "বাঘটা আর আসেনি।"

সপ্তবটীর ছায়াপীঠ কম দূর পথ নয়। অরণ্য আর ছোট-ছোট পাহাড় ঘেরা গ্রাম কুমড়োজোল। যেন এক রূপকথার দেশ। তিন দিন দু'রাত্রি প্রায় নাগাড়ে হেঁটে এলাম আমরা। রাত্রে কেবল তিন-চার ঘণ্টা মতন গাছের উপর চড়ে প্রকাণ্ড কাণ্ডে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিয়েছি। গাছের পাতার রং এত সবুজ যে, পলক পড়তে চায় না। গাছের পাতার রং সবুজ হবে তাতে কিছু আশ্চর্য লাগে না। কিন্তু পাহাড়ের রং নীলাভ। অনেক হাঁসের ডানার মতো সাদা মেঘ পাহাড়ের চুড়োয় পাখা মেলে ডিমে তা দিচ্ছে গলা তুলে, এরকম মনে হচ্ছিল। পাহাড়ের গা বেয়ে একদা জলের ঝোরা নেমেছিল হলুদ রঙের। জলের গেরুয়া রং দেখেছি, গেরুয়া একটু বেশি গাঢ় হলে কি হলুদ হয়ে যায় ! গাছে-গাছে নানা রঙের পাখি। ঝুঁটিবাঁধা একটা পাখি দেখলাম, কাকাতুয়া নয়, পাহাড়ি বুলবুলিও নয়, কেমন অন্য ধরনের চেহারা, ভরতপাখিও আবার নয়। নাম যে কী হবে জানি না। দেখেই মনে হল, আমাদের সঙ্গে কথা বলবার জন্য ছটফট করছে।

মাথার উপর একটা নুয়ে থাকা দোল-দোলানো যায় এমন ডালে

বসে ডেকে উঠল, "বাবা ! বাবা !"

মেজদা বলল, "চটবাবাকে ডাকছে পাখিটা। পথের উপর বটতলায় বসে-থাকা মায়াদহের সাধুটা বলল না যে, যে-বনে ঝুঁটিবাঁধা পাখি 'বাবা' বলে ডাকবে, সেই হল সপ্তবটী— তোর মনে নেই শ্রীদীপ ? এখান থেকে লম্বা দেড় ক্রোশ হাঁটলে তবে ছায়াপীঠের বোধিতোয়া পাব। বোধিতোয়া হল ফল্গু নদী, মাটির তলা দিয়ে গেছে, দেখা যায় না। চিতামুণ্ডির পাহাড় থেকে হলুদ নদীটা নেমে পাতালে ঢুকে গেছে। তারপর অদৃশ্য হয়েছে। তলে তলে বয়ে গেছে ছায়াপীঠের মাটির অন্তর দিয়ে— কেবল উপবনের আশ্রমের যে খোড়ো মন্দির, তারই ভিতর একটা ঝোরজলা মতন আছে, ভাঁটার মতন, তন্দুরি রুটির পেটের মতন বাঁধানো ঘের—সেখানে ফল্গুজল ছলছল করে বইছে, শোনা যায়। বিশ্বাস করি না, তবু বলছি, সেই জল পড়ে চটবাবা তুক করে। মানুষ পাখিও হতে পারে, বাঘও হতে পারে।"

বললাম, "চলই না, দেখা যাক। ঝুঁটিঅলা পাখিটা কি তবে মানুষ ছিল !"

মেজদা মুখ বাঁকিয়ে বলল, "ধুস্ ! সব শেখানো বুলি।"

নদীটা ফল্গু বটে ; কিন্তু হলুদ ঝোরা-জল চিরে পাহাড়ের গা বেয়ে একপাশে কিছুটা ঠেলে এসে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এক সরোবর। নাম বোধিতল। যে মানুষটা বাঘ বা পাখি হতে আসবে তাকে ওই সরোবরের জলে স্নান করে চটবাবার খোড়ো মন্দিরের কাছে ছায়াপীঠে আসতে হবে।

এক ক্রোশ হাঁটার পর আমাদের সামনে পড়ল এক নদী। তালকাঠের ডোঙা বাঁধা আছে এক ঝুঁটিতে। ঝুঁটিটি নদীর জলে অর্ধেক ডুবে আছে। ডোঙায় কখনও চড়িনি। লম্বা মোচার মতো জলে ভাসছে। এত বড় লেজ-অলা ভাসমান জিনিস দেখে অবাকই লাগল। মোচার মতনই রং ডোঙাটির।

এক কিশোর ডোঙার মাথার ভিতর বসে ছিল, দূর থেকে চোখে পড়েনি। দেখলাম ছেলেটি আমারই মতো বয়েস বটে, কিন্তু গায়ে জামাকাপড় নেই। চট পরে আছে। বুঝতে পারলাম, আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি। ছেলেটি ওর নাম বলল, "মুড়কি।"

মুড়কি বলল, "এই নদীটার নাম চেরাবন্দী। চিতামুণ্ডির দক্ষিণের গা বেয়ে নেমেছে। সবই যে কবে নেমেছে কেউ জানে না। এখন পাহাড়ের সঙ্গে এই নদীর যোগ নেই। যখন পাহাড় উঁচু ছিল, তখন ওর গায়ে হিমানি হত। সেই সময় নদীগুলি হয়েছে। উত্তর দিকের গা বেয়ে হয়েছে বোধিতোয়া। সেটি চোখে দেখা যায় না। চেরাবন্দী নদীটি দেখা যায়। দেখতে পাওয়া যায় এমন নদী এখানে একটিই। চিরে নেমে বন্দী হয়েছে বলে এইরকম নাম।"

শুধোলাম, "কোথায় বন্দী হল ?"

মুড়কি বলল, "কেন, এ নদী তো বেশি দূর যায়নি। পুব দিকে গেলে দেখতে পাবে ধু-ধু করছে বালি। সেখানেই শেষ হয়েছে নদীর বাড়। ছোট একটা মরুভূমি নদীকে খেয়ে নিচ্ছে। সপ্তবটী শুকনো এলাকা। অরণ্যে যেসব গাছ দেখলে, সবই শাল-সেগুন বা ওই ধরনের গাছ। ফল দেয় না। এখানকার মাটিতে কাঁকর আর বালি মেশানো আছে। বাজরা আর ভুট্টার চাষ হয়।"

মেজদা বলল, "নদী বেশি নেই বলেই এখানকার মানুষ বোধিতোয়ার কল্পনা করেছে। হতে পারে একদিন হয়তো একটা

আকাশে ওড়ার কথা □ উনিশ

১৯১০ : রাশিয়ার প্রথম বিমান

আলেকজান্ডার ফিওডোরোভিচ মোঝাইস্কি ছিলেন রাশিয়ান নৌবাহিনীর অফিসার ও বিমানে উৎসাহী। তিনি ১৮৮২-৮৪-র মধ্যে একটি বিমান তৈরি করেছিলেন। বিমানটি ছিল মনোপ্লেন ও বিরাট আকারের, ডানার আয়তন ছিল ৪০ ফুট। ডানা দুটি চৌকো, নিয়ন্ত্রণের তারগুলি ওপর দিকে ও নীচেও বাঁধা ছিল। মোঝাইস্কি এই বিরাট আকারের বিমানের জন্য দুটি হালকা ১০ ও ২০ অশ্বশক্তির ব্রিটিশ এঞ্জিন জোগাড় করলেন। এঞ্জিন ও বিমানের খুঁটিনাটি পরীক্ষার পর ১৮৮৪ সালের এক দিনে বিমানটি ওড়ার জন্য প্রস্তুত। বৈমানিক গলুবেভ বিমানে বসেছেন। বিমানটি একটি লঞ্চিং র‍্যাম্পের ওপর থেকে ওড়ার জন্য তৈরি। কিন্তু প্রায় ১ টন ওজনের ওই ভারী বিমানকে তার হালকা এঞ্জিন আকাশে ওড়ার শক্তি জোগাতে পারল না এবং মাটিতে পড়ে গেল। আরও শক্তিশালী এঞ্জিন পাওয়া গেলে বিমানটি উড়ত কি না তা বলা শক্ত, তবে আকাশে ওড়ার ইতিহাসে মোঝাইস্কি নিশ্চয়ই স্থান পাবেন। রাইটভাইদের সফল ওড়ার পর রাশিয়াতেও বিমান সম্পর্কে উৎসাহ দেখা দেয়, যে সকল বিমান-উৎসাহী নানারকম মডেল তৈরি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন এ. এন. টুপোলেভ ও আইগর সিকরস্কি। সিকরস্কি তাঁর এস-১ হেলিকপ্টার তৈরি করলেন ও এঞ্জিনে নিলেন ২৫ অশ্বশক্তির অ্যাজানি মোটর। কিন্তু হেলিকপ্টারটি মাটি ছেড়ে উড়তে পারল না।

মোঝাইস্কি নির্মিত বিমান

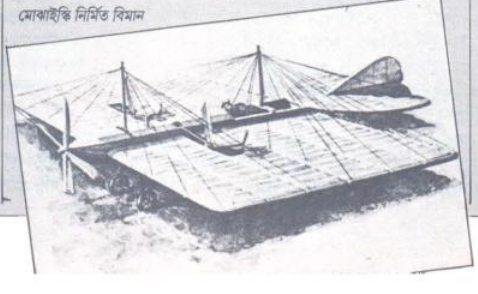

১৯১০ সালে রাশিয়ার একজন জার্মান বংশোদ্ভূত কারখানা-মালিক জ্যাকব হ্যাকেল অঁরি ফারমানের বিমানের মতো বিমান তৈরি করলেন। হ্যাকেল-বিমানটিতে লাগানো হল ২৫ অশ্বশক্তির আঁতোয়ানেত এঞ্জিন। একজন বৈমানিক এবং আধঘন্টা ওড়ার মতো জ্বালানি নিয়ে ১১০০ পাউন্ড ওজনের বিমানকে আকাশে ওঠানোর ক্ষমতা ওই এঞ্জিনের ছিল না। অবশ্য বিমানটি মাটি থেকে সামান্য উচ্চতায় লাফিয়ে উঠে আবার মাটিতে পড়ে কয়েকবার। হ্যাকেল-১ বিমানটিকে রাশিয়ার প্রথম উল্লেখযোগ্য বিমান বলা হয়।

ধ্রুবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও নদী ছিল, মরে গেছে। নদীর অতিরিক্ত আদর আছে কুমড়োজোলে। উষর জায়গা। মানুষ খুব গরিব। নইলে চট, ট্যানা এইসব পরে থাকত না। ধান পাট গম ছোলা মটর এসব হয় না। নদীতে মাছ নেই। অরণ্যে ফল নেই। চারিদিকে তেমন বসতিও চোখে পড়ে না।"

মুড়কি আমাদের সব কথাই শুনছিল, কিন্তু কোনও প্রতিবাদ করল না। ডোঙায় চড়ে বসলাম আমরা। লগি ঠেলে জলে ডোঙা ভাসিয়ে দিয়ে মুড়কি বলল, "সাবধান! বেশি নড়াচড়া কোরো না। এই জল আমরা খাই। এতে গা-ধোয়া, চান করা মানা। জলে পা পড়লে চটবাবা পা কেটে দেবে। গত সন ডোঙা থেকে পড়ে গিয়েছিল বলে দু' জনের পা কাটা পড়েছে।"

মুড়কির কথা শুনে আমরা চমকে উঠলাম। বুঝলাম, খুব সাঙ্ঘাতিক জায়গায় এসে পড়েছি। ডোঙায় চড়া অভ্যাস নেই। শিরদাঁড়া স্থির না রাখতে পারলেই গেছি—ঝপাং! তারপরই পা কেটে দেবে।

ডোঙা জলের উপর তরতর করে চলেছে। কাঁপা-কাঁপা গলায় মেজদা বলল, "আমার ধারণা, এখানকার লোক ম্যাজিক বিশ্বাস করে। পুরনো জাদুবিদ্যা জানে।"

প্রশ্ন করলাম, "কী করে বুঝলে?"

মেজদা বলল, "এখানকার পরিবেশ দেখেই বুঝতে পারছি।"

মুড়কি সহসা কথা বলে উঠল, "চটবাবা সব জানে। তবে আসল জিনিস হল সার্কাস।"

"সার্কাস!"

"হ্যাঁ, সার্কাস!"

মুড়কি লগি একটু জোরে ঠেলে দিয়ে বলল, "চটবাবা আমাদের টাকা দেয়, খেতে না পেলে আমরা কী করব, বাবার কাছে বাচ্চা কিশোরী মেয়েদের জমা দিই। বাবা নাকি টংকাবাবার কাছে সেই মেয়েদের গছিয়ে আসে। মেয়েরা সার্কাস শেখে। বুড়ি হয়ে গেলে, হাত-পা ভেঙে গেলে ফিরে আসে। এখান থেকে কত মেয়ে যে গেছে! ছেলেও যায় দু'-একটা করে!"

মুড়কির কাছে থেকে আরও আশ্চর্য-আশ্চর্য কথা শুনলাম আমরা। ওর কাছেই ছায়াপীঠের পথ-নির্দেশ পাওয়া গেল। হাঁটতে-হাঁটতে খানিকটা পথ আসার পর মেজদা বলল, "বলছিলাম না যে, পরিবেশই আলাদা। পুরনো জাদুবিদ্যার জায়গা। গাছের পাতার রং অতিরিক্ত সবুজ। এই রং মানুষকে সরল করে। হলুদ রঙের নদী, জলে লোহার ভাগ বেশি। এই জলে ফসল ভাল হবে না। নদীকে ফের গিলে নিচ্ছে মরুভূমি, মানে মরুভূমি বাড়ছে। জলের একান্ত অভাব। নদী ছাড়া এখানে কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অরণ্যে ফল হয় না। ট্যানাই পরত সবাই। জাদুকর চটবাবা অনেককেই চট পরিয়ে ছেড়েছে। এখানে জাদুর প্রভাব বেশি হয়। চট পরা এখানে সম্মানজনক ব্যাপার। আমি সঙ্গে করে পাতলা দু'খানা চট এনেছি। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আয় আমরা পরে নিই। কাজের সুবিধে হবে।"

বললাম, "চট পরলে কাতুকুতু লাগবে না? খুব খসখসে তো!"

মেজদা রাগতস্বরে বলল, "লাগুক। কিন্তু হাসবে না। কুমড়োজোলে যে রহস্য আছে, তা আমাদের বুঝতে হবে। মনে রেখো,সিধুকাকা এখানকারই লোক। খুব ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি গেছে। ঠাকুদ্দা ওর বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু বউটা বাঁচেনি। ওর কোনও সন্তানাদিও নেই। একা মানুষ, কিন্তু বুড়ো হওয়ার পর ওর মাথাটা বিগড়ে গেল। চলে আসার সময় মায়ের কাছে জীবনভর জমানো সব টাকা কাকা সঙ্গে করে এনেছে। সিধু গুন কবে এসে পৌঁছল, কী করল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এত টাকা সঙ্গে আছে, কী হয়েছে কে জানে!"

একটু থেমে মেজদা ফের বলল, "কাকা এখানকার মানুষ, ওর ভিতর পুরনো জাদুবিশ্বাস খুব চড়া। ওরই ভাই হল টংকা। খুব সন্দেহজনক লোক। চটবাবার সঙ্গে যোগসাজসে কারবার চালাচ্ছে, বাচ্চা ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সার্কাসে চালান দেয়।"

আমি বললাম, "টংকার সারা গায়ে, মুখে, বুকে উল্কি। এই নদীর জলের মতো সেই নকশার রং। পাহাড়ের মতো নীল সুর্মা টানা চোখ, মেঘের মতো সাদা উল্কিও ছিল।"

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা চট পরে নিচ্ছিলাম। গাছে একটিও পাতা নেই। এই গাছটা অদ্ভুত ধরনের। হঠাৎ গাছের উপর থেকে কে যেন ডেকে উঠল, "বাবা! বাবা!"

চমকে উঠে উপরে চাইলাম। দেখি একটা ভয়ঙ্কর কালপেঁচা চোখ ঘোরাচ্ছে বনবনিয়ে। ওকে দেখে বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। মাথাটা শিশুদের মতো হেঁড়ে। স্বাভাবিক পেঁচাদের চেয়ে একটু বেশিই স্থূল। মাথা নাড়ছে এদিক-ওদিক। উপরে-নীচে আশেপাশে এমন করে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে যে, মনে হল, ব্যাটা চটবাবার চর।

মেজদা বলল, "দেখে মনে হয় মানুষই ছিল একদিন। এখন কুমড়োজোলে চৌকি দিয়ে বেড়াচ্ছে। এখানকার কোনও কিছুই বিশ্বাস করা কঠিন। তবে হ্যাঁ, সিধুকাকা যে মানুষই ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা তাবিজ বুকে করে বেঁচে রইল ছ'-সাতটা যুগ। ভাঙাচোরা বুক, তবু বিশ্বাস কতখানি! ও মনে করত, যে তাবিজ ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে তা হল, কুমড়োজোলের তাবিজ।"

মেজদার কথা শুনে ভয় করতে লাগল। সিধুকাকা কি পুরোপুরি মানুষ ছিল না? এই পেঁচাটাকে দেখে অনেকটা মানুষ-মানুষ লাগছে, মুখটা বিনুমাসির পাশের বাড়ির ন'বউয়ের বাচ্চার মতো গাব্বু-গাব্বু। এ যেমন ঠিক, হতে পারে সিধুকাকাও কিছুটা অন্য কিছু ছিল। নইলে এত হালুম-হালুম করবে কেন?

আমরা চট পরে কেবলই সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় উল্কি আঁকা চার-পাঁচটা তাগড়া জোয়ান এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। ওদের হাতে দড়ির প্রকাণ্ড ছাঁদা। আমাদের দু'ভাইয়ের মাথার উপর দিয়ে সেই ছাঁদাজালটা ছড়িয়ে দিয়ে বেঁধে ফেললে। তারপর একটা বাঁশের মাঝখানে ঝুলিয়ে বাঁশ কাঁধে করে অদ্ভুত মন্ত্র আউড়াতে-আউড়াতে বয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে।

দু' পাশে পাহাড়ের খাড়া-করা গা। মাঝে ছোট-ছোট কুটির। এখানকার বসতি-বিন্যাস। একটা লম্বা বাঁশের মাথায় ছাঁদা ঝুলিয়ে খাড়া করে মাটিতে পুঁতে দিল ওরা সেই বাঁশ, আমরা শূন্যে ঝুলতে থাকলাম।

সারাটা দিন চলে গেল। নীচে ওরা ঢোল আর মাদল বাজিয়ে নাচগান করল। গানের ভাষাও তেমনি :

মায়াপুরার ডিহিতে
খড়কেবাবার চেলা রে!
তটের তহবন্দ পরা সে,
বোধিতোয়ার জলা হে—
ফুঁস্ দিটি ভাসে রে,
বাঘ-বাঘালি চরাতে;
তাহার জনম হল হে!

দেখতে দেখতে রাত্রি হল। মাঝরাত্তিরে চটবাবার উদয় হল একটা শিলার বেদীর উপর। দু'হাতে দুটি ঘটি ঝুলছে। আমাদের নামানো হল ছাঁদার ফাঁস থেকে। দড়ি খুলে দেওয়া হল। চট পেতে চটবাবার

সামনে বসতে দেওয়া হল। চটবাবার শিলাটা আসলে ডোঙার মতো দেখতে। প্রথমে বুঝতে পারা যায়নি। ডোঙার মাথায় উনি বসে আছেন। দূর থেকে দেখে বেদী মনে হচ্ছিল।

চটবাবা প্রথমে ভাষণের সুরে বললেন, "নদী ছোট এখানে তাই ডোঙার ব্যবস্থা। এই আমাদের জাতীয় চিহ্ন। ডোঙা। খেতে না পাওয়া শিশু, কিশোরী, কিশোর এই ডোঙায় করে সার্কাসে যায়। আজ তিনডোঙা কিশোরীকে রেখে এলাম নদীর পারে ঝুঝকিঝোরার কাছে। টংকাবাবা এসে নিয়ে গেল মায়াপুরী সার্কাসে। এক-একটার দাম দিল একশো পাঁচ টাকা করে। যারা হাত পা ভেঙে ফেরে, তারা থাকে যমিদুয়ারের তলায়। সার্কাসে কুড়ি টাকা মাইনে। আমার ঘোষণা, সময় থাকতে ছোট-ছোট ফুলের মতো মেয়েদের আমায় দাও। ইনাম দেব, টাকা দেব। আমার জাদুবিদ্যায় বিশ্বাস রেখেছ বলেই আজও খর মরু চেরাবন্দীকে গেলেনি।"

মেজদা বলল, "চটবাবার মুখেও উল্কি আঁকা।"

হঠাৎ চটবাবা মন্ত্রজপা সুরে হেঁকে উঠলেন, "ধেত্তেরি, ধেত ! এখানে বাঘ হয় প্রেত ! সিধু গুন গুনানি। বাঘের হল সুনানি। সিধুকেই ডেকে নেব নাকি বিনুকে দুয়ার খুলে দিতে বলবে ?"

ভয়ে আমি বলে উঠলাম, "তুমি কে গো ?"

চটবাবা গম্ভীর গলায় জবাব দিল :

"উল্কি আঁকা ফুলকি মাখা প্যাঁচ
প্রেতের পিণ্ডি ইণ্ডি গিণ্ডি,
কলকাতা কি রাওয়ালপিণ্ডি
ভুতো বাঘা খেলছ কোথা ম্যাচ !"

"যাও। ফিরে যাও। আমি হলাম দক্ষিণরায়ের কোটাল। রিং-মাস্টার চটিতন হলেন টংকা জোকার। বেশি ঘাঁটালে ফিরতে পারবে না।

"চট চটিতন খিড়কি
আমার ছেলে মুড়কি।"

এমন সময় মস্ত ডোঙার লেজের দিকে, যেখানে দেওয়াল মতন রয়েছে, কালো পাহাড়ের মতন কঠিন শিলার গা খাড়া হয়ে রয়েছে, হঠাৎ সেখানের একটা ঢাকনা খুলে গিয়ে খিড়কি দোর দেখা গেল। সেই পথে মাথায় পাগড়ি বাঁধা, পায়ে মল পরা, গায়ে উল্কি, কোমরে বিছে, চটপরা মুড়কি বেরিয়ে এসে অদ্ভুত মোলায়েম মুদ্রায় নাচতে লাগল, কোথায় ঢোল বেজে উঠল চড়চড় করে। চারদিকে ভৌতিক নাচ শুরু হয়ে গেল।

ভূতের পিণ্ডি থেকে বাঘের জন্ম। সাঙ্ঘাতিক কথা। মন্ত্রের বশে চটবাবা এই সব করে ? সিধুকাকার কী হয়েছে কে জানে। কিন্তু চটবাবার কথা শুনে মনে হচ্ছে, বিনুমাসির বাড়ির ওই বাঘটাই সিধু গুন।

আমি বললাম, "হ্যাঁ বাবা। তাই হবে। মাসিকে গিয়ে বলছি মাসি দুয়ার খুলে দেবে। তবে আমাদের এখানে আসতেই তিনদিন লেগে গেল। বুড়ো মানুষ কখন এল আর কখন বাঘ হয়ে ফিরে গেল বুঝতে পারছিনে।"

চটবাবা বললেন, "তিনদিনের পথ বাঘের একবেলাও লাগে না। এসেছে তিনদিনে। গেছে দু'-তিন ঘণ্টায়। তবে ওর মগজে কিছুটা মানুষের ভাব আছে। ওকে ফুঁস করতে গিয়ে হুঁশ ঘটির জলে ভুল

করে হাত পড়ে গিয়েছিল বলে এখনও ওর দেহ-মন কাঁচা। ওকে রোদ লাগাবে না। ছায়ায় ঘরের মধ্যে রাখবে। খাওয়া-শোয়া মানুষের মতো হবে। মশারি টাঙিয়ে খাটে শুতে দেবে। দাঁত মাজার পেস্ট আর ব্রাশ দেবে। গায়ে মাখবার আতর দেবে।"

একটুখানি চুপ করে থেকে চটবাবা ফের বলল, "সামনে চৈত্র মাসের আগেই সিধুকে নিয়ে আসবে। চড়া রোদে নইলে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে হুঁশ ঘটির জল। তারপর পাহাড়ের চুড়োয় যে সাদা-সাদা মেঘ দেখছ, ওগুলো সব হুঁশ জলের মেঘ, ও জিনিস আর জল হয়ে নামে না। বাঘগুলো তখন সুন্দরবনে চলে যায়। তোমরা নিশ্চয়ই চাইবে না যে সিধু চিরকাল বাঘ হয়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে। যাও।

ফুস্ মন্তর চাক্কি
আমার কথা পাক্কি।

আপন মনে গজগজ করতে করতে মেজদা উঠে দাঁড়াল। চটবাবার উপর ভয়ানক চটে গিয়েছিল। বাবার আশ্রম ছেড়ে এলাম আমরা। রাত্রি তখন ভোর হয়েছে। কুমড়োজোলের ঘরে-ঘরে মেয়ে-হারা মায়েরা কাঁদছে। অভাবে পড়ে তারা কন্যা সন্তানকে চটবাবার হাতে সামান্য টাকার বিনিময়ে তুলে দিচ্ছে। যমিদুয়ারের তলায় এসে দেখলাম হাত-পা ভাঙা মেয়েরা পড়ে আছে। একজন মাত্র ষাট টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। সার্কাসের লোকেরা যেমন করে খাঁচায় পুরে বাঘ পোষে, তেমনি করে সামান্য দানাপানি দিয়ে তাঁবুর মধ্যে ওদের আটকে রাখত। নানারকম অত্যাচার করত। মারত। হাতে চাবুক, খেলা-শেখানো লোকটা জল্লাদের মতো ভয়ঙ্কর। সার্কাস থেকে পালিয়ে আসার কোনও উপায় ছিল না।

মেজদা বলল, "চটবাবা খুব সন্দেহজনক। একটা ভয়ানক চক্রের হাতে পড়ে গিয়েছে সিধুকাকা। চটবাবার গায়ে রং-করা চট। বেনিয়ান জ্যাকেটের মতো করে পরেছে, বুকের উপর দুটি কালপেঁচার ছাপ। সামনে একটা সিঁদুর বসানো আমপাতা বেলপাতা ধান দুব্বো ছড়ানো রুপোর থালা। আমি স্পষ্ট দেখলাম, ঠাকুমা ওই থালাটা সিধুকাকাকে দিয়েছিল। ওর বিয়েতে। আর দিয়েছিল রুপোর বিছেহার আর সোনামুখি রুপোরই টায়রা, এমন টায়রা আর কোথাও দেখিনি। কতদিন আমরা ওসব দেখেছি, মায়ের সিন্দুকে জমা ছিল। সিঁদুরের ডেলায় ডোবানো বিছেহার আর টায়রা-ময়ূর উঁকি দেয়। সবই ঠাকুমার আমলের, তাও চকচক করছে। ধূপ-ধুনো করে চটবাবা পেঁচার পুজো করল, তখন সবই লক্ষ করেছি। এখন দ্রুত বিনুমাসির বাড়ি পৌঁছনো দরকার। তোর মনে আছে, সিধুকাকা প্রায়ই বলত, আমি শুখা দেশের মানুষ! একটা বালির প্রকাণ্ড চর আছে, যেটাকে এরা মরুভূমি বলছে।"

চেরাবন্দী পার হওয়ার সময় মুড়কির সঙ্গে দেখা। মুড়কিই আমাদের ডোঙায় করে পার করে দিল। হঠাৎ এবার চোখ পড়ল, মুড়কির চটের দুইপ্রান্তে পেঁচার ছাপ, যা যাওয়ার সময় লক্ষ করতে পারিনি।

মেজদা প্রশ্ন করল, "তুমি অমন সুন্দর নাচ শিখলে কোথায় মুড়কি?"

"সার্কাসে শিখেছি।"

"তুমি সার্কাসে ছিলে?"

"ছিলাম বইকী।"

"এখন চলে এলে কেন?"

"সার্ভিস চলে গেল।"

"কেন?"

"এত প্রশ্ন করছ কেন? তোমরা কি পুলিশের লোক?"

"না আমরা পুলিশের লোক নই। নির্ভয়ে বলো কী হয়েছিল!"

"কী আর হবে! কিছুই না। হুঁশ ঘটির জল গায়ে পড়ল, সার্ভিসটা আর থাকল না। হুঁশ মানে চৈতন্য। নতুন বাঘ এল সার্কাসে। তখন মনে-মনে বললাম, ও! তা হলে এই রকম!"

"কী রকম?"

"মায়াপুরী সার্কাস দেখেছ?"

"না।"

"নতুন বাঘটাকে একবার দেখলেই বুঝবে কী গোত্তা আর তাগড়া জিনিস!"

"সে না হয় বুঝব! কিন্তু তোমার কী হল!"

"কী আর হবে! বাবা আমাকে নতুন কাজ দিয়েছে।"

"কী কাজ?"

"বাজে বোকো না। এবার নামো। এখানে এসো না। কুমড়োজোলে।"

"কেন?"

"বারবার কেন-কেন করছ! করছ কেন?"

"সিধুকাকার জন্য। ও বাঘ হয়ে গিয়েছে।"

"সে ভারী ভয়ের কথা। যাও, চলে যাও। চট চটিতন খিড়কি।/ বাবার ছেলে মুড়কি।"

মুড়কি খুব দার্শনিকের মতো কথা বলছিল। হুঁশ মানে চৈতন্য, সেকথা কখনও ভাবিইনি। এপারে এনে ডোঙা বাঁধল সে। তারপর চিতামুণ্ডি পাহাড়ের দিকে উদাস চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ভোরবেলাকার আলোয় সাদা মেঘগুলি লাল বর্ণে রাঙা হয়ে উঠেছিল।

মুড়কি মেঘের দিক থেকে চোখ ফেরাল ধীরে-ধীরে। তারপর আমাদের একটি বেঁটে পাহাড়ের কাছে টেনে নিয়ে এল। দেওয়ালের গায়ে হাত রেখে কী করল বোঝা গেল না, হঠাৎ একটা খিড়কি-পথ তৈরি হল পাল্লা সরে গিয়ে। পথ তো নয়, সুড়ঙ্গ।

মুড়কি বলল, "এই পথে চলে যাও। শর্টকাট। তবে শোনো, এখানে আর এসো না। মানুষের জীবন খুব শস্তা এখানে। সার্ভিস চলে যাওয়ার পর একটা কথাই বুঝেছি, হালুম হলেই বাঘ হয় না। এর বেশি বলতে পারব না। বাবা আমার জিভ কেটে ফেলবে। বাবা জানে ভানুমতীর খেলা, তাইতে জিভ কেটে মানুষের কথা বন্ধ করে দেওয়া হয়।"

হঠাৎ খানিকটা রাগত গলায় মেজদা বলল, "তোমার চটবাবা ভালমানুষ নয়। কুমড়োজোলের মাতব্বর বটে, কিন্তু খুব শয়তান। আশ্চর্য জায়গা, এখানে কানুন বলে কিছু নেই, থানা-পুলিশ নেই।"

"ওসব বোলো না। যাও, চলে যাও।"

সুড়ঙ্গ-পথে কিছুদূর হাঁটার পর পাহাড় ফুরোল। তারপর বনের পথ ধরে কিছুটা হেঁটেই আমরা সেই আগের সরু পথটা পেয়ে গেলাম। এত সহজে হেঁটেই আমরা সেই আগের সরু পথটা পেয়ে গেলাম। এত সহজে কুমড়োজোলের চেরাবন্দীতে পৌঁছনো যায় কে জানত! তবে এ-কথা সত্যি, সত্যি এই চোরাপথ সাধারণ মানুষ খুঁজেই পাবে না।

সরু পথ ধরে চলতে-চলতে মেজদা বলল, "হালুম হলেই বাঘ হয় না, সে তো বাবাও বলে।"

আমি বললাম, "মুড়কির কথা কিছুই বোঝা গেল না। সার্কাসের চাকরি চলে গেল কেন?"

মেজদা বলল, "দাঁড়া, আগে দেখি সব ব্যাপার। আগে মায়াপুরী সার্কাস দেখা দরকার।" (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কাগজের জাল

প্রতি বছর জাপানে ৭ জুলাই তানাবাটা উৎসব হয়। এই উৎসবের দিন ছেলেমেয়েরা রঙিন কাগজ দিয়ে এক ধরনের জাল তৈরি করে সাজায়। এইভাবে কাগজ কেটে মজার নকশা বানানোকে জাপানিরা কিরিগামি বলে।

কাগজের জাল তৈরি করতে তোমাদের লাগবে একটা চারচৌকো কাগজ। সেটা খবরের কাগজও হতে পারে। আর একটা কাঁচি।

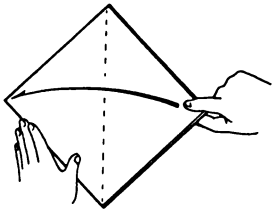

(১) চৌকো কাগজটা টেবিলে পেতে লম্বালম্বিভাবে অর্ধেকটা ভাঁজ করে নাও।

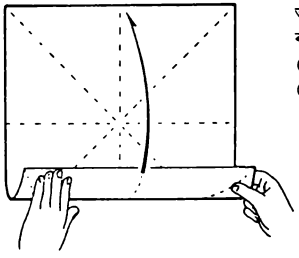

(২) বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এনে আবার অর্ধেকটা ভাঁজ করো।

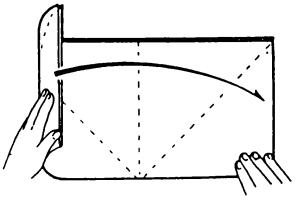

(৩) এবার নীচের ডান দিকের কোণ, উপরের বাঁ দিকের কোণের সঙ্গে মিলিয়ে ভাঁজ করো।

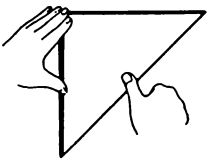

(৪) ত্রিকোণ কাগজটা বুড়ো আঙুলের চাপ দিয়ে ভালভাবে ভাঁজ করে নাও।

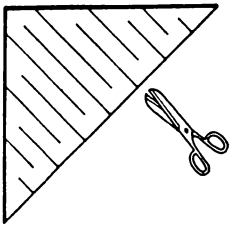

(৫) ত্রিকোণ কাগজটি এবার ২ সেন্টিমিটার অন্তর-অন্তর কাঁচি দিয়ে কেটে ফ্যালো। খেয়াল রাখবে কাগজটা যেন পুরোপুরি না কেটে যায়। এবার ত্রিকোণ কাগজটা ঘুরিয়ে আবার ২ সেন্টিমিটার অন্তর কাটো, আগের কাটা লাইনের মাঝখান দিয়ে। এবারও খেয়াল রাখবে কাগজটা যেন শেষ পর্যন্ত না কেটে যায়।

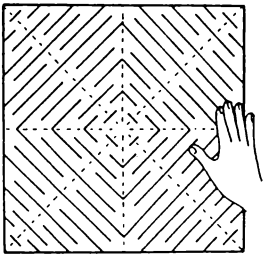

(৬) আস্তে করে পুরো কাগজের ভাঁজ খুলে ফ্যালো।

(৭) খুব সাবধানে কাগজের চারটে কোণ এক জায়গায় এনে তুলে ধরো, যাতে খোঁচা লেগে বা জড়িয়ে কাগজটা না ছিঁড়ে যায়। দ্যাখো কী সুন্দর একটা কাগজের জাল তৈরি হয়ে গেল!

কবির

কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়

শুরুরও যেমন একটি শুরু থাকে, ঠিক তেমনি একটি ঘটনার পেছনেও থাকে আর-একটি ঘটনা। সেরকমই দু-একটি ঘটনা আছে এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পেছনে। অনেক আগে সেই ১৯১৬—'১৭ সালের কথা, কোচবিহার শহরে তখন মাত্র দু-তিনটে স্কুল মাধ্যমিক পর্যায়ের, এর মধ্যে দু'টি ছেলেদের জন্য। একটি 'জেনকিন্স' অন্যটি 'সদর মডেল', মেয়েদের একটি 'সুনীতি একাডেমি'। গোটা কোচবিহার জেলাতেই তখন হাতে গোনা যায় এমন ক'টি স্কুল মাত্র। একদিকে তখন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জীবিকার খোঁজে বা অন্যান্য কাজের জন্য দলেদলে মানুষ আসছে এই শহরে, অন্যদিকে এই শহর থেকে দেশের অন্যান্য প্রান্তে যাতায়াতের জন্য রয়েছে সুন্দর ব্যবস্থা। সুতরাং মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে স্কুলেপড়া ছেলেমেয়েদের সংখ্যাও। শহরে তখন ওই তিনটি স্কুল সব ছেলেমেয়েদের নিতে পারছে না। অনেকেই তখন আর-একটি স্কুলের প্রয়োজন ভীষণভাবে অনুভব করেন। ঠিক এইরকম সময় ১৯১৭ সালে কোচবিহার শহরের পূর্ব দিকে নীলকুঠিতে সুইডেন থেকে আসা কিছু শিক্ষাব্রতী ধর্মপ্রচারক তোর্ষা নদীর গা ঘেঁষে কিছু জমি নিয়ে একটি ছোট স্কুল স্থাপন করেন। এর কিছুদিন পরে ওই ছোট স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষানুরাগী মানুষের অনুরোধে ১৯২৪ সালে নীলকুঠির বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধর্মপ্রচারক REV. E. HALLIDAY. OWEN সাহেব শহরের মাঝখানে কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ (তৎকালীন কুমিল্লার সিভিল সার্জন) মহাশয়ের বাড়িতে ভাড়া হিসেবে কিছু টাকার বিনিময়ে স্কুলটিকে তুলে নিয়ে আসেন এবং স্কুলটিকে সুইডিশ মিশন ইনস্টিটিউশন নামে অভিহিত করেন। এই স্কুলটিই পরবর্তী কালে হয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়। এই ঘটনার কিছু দিন পরে অর্থাৎ শহরের মাঝখানে স্কুলটি সরিয়ে আনার পর OWEN সাহেব অবসর গ্রহণ করেন। OWEN সাহেবের দেশে চলে যাওয়ার পর সুইডেনের মহিলা সঙ্ঘ কোচবিহারের জনসাধারণের মধ্যে এই স্কুল পরিচালন সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ না থাকার জন্য স্কুল পরিচালনের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রকাশ করতে থাকেন এবং মহিলা সঙ্ঘের সেক্রেটারি সুইডেন থেকে লিখে পাঠান—স্কুলটিকে ঠিকমতো চালানোর ব্যাপারে কোচবিহারের জনসাধারণের তরফ থেকে একটি আবেদন রাখতে হবে। এর পর কোচবিহার শহরের প্রায় সহস্রাধিক মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয় সুইডেনে। এই আবেদনপত্র পাওয়ার পর মিশনের প্রধানকে কোচবিহারের মহারাজার দরবারে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় সুইডেন থেকে। তৎকালীন মহারাজা আবেদনপত্র পাওয়ামাত্র রাজদরবার থেকে বিদ্যালয় স্থাপনের সম্মতি দেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় স্কুলের জমি নিয়ে। খুব তাড়াতাড়ি এ-সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ভিক্টোরিয়া কলেজ-এর নতুন ছাত্রাবাস নির্মিত হওয়ায় পুরনো ছাত্রাবাসের ঘরগুলি খালি হয়ে যায়। তখন মিশনের REV. A. W. BRANDT স্থানীয় কিছু উৎসাহী মানুষকে নিয়ে তৎকালীন মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের কাছে গিয়ে স্কুলের জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজের পুরনো ছাত্রাবাসটি চাইলে মহারাজা সঙ্গে-সঙ্গে তা মঞ্জুর করেন এবং সেইসঙ্গে প্রতি মাসে ১০০ টাকাও মঞ্জুর করেন ঘরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। এরপরে স্কুলের সমস্ত দায়িত্ব পরিচালন কমিটির হাতে চলে আসার পর পরিচালন কমিটি অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েন। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে এই কমিটি মহারাজার কাছে সাহায্য এবং স্কুলটি তাঁর নামে রাখার প্রস্তাব দেন। মহারাজা তাঁর নামের বদলে তাঁর পিতামহ বিদ্যোৎসাহী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের নাম রাখার পরামর্শ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তখন থেকেই এই স্কুলের নাম হয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়। এই স্কুল ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন পায়।

একপাশে ভিক্টোরিয়া কলেজ,এখন যার নাম আচার্য বি.এন.শীল কলেজ, অন্যপাশে এই স্কুল। সবুজ ঘাসের কার্পেট দেওয়া বিশাল মাঠ, মাঠের চারপাশে স্কুলবাড়ি। মাঠের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর দিকে এখনও সেই সাবেককালের লাল রঙের টিনের ঘরগুলি সেদিনের স্মৃতি বহন করছে। দক্ষিণে নতুন স্কুল বাড়িটি তৈরি হয় ১৯৬২ সালে।

প্রতিদিন স্কুল বসে সকাল দশটা তিরিশ মিনিটে প্রার্থনা সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। বিশেষ কারণ দেখাতে না পারলে স্কুল আরম্ভ হলে আর কোনও ছাত্রকে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। স্কুলের নিজস্ব কিছু নিয়মকানুন আছে—কেউ তা লঙ্ঘন করলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় তাকে। স্কুলে একটি বেশ বড় লাইব্রেরি আছে। আট-দশ হাজার বই আছে। বিভিন্ন ধরনের বই, যেমন জীবনীগ্রন্থ, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণের বই, তা ছাড়া প্রচুর টেক্স্ট বইও আছে। ক্লাসে নিয়ম করে এই বইগুলি ছাত্রদের দেওয়া হয়, বিশেষ করে দরিদ্র ছাত্রদের। লাইব্রেরিয়ান না থাকার জন্য একজন শিক্ষক এই লাইব্রেরিটি পরিচালনা করেন। 'সাধনা' নামে স্কুলের একটি নিজস্ব পত্রিকা রয়েছে। এটি বছরে একবার প্রকাশিত হয়। এতে ছাত্ররা যেমন গল্প-কবিতা লেখার চর্চা করে, তেমনি শিক্ষকরাও নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।

প্রধানশিক্ষক

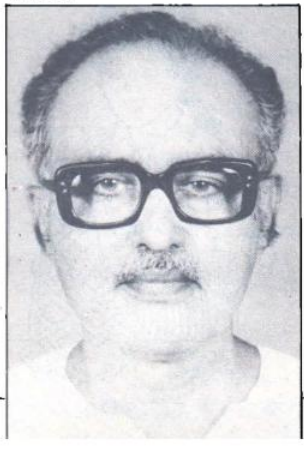

কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়

স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক হাজার। স্কুলে শিক্ষক ৩৬ জন, ২ জন করনিক ও ৪ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আছেন।

এই স্কুলে প্রধানশিক্ষকের পদে আছেন তরুণকুমার লাহিড়ী ১৯৬৬ সাল থেকে। যদিও অনেক বছর উনি এই স্কুলেই সহকারী প্রধানশিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন। ৩১ জানুয়ারি ১৯৯০ তরুণবাবু অবসর নেবেন। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনার জন্য স্কুলের সুনাম আছে। অন্যান্য শিক্ষক ও স্কুল-পরিচালন কমিটির মিলিত উদ্যোগ স্কুলটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কোচবিহারে শিক্ষার প্রসারে এই স্কুলের অবদানও কম নয়। প্রধানশিক্ষক এবং সহকারী প্রধানশিক্ষক ভরতচন্দ্র পাল, যিনি এই স্কুলে ১৯৫৮ সাল থেকে আছেন, প্রসঙ্গক্রমে জানালেন, "একদিন যে আদর্শ নিয়ে এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার ব্রত, আমরা কিন্তু একদিনের জন্যও সেই প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসিনি। আমাদের এখানে সাধারণত নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাই পড়তে আসে, যাদের অনেক অসুবিধে। তাদের জন্য আমাদের এই বিদ্যালয়। তবে আমরা পরিশ্রম করে হয়তো একটা ছেলেকে ভালভাবে তৈরি করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারি না। উঁচু ক্লাসে উঠেই চলে যায় অন্য স্কুলে। তবু কিন্তু আমাদের এই বিদ্যালয় মাধ্যমিকে বরাবর ভাল রেজাল্ট করে আসছে। যেমন ১৯৮৯ মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১১৪ জন। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৬ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৬ জন পাশ করেছে। স্টার পেয়েছে ২ জন। ১৯৮৭—১৯৮৮-তেও ভাল রেজাল্ট হয়েছিল। আমাদের অনেক সমস্যা আছে, যেমন—সারা বছর আমাদের যা কালেকশান হয় তাতে স্কুলের মেরামতির কাজটুকুও হয় না। আরও কয়েকটি ঘরের প্রয়োজন। সরকারের কাছে চাওয়া হয়েছে, জানি না কবে সেই টাকা আসবে।"

স্কুলে তিনটি বড় ল্যাবরেটরি আছে। ল্যাবরেটরি সম্পর্কে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক তিমিরবরণ রায় এবং পার্বতীচরণ চৌধুরী জানালেন, "ল্যাবরেটরি নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই বরং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বড়। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রম থাকার সময় এই ল্যাবরেটরিগুলি আমাদের দেওয়া হয়েছিল। এখন এগারো-বারো ক্লাস আমাদের স্কুলে নেই,তাই এত মূল্যবান ল্যাবরেটরি আমরা কোনও কাজে লাগাতে পারছি না।" অঙ্কের শিক্ষক কালীশঙ্কর রায় বললেন, "এই স্কুলের ছাত্ররা বিজ্ঞান বিভাগে বরাবরই ভাল রেজাল্ট করে আসছে,এবারও করবে।"

এই স্কুলের বহু প্রাক্তন ছাত্র আজ বিখ্যাত হয়ে দেশ-বিদেশে খুব সুনাম অর্জন করেছেন। যেমন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বার্ষিক এন সি সি দিবসের অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের এক ক্যাডেটের ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন

প্রথম ছাত্র

পারিজাত গোস্বামী মোট ৩৬০ নম্বর পেয়ে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে। পারিজাত দিনে ৫-৬ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশোনা করে। পারিজাতের বাবা প্রণয়কুমার গোস্বামী এই স্কুলেরই ইংরেজির শিক্ষক। পারিজাতের বাবা ওকে সব বিষয়ে সাহায্য করেন। পারিজাত ডাক্তার হতে চায়। ওর প্রিয় বিষয় বলে কিছু নেই, সব বিষয়ই ওর ভাল লাগে। আবৃত্তি ও কুইজ প্রতিযোগিতায় ও নিয়মিত অংশগ্রহণ করে ইতিমধ্যে অনেক পুরস্কারও পেয়েছে। ফুটবল ওর প্রিয় খেলা। আগামী পরীক্ষায় ও আরও ভাল ফল করবে, তার জন্য ও এখন থেকে তৈরিও হচ্ছে।

মোট ৬৮৬ নম্বর পেয়ে বিপ্লব গোস্বামী সপ্তম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের প্রিয় বিষয় ইংরেজি ও অঙ্ক। ও দিনে ৫ ঘণ্টার মতো পড়াশোনা করে। বিপ্লবের বাবা কালীগোপাল গোস্বামী পূর্তবিভাগের কর্মী, ছেলেকে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করেন। বিপ্লবের প্রিয় ছবি আঁকা, ও শিল্পী হতে চায়। ওর প্রিয় সাহিত্যিক সত্যজিৎ রায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। বেশি হই-হুল্লোড় ওর একদম অপছন্দ। ঘুরতে ভাল লাগে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান ওর ভীষণ প্রিয়। সামনের পরীক্ষায় আরও ভাল ফল করার জন্য ও তৈরি হচ্ছে।

অজিতকুমার রায় ৫৯৯ নম্বর পেয়ে অষ্টম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে। কোচবিহার শহর থেকে কিছুটা দূরে গ্রামে ওর বাড়ি। বাবা নেই।

দিনে ৫-৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করে। কষ্টের সংসারে ওকে মাঝে-মধ্যে কৃষিকাজও করতে হয়। গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ার মতো সামর্থ্য নেই, তাই অনেক শিক্ষকই ওকে বিনে পয়সায় পড়ান। অজিত ডাক্তার বা একজন শিক্ষক হতে চায়। ওর প্রিয় বিষয় ভূগোল ও অঙ্ক। বাইরে ঘোরার ভীষণ ইচ্ছে, কিন্তু সামর্থ্য নেই, তাই যাওয়া হয় না। শরৎচন্দ্র ওর প্রিয় সাহিত্যিক। ফুটবল-ক্রিকেট ওর প্রিয় খেলা। ফুটবলে বিকাশ পাঁজি, সুদীপ্ত চক্রবর্তী ওর প্রিয় ফুটবলার। সামনের পরীক্ষায় ও আরও ভাল ফল করবে বলে তৈরি হচ্ছে।

দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র হিমাদ্রি পাল মোট ৬৭১ নম্বর পেয়ে নবম শ্রেণী থেকে পাশ করেছে। বাবা-মা'র এক ছেলে। বাবা দিগেন্দ্রচন্দ্র পাল কোচবিহার কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছেলেকে সব বিষয়ে সাহায্য করেন। হিমাদ্রি দিনে ৬-৭ ঘণ্টা নিয়মিত পড়াশোনা করে। তা ছাড়া ২-৩ জন শিক্ষকের কাছেও পড়তে যায়। ওর স্বপ্ন ও এঞ্জিনিয়ার হবে। হিমাদ্রির প্রিয় বিষয় অঙ্ক। গল্পের বই পড়তে ওর ভাল লাগে। প্রিয় সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। ফুল ওর ভীষণ প্রিয়। ওর প্রিয় ফুটবলার কৃশানু, ক্রিকেটার সুনীল গাওস্কর। নির্জনতা খুব একটা ভাল লাগে না। ওর প্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। হিমাদ্রি পড়াশোনার ব্যাপারে খুব সিরিয়াস, সব কিছু জানতে চায় ভালভাবে, শুধু নোট পড়ে নয়। আগামী পরীক্ষার জন্য ও এখন থেকেই ভালভাবে তৈরি হচ্ছে।

পারিজাত গোস্বামী (ষষ্ঠ শ্রেণী)

বিপ্লব গোস্বামী (অষ্টম শ্রেণী)

অজিতকুমার রায় (নবম শ্রেণী)

হিমাদ্রি পাল (দশম শ্রেণী)

এক সময় এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কবি বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত,আকাশবাণীর অন্যতম কর্মকর্তা দীপেশ ভৌমিক,এম পি দেবপ্রসাদ রায়ও এই স্কুলেরই ছাত্র।

স্কুলে একটি ছাত্রাবাস আছে, চল্লিশজন বহিরাগত ছাত্র এখানে রয়েছে। খেলাধুলোর শিক্ষক কমলেশ গুহ নিয়োগী, নৃপেন্দ্রনাথ রায় স্কুলের খেলাধুলো সম্পর্কে বললেন, "স্কুলের নিজস্ব মাঠ নেই, তবুও আমাদের স্কুলের ছাত্ররা খেলাধুলোয় জেলায় একটি বিশেষ স্থান দখল করে আসছে। সুব্রত মুখার্জি কাপে এই জেলার মধ্যে আমাদের স্কুল সর্বপ্রথম জোনাল চ্যাম্পিয়ান হয় ১৯৮৬-তে। মহিমচন্দ্র টুর্নামেন্টে ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত আমাদের স্কুল জেলা চ্যাম্পিয়ান হয়। মোহনবাগান ক্লাবের শৈবাল ঘোষ এই স্কুলেরই ছাত্র।" সারা বছর স্কুলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, সরস্বতী পুজো, ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস। এ ছাড়া ১ অগস্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস, বাৎসরিক ক্রীড়া দিবস ও প্রাইজ ডে। এইসব অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্ররা গান, আবৃত্তি, বিতর্ক ও নাটকে অংশগ্রহণ করে থাকে।

স্কুলে এন সি সি'র তিনটি ট্রুপ আছে। প্রত্যেকটি ট্রুপে ১০০ জন করে ছাত্র রয়েছে। এদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে এই স্কুলের ছাত্র সমীর চন্দ প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির প্যারেডে অংশগ্রহণ করেছিল। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও এন সি সি'র ছেলেরা শহরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। যেমন, রাস্তা পরিষ্কার, হাসপাতালে ফল বিতরণ ইত্যাদি। সমাজের প্রতিটি ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার ব্রত নিয়ে একদিন যে স্কুলের জন্ম হয়েছিল, আজ বহু বছর পর অনেক সমস্যার মধ্যেও এই স্কুল সেই আদর্শ আর ব্রতকে সামনে রেখে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

নীরদ রায়

ফোটো : অলক কুণ্ডু

টিনটিন * হার্জ

আপনিই পুলিশ কমিশনার ? ... আপনার জন্য উপহার ... এটার ওজন এক টনের কম নয় !
ওটা কী এনেছ ?
উপর
ভঙ্গুর
সাবধান
?
চাক, তুমি ? আমার প্রিয় রিপোর্টাররা কোথায় ? শোনো, ববি স্নাইল্‌সকে ধরেছি। খবরটা প্রচার করতে পারো... হ্যাঁ, সেই গুপ্তরাজ্যের বাদশা ... টিনটিন যার পিছু নিয়েছিল ... ও এক্ষুনি ডাকে পার্সেলে এল...
পরদিন সকালে ...
এখানে থাক, কুটুস। আমি পুলিশের সদর দফতরে যাচ্ছি... কাজ সেরে এখানেই ফিরব ...
আচ্ছা, যাও।
মিঃ টিনটিন ? আমি ওয়ার্লড ভডেভিল কম্পানির মালিক, আপনার সঙ্গে সপ্তাহে এক হাজার ডলারের চুক্তি করছি। আর এই পাঁচ হাজার ডলারের চেক, খরচের জন্য...
মিঃ টিনটিন ... প্যান্টেক্‌নিকল রেডিও আপনার সঙ্গে চুক্তি করছে ... সপ্তাহে দু' হাজার ডলার ... 'গালগপ্পো' অনুষ্ঠানের জন্য...
পাঁচ হাজার ডলার ...
প্যারানয়েড প্রোডাকশন তাদের নতুন ১০০ কোটি ডলারের দুর্দান্ত ছবিতে আপনাকে দেখাবে।
আমাদের কাগজে কুটুসের ছবির জন্য দশ হাজার ডলার !
একটা লাভজনক প্রস্তাব আছে, সার ! আমাদের নতুন ধর্মের মুনাফার ভাগ ! নব ইহুদি-বৌদ্ধ-ইসলাম-মার্কিন ধর্মের বান্ধবসমিতিতে যোগ দিয়ে চড়া মুনাফা লুটুন !
?
তোমার কুকুরকে জ্যান্ত ফিরে পেতে হলে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হবে। রাজি থাকলে জানালায় সাদা রুমাল রাখবে। নইলে ...

আমেরিকায় টিনটিন

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ব্যাট ম্যান
পিটি, পালাও ! নইলে ব্যাটম্যানের সঙ্গে পুড়ে মরব !
গুণ্ডারা রুথ পার্কারকে তাঁর পৈত্রিক জমিতে তেলের জন্য কুয়ো খুঁড়তে বাধা দিচ্ছে। কুয়ো জ্বালিয়ে দিয়ে তারা ব্যাটম্যানকে মেরে বেইশ করেছে। ব্যাটম্যানের সামনে জ্বলন্ত মৃত্যু !
প্রচণ্ড উত্তাপে ব্যাটম্যানের হুঁশ ফিরছে !
এ কী ? গরম ... আগুন -- মনে পড়ছে, কাউকে তাড়া করেছিলাম, আর -- সর্বনাশ !
আগুন দেখে রবিন খোঁজ নিতে এল ...
যারা তেলের খনি জ্বালিয়েছে এ কাজ হয়তো তাদেরই। কিন্তু ব্যাটম্যান কোথায় ?
ব্যাটম্যান ! তুমি কোথায় ?
রবিন ডাকছে ! আমি সাড়া দিলেই ও এখানে আসবে আর আমার সঙ্গে পুড়ে মরবে !
বাঁচার ক্ষীণ আশায় ব্যাটম্যান তার শক্ত রেশমি দড়ি ঘোঁয়ার ভিতর দিয়ে উপরে ছুঁড়ে মারল ...
সফল হলে বাঁচব -- নইলে মৃত্যু !
পরের মুহূর্তে ...
যাক, চিনতে পারছ ! ভেবেছিলাম ঝলসানো রুটি হয়ে যাব !
ব্যাটম্যান !
জ্বলন্ত কুয়োর কাছে ফিরে গিয়ে ...
ব্যাটম্যান ! রবিন ! তা হলে বিজ্ঞাপন দেখে আমাকে সাহায্য করতে এসেছ ! কিন্তু দ্যাখো, ওরা কী করেছে !
আমরা ওদের দেখতেও পেয়েছি, মিস পার্কার !
আশা করছি ওটাই শেষ দেখা নয় !
আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করেছি ... তবে তার পরে কী করব জানি না ! বিগ টিম শক্তিশালী, নিচুর !
ওকে শায়েস্তা করা যাবে। কিন্তু লোকটা কে ?
বিগ টিম হেল আশপাশের বেশির ভাগ তেলখনির মালিক। বাবা যখন এই জমিতে সমৃদ্ধতম তেলের খনি খুঁজে পান ও তখন আমাদের তাড়াবার চেষ্টা করে। আজ বাবা নেই, আমি একা।
তখন বিগ টিমের ফিল্ড অফিসে ...
আমরা কুয়ো জ্বালিয়ে দিয়েছি, টিম ... কিন্তু ব্যাটম্যান আর রবিন ওর পক্ষে !
ব্যাটম্যানকে প্রায় খুন করেছিলাম ... কিন্তু ও পালিয়েছে !
কী !
অনেক দিন থেকে ওই সম্পত্তিটা বাগাবার চেষ্টা করছি। দুটো শহুরে বাবুকে ঠাণ্ডা করার মতো ক্ষমতা আমার আছে !
ব্যস, তাই যেন হয়।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গনপতি হিরের চোখ

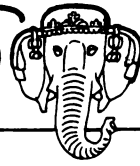

সেই অন্ধকারে শালবনের দিকে তাকিয়ে শুভঙ্কর ভয়ে কাঁপতে লাগল। এই অন্ধকার জঙ্গলে একা-একা ওকে পথ চলতে হবে ? সর্বনাশ।

বুদ্ধু বলল, "বড্ড অন্ধকার। তাই না ? তোমার কাছে টর্চ আছে ?"

শুভঙ্কর বলল, "না। তোমার আছে ?"

"আছে। কিন্তু ব্যাটারি নেই।"

শুভঙ্করের চোখে যেন জল এল। কেন যে ওর এত ভয় তা কে জানে ? যেমন দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বেরিয়েছে তেমনি দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা চলছে। কিন্তু এই অন্ধকারের রাজত্বে ঘন শালবনের ভেতর দিয়ে একা-একা পথ চলা ! এ কি ভাবা যায় ? গা যেন শিউরে ওঠে। তবু ওকে যেতে তো হবেই। একবার ভাবল বুদ্ধুকেই বলে একটু এগিয়ে দিতে। আবার দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবার ভয়ে বলতে লজ্জা করল খুব।

ওর অবস্থা দেখে বুদ্ধুই বলল শেষে, "কী হল ! ভয় করছে ?"

শুভঙ্কর বলল, "না, তা ঠিক নয়। যা অন্ধকার তাতে পথ হারাই যদি ?"

"পথ হারাবার ভয় তো নেই। বাঁ দিকের পথ ভুল হলেই সোজা রেল লাইন। রেল লাইন ধরে বরাবর বাঁ দিকে এগোলে পৌঁছে যাবে ওদের বাড়ি। অন্ধকারে ঠাহর করতে পারবে না অবশ্য।"

শুভঙ্কর বলল, "দেখো, আমার হারিয়ে যাবার বা অন্য কিছুর ভয় নেই। আমি ভয় করি শুধু সাপকে। একে রাত্রিবেলা। তার ওপর কাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও গর্তের জল শুকোয়নি। তুমিই আমাকে একটু এগিয়ে দাও না বুদ্ধুদা ?"

বুদ্ধু খিকখিক করে হেসে বলল, "বুদ্ধুদা ? বেশ বলেছ ভাই। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বুদ্ধু ছাড়া অন্য কিছু বলেনি। তুমি একেবারে দাদা বলে দিলে ? ঠিক আছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।" বলে বুদ্ধু যে ঘর থেকে সাইকেল বার করেছিল, সেই ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে দাওয়ায় শুয়ে থাকা বুড়িকে বলল, "এই মা ! আমার ফিরতে দেরি হলে খেয়ে নিস। বুঝলি ?"

বুড়ি বলল, "কখন ফিরবি তুই ?"

"রাত হবে।"

বুড়ি আর কিছু না বলে চুপচাপ শুয়ে রইল।

বুদ্ধু আর শুভঙ্কর এগিয়ে চলল অন্ধকারে।

যেতে-যেতে শুভঙ্কর বলল, "মউয়ের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল বুঝি ?"

"আরে না না। ওটা একটা মাথা-পাগলি মেয়ে। তবে ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। আর তেমনি বদরাগী !"

"তাই নাকি ? দেখে তো মনে হয় না," এ-কথাটা অবশ্য শুভঙ্কর মিথ্যে করেই বলল। কেননা, মউয়ের রাগের নমুনা প্রথম দর্শনেই যা পেয়েছে তা ভোলার নয়।

বুদ্ধু বলল, "তবুও ওর মতো মেয়ে হয় না।"

কথা বলতে-বলতে ওরা ঘন শালবনের ভেতরে ঢুকল। তারপর বেশ খানিকটা যাবার পর বাঁ দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে বুদ্ধু বলল, "তুমি এই পথটা ধরে সোজা চলে যাও। তা হলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে। বিল্টুদের বাড়ি যাবে তো ?"

"হ্যাঁ। তুমি আর যাবে না ?"

"না। আমি একটু লাইন ধারে যাব। তাসের আড্ডায়। ওখানে খবর দিয়ে একটু পরেই আসছি।"

বুদ্ধু চলে গেল।

আর শুভঙ্কর ? সে সেই শালবনের ঘন অন্ধকারে একা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল ওর মুখ। অন্ধকার রাতে একা শালবনে ওর মনে হল শত-শত প্রেত যেন নেচে-নেচে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তবু নিরুপায় হয়ে সাহসে ভর করে এগোতে লাগল ও। কিরকিরে পোকাগুলো কী বিশ্রীভাবে ডাকছে। ঝিল্লির কলতানে কানে যেন তালা ধরে যায়। আরও কত যে বিচ্ছিরি ডাক কানে এল তার যেন শেষ নেই। ডানা ঝাপটে একটা প্যাঁচা বুঝি উড়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। হঠাৎ ও কী ! কী ওটা ! মূর্তিমান প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কী ভীষণ। কী ভয়ঙ্কর ! ও কি তবে মৃত্যুর দূত ! অগ্নিগোলকের মতো চোখ দুটো জ্বলছে তার। ঘন কালো, আর কী বিশাল। শুভঙ্কর এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল। ও যত পেছোয় সে তত এগোয়। এক সময় দারুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল শুভঙ্কর, আঁ-আ-আঁ। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

।। সাত ।।

জ্ঞান যখন ফিরল তখন ও পুণ্ডরীককাকার ঘরে শুয়ে আছে। চারদিকে তখন অনেক লোকজন। পুলিশও আছে। শুভঙ্কর চোখ মেলেই উঠে বসল। তারপর বলল, "তিন্নি ! তিন্নি কোথায় ? বিল্টুকে পাওয়া গেছে ?"

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "না বাবা। ওদের কাউকেই পাওয়া যায়নি।"

দারোগাবাবু বললেন, "সেই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে না আরও একজনকে।"

শুভঙ্কর বলল, "কাকে ?"

"শশিমাস্টারের মেয়ে মউকে। তোমাকেও পাওয়া যাচ্ছিল না। বহুকষ্টে ওই শালবনের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওখানে তুমি এই রাত দুপুরে কী করতে গিয়েছিলে ? কেউ কি তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?"

শুভঙ্কর বলল, "না। আমি মউয়ের সঙ্গে বুদ্ধুদার বাড়ি গিয়েছিলাম। ও বুদ্ধুদার বাইকটা নিয়ে দুষ্কৃতকারীদের সন্ধানে গেছে। আমি একা এই পথে ফেরার সময় একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখে অজ্ঞান হয়ে যাই।"

"বুঝেছি। তুমি একটা গোরু দেখে ভয় পেয়েছ।"

"গোরু!"

"হ্যাঁ। বিশাল শরীর একটা ষাঁড়। ভয়ঙ্করদর্শন। কাউকে শুঁতোয় না। শুধু ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে। ওরই চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছিল, তাই দেখেই তুমি ভয় পেয়েছ। ওকে তুমি নিশ্চয়ই ভূত বা অন্য কিছু ভেবেছিলে? অচেনা লোকেরা সবাই অন্ধকারে ওকে দেখে ভয় পায়। তা এই রাত্রিবেলা অন্ধকারে তুমি শালবনে ঢুকলে অথচ একটা টর্চ নাওনি কেন? তা হলে তো এ-কাণ্ডটা হত না।"

শুভঙ্কর লজ্জায় মাথা হেঁট করল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। শেষকালে কি না একটা গোরু দেখে ভয় পেল সে?

দারোগাবাবু বললেন, "যাক। এবার আসল কথায় আসি। কীভাবে কী হল সব ঠিক করে আমাকে খুলে বলো তো দেখি? মানে তোমার বন্ধু বিল্টু বা তিন্নিকে ওরা কীভাবে নিয়ে গেল?"

শুভঙ্কর বলল, "কীভাবে নিয়ে গেল তা তো বলতে পারব না।" বলে এক-এক করে সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে। এমনকী সকালে নরসিংগড়ের ঘটনাটাও বলতে ভুল করল না। চেপে গেল শুধু দাদুর ডায়েরি, সোনার গণপতি, ও ওদের কাছ থেকে ছিনতাই করা রিভলভারটার কথা।

দারোগাবাবু সব শুনে যা-যা নোট করবার করে নিয়ে বললেন, "শুনলাম তুমি একজন ডি·এস·পি·সাহেবের ছেলে। তাই বলি বাবা, তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা করবে। কেননা, তুমি নিশ্চয়ই জানো পুলিশের শত্রুর অভাব নেই। বিশেষ করে বঙ্গভূমির লাগোয়া সিংভূমের ক্রিমিনালদের বাংলা পুলিশের ওপর রাগ থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই কার মনে কী আছে কেউ কি বলতে পারে? আর শশিমাস্টারের ওই মেয়েটাকেও সাবধান করে দেবে। ও যেন রাগের মাথায় একা কিছু করতে না যায়। দুষ্টের দমনের জন্য তো আমরা আছি।"

দারোগাবাবুর হিতোপদেশ কান পেতে শুনল শুভঙ্কর। কিন্তু কিছু বলল না।

দারোগাবাবু আবার বললেন, "আমরা ও-বাড়িতে ঢুকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। তোমরা লক্ষ করেছ কি না জানি না। আমরা দেখলাম, একটি ঘরের চার দেওয়ালেরই প্লাস্টার ছাড়ানো হয়েছে। এবং সদ্য। ও ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলতে পারবে?"

শুভঙ্কর অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "কই না তো! সেরকম কিছু তো দেখিনি।"

"বুঝেছি। আসলে দুষ্কৃতীরা কোথাও থেকে কোনও গুজবটুজব শুনে নির্ঘাত গুপ্তধনের আশা করেছে। তাই ছেলেমেয়ে দুটোকে অপহরণ করার পর বাড়িটা যখন ফাঁকা হয়ে যায়, তখনই বোকার মতো এই সব করে পালিয়েছে।"

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "সে যাই করুক, আপনি সার একটু দেখুন, যেন ছেলেমেয়ে দুটো উদ্ধার হয়। বিশেষ করে যখন বোঝাই যাচ্ছে এ-কাজ শিকারি বাজের, তখন যেভাবেই হোক ধরুন ওই শয়তানটাকে।"

দারোগাবাবু বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের দিক থেকে যা-যা করণীয় তা করছি।" বলে চলে গেলেন।

এবার পুণ্ডরীককাকা শুভঙ্করকে বললেন, "কিছু মনে কোরো না বাবা, আজ রাতে এইসব ঘটনার পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিছু তো করা গেল না। করবেটাই-বা কে? দেখছ তো কাকিমার অবস্থা। তা একটু দুধ আর মুড়ি তুমি খেয়ে নাও।"

কাকিমা অতি কষ্টে বললেন, "ও ঘরের তাকে দুটো কলা আছে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি কিচ্ছু খাব না। একে অবেলায় খেয়েছি, তার ওপর যা-সব ঝড়ঝাপটা গেল, তাতে একদম খিদে নেই আমার। আপনি বরং আমাকে ওপরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসুন।"

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "না না। ও-বাড়িতে একদম নয়। তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো।"

"তা হয় না কাকাবাবু। আমাদের কয়েকটা দামি জিনিস ওপরের ঘরে রয়ে গেছে। ঘরটাকে পাহারা দিতে হবে না? তা ছাড়া আমি জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর থাকব। সেরকম বিপদ কিছু বুঝলে ঘর থেকে না বেরিয়ে চেঁচাতে তো পারব। আপনারা বরং একটু সজাগ থাকবেন। আপনি শুধু বিল্টুর টর্চটা ব্যাগ থেকে বার করে আমার হাতে দিন।"

পুণ্ডরীককাকা তাই করলেন। একটা প্লাস্টিকের জাগে করে খাবার জল নিয়ে টর্চ হাতে শুভঙ্করকে দিতে চললেন ওপরের ঘরে। আলো জ্বালবার জন্য একটা দেশলাই দিতেও ভুললেন না।

ওপরের ঘরে একা থাকার ব্যাপারে শুভঙ্করের ভয় যে করছিল না তা নয়। কিন্তু উপায় নেই। একে তো ওই বহুমূল্য ধাতব বিগ্রহকে পাহারা দেওয়ার ব্যাপার আছে, তার ওপর আছে মউয়ের প্রত্যাশা। মেয়েটা যদি সত্যি-সত্যিই এসে হাজির হয় রাত দুপুরে, তা হলে? ওকে না পেয়ে ফিরে যাবে বেচারি। আর যা বদরাগী মেয়ে ও, তাতে হয়তো ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়বে। তা ছাড়া আজকের এই শোকাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে নীচে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

পুণ্ডরীককাকা শুভঙ্করের ওপরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আলো জ্বেলে বিদায় নিলেন। ফুলের গন্ধে ঘরের ভেতরটা রমরম করছে। পুণ্ডরীককাকা যাবার আগে বলে গেলেন, "কোনও অসুবিধে হলে চেঁচিয়ে ডেকো। আর দরজায় কেউ ধাক্কা দিলে সাড়া না নিয়ে দরজা খুলো না।"

শুভঙ্কর বলল, "তাই করব।" বলে জানালা বন্ধ করে দরজায় খিল দিল। তারপর ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বালিশের তলায় হাত দিয়েই চমকে উঠল। সর্বনাশ। রিভলভারটা তো এখানেই ছিল। গেল কোথায় সেটা? তবে কি পুলিশের লোকেরা যখন ঘরে ঢোকে তখন ওরাই ঘর সার্চ করতে গিয়ে হস্তগত করে? কিন্তু তা যদি হত তা হলে নিশ্চয়ই সে-কথা বলত ওকে। এবং এই রিভলভার কীভাবে ওর হস্তগত হল সে প্রসঙ্গে কিছু-না-কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করত। তা হলে? তা হলে পুলিশ ছাড়া কি দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির পদার্পণ ঘটেছিল এই ঘরে? শুধু যে রিভলভারটা খোয়া গেছে তা নয়। সেই সঙ্গে আবার গায়েব হয়েছে দাদুর ডায়েরিটা। ওটা তো সযত্নে টেবিলের ওপর রাখা ছিল। কে নিল? শুভঙ্করের চোখে যেন জল এল। শিকারি বাজের লোকেরা যে ওদের অনুপস্থিতিতে এ-ঘরে এসেছে এবং তারাই যে নিয়ে গেছে ওগুলো, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। ক্ষোভে-দুঃখে এবং ভয়ঙ্কর রাগে অস্থির হয়ে বিছানার ওপর শুয়ে দু'হাতে বালিশটাকে টিপে ধরে তাতে মুখ গুঁজল শুভঙ্কর। ও ঠিক করল আজ রাতে মউ যদি সত্যিই ফিরে আসে, তা হলে ওর সঙ্গে আলোচনা করে এবং কালকের মধ্যে বিল্টু ও তিন্নিকে পাওয়া না গেলে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে ও। তারপর বাবার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে বাবার হস্তক্ষেপ চাইবে। সোনার গণপতি উদ্ধার হোক না হোক, তাতে ওর কিছু আসে যায় না। বিল্টু আর তিন্নিকে উদ্ধার করাটাই ওর একমাত্র কাজ। তার পরের কাজ হল শিকারি বাজকে দলবল সমেত গ্রেফতার করানো।

সোনার গণপতির কথা মনে হতেই একটা অন্য আশঙ্কা দেখা দিল ওর মনের মধ্যে। দুর্বৃত্তরা দাদুর ছবিটা খুলে পিছনের সঙ্কেত দেখে ফেলেনি তো? অথবা ওখান থেকে উদ্ধার করেনি তো গণপতি বিগ্রহকে? মনে হওয়া মাত্রই ছবির কাছে ছুটে গেল শুভঙ্কর। গিয়ে

দেখল, না। ওর আশঙ্কা অমূলক। ছবিটা সরিয়ে সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নও দেখতে পেল। ফুলের মালাগুলো মেঝেয় পড়েছিল। সেখান থেকে তুলে টেবিলের ওপর রখল ও। হঠাৎই ওর মনে হল, একা ঘরে সময় তো ওর কাটবে না। এইবেলা দেওয়াল ভেঙে মূর্তিটাকে বার করে রাখলে কেমন হয়? শিকারি বাজের আজ রাতে পুনরাবির্ভাবের আর কোনও আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। যদিও আসে ওরা, এ-দরজা শুভঙ্কর খুলবে না কিছুতেই। কাজেই আজ রাতে মূর্তি আবিষ্কার হলেও শিকারি বাজের হাতে পড়ার কোনও আশঙ্কা নেই।

শুভঙ্কর এক পা দু'পা করে ছবির কাছে এগোল। ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নামিয়ে এক পাশে রাখল। তারপর বাশুলিটা হাতে নিয়ে দেওয়ালের কাছে যেতেই এক অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল ওর। ছবিটা আবার যথাস্থানে রেখে বিছানায় এসে বসল। তারপর বালিশে মাথা রেখে অনন্ত প্রতীক্ষা করল মউয়ের জন্য। এক সময় ঘুমে দু' চোখ বুজে এল ওর। সে কী গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল শুভঙ্কর তা ও নিজেও টের পেল না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। কাক ডাকছে। পাখি ডাকছে। কিন্তু মউ? মউ কোথায়? মউ তো এল না। তবে কি ওর কোনও বিপদ হয়েছে? ঘরে তালা দিয়ে নীচে এল শুভঙ্কর।

পুণ্ডরীককাকা রাত-জাগা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শশিমাস্টারের মেয়ের খবর শুনেছ?"

শুভঙ্কর ভয়ে-ভয়ে বলল, "না। আমি তো এই সবে নীচে নামছি।"

"কাল রাতে ও একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছে।"

"তাই নাকি?"

"সুবর্ণরেখা নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়েছিল ও। সারা শরীর কেটেকুটে একশা হয়েছে। মাথাটাও ফেটেছে বুঝি। ওইটুকু মেয়ে অতখানি একটা ভারী জিনিস সামলাতে পারে কখনও?"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? ভাগ্যিস পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছিল তাই রক্ষে। ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে বাড়িতে।

"বাইকটা ঠিক আছে?"

"হয়তো আছে। অত আর জিজ্ঞেস করিনি কাউকে। আমারই এখন মনমেজাজের ঠিক নেই।"

"আমি একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই কাকাবাবু।"

"বেশ তো, যাও। বেশি দূরে নয়। সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি কয়েকটা বাড়ির পরেই যাকে জিজ্ঞেস করবে সে-ই বলে দেবে।"

শুভঙ্কর যাচ্ছিল।

পুণ্ডরীককাকা ডাকলেন, "শোনো!"

ফিরে তাকাল শুভঙ্কর। কাছে এসে বলল, "বলুন।"

"যদি কিছু মনে না করো, তোমাকে একটা কথা বলব আমি।"

"কিচ্ছু মনে করব না। বলুন আপনি।"

"এই তো দেখছ তুমি এখানকার অবস্থা। তোমার কোনওরকম আদর-যত্ন আমরা করতে পারছি না। তাই বলি কি বাবা, তুমি বরং দুপুরের ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাও। না হলে এখানকার যা পরিস্থিতি, তাতে যে-কোনও মুহূর্তে তোমারও একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তুমি বরং ফিরে গিয়ে বিল্টুর বাড়িতে একটা খবর দাও। আর পারো তো তোমার বাবাকেও সব কথা খুলে বোলো। যদিও এই এলাকা তাঁর আওতার বাইরে, তবুও তিনি একজন পদস্থ অফিসার তো। তাঁর সুপারিশের জোরেও হয়তো অনেক কিছু হতে পারে।"

"ও-ব্যাপারে আমিও মনে মনে ভেবে রেখেছি। অবশ্য আজই আমার যাওয়া হবে কি না জানি না, তবে আজ না হলে কাল আমি যাচ্ছিই। বিল্টু আর তিন্নির ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওদের আমি উদ্ধার করবই।"

"পারবে তো?"

"আজকের দিনটা দেখি, এখানকার পুলিশ কী করে। তারপর কাল আমি বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।"

"নিশ্চিন্ত হলাম। ওই আমার একটি মাত্র মেয়ে। ওকে আমার বুকে আবার ফিরিয়ে এনে দাও বাবা।"

শুভঙ্কর দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হল। তারপর একা-একাই মউদের বাড়িতে এসে হাজির হল ও।

মউ তখন ওদের ঘরের ভেতর তক্তাপোশের বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। ওর হাতে-পায়ে, কাঁধে লাল ওষুধের দাগ। গাথায় ব্যাণ্ডেজ। দু'-একজন প্রতিবেশী খুব বকাবকি করছেন মউকে।

শুভঙ্কর ওদের ঘরে গিয়ে ওর ওই অবস্থা দেখেই বলল, "কী ব্যাপার মউ! খুব জোর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে শুনলাম?"

মউ হেসে বলল, "খুব জোর আবার কোথায়? সেরকম হলে তো হাসপাতালে থাকতাম।"

মা বললেন, "ছেলেটি কে?"

"শুভঙ্কর। তুমি চিনবে না।"

"ও বুঝেছি। কিটুর সঙ্গে যে এসেছে?" বলেই শুভঙ্করকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন, "বোসো বাবা।"

শুভঙ্কর বসল। তারপর বলল, কীভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটল শুনি?"

মউ বলল, "আসলে অন্ধকারে একটু উঁচু-নীচু জায়গায় টাল সামলাতে না পেরে উলটে গেছি। তবে আমার এইসব ব্যাণ্ডেজ-ফ্যাণ্ডেজ দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সামান্য একটু কেটে-ছিঁড়ে গেছে। শুধু কপালটায় জোর লেগেছে। মাথা ফাটেনি কী ভাগ্যি। একটু ডিপ হয়ে কেটে গেছে এই যা। ইনজেকশান নিয়েছি। ওষুধ খাব। সব ঠিক হয়ে যাবে। এসব আমার কাছে নতুন কিছু নয়।"

শুভঙ্কর বলল, "মোটর বাইকটা? সেটা ঠিক আছে তো?"

"আছে। তবে বুদ্ধুটার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। নতুন বাইক ওর। কিছুতেই দেবে না। কীভাবে ওর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি তুমি তো জানো?"

"বাইকটা কোথায়?"

"খবর পেয়ে বুদ্ধুই এসে নিয়ে গেছে।"

"রাগ করেনি তো?"

"করলেই বা কী করা যাবে? এবার বলো দেখি তুমি আমার ওপর রাগ করেছ কি না? কাল রাতে আসব বলে এলাম না। সারারাত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করেছ নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম।"

মউ হেসে বলল, "বেশ করেছ।" তারপর বলল, "ও বাড়িতে চা-টা তো কিছু খাওয়া হয়নি?"

"না, তা হয়নি। তবে খাবার ইচ্ছেও নেই।"

"বাজে কথা ছাড়ো। সকালবেলা একটু চা না খেলে হয়?" বলে মাকে শুভঙ্করের জন্য একটু চা করতে বলল মউ। তারপর বলল, "জানো তো মা, শুভঙ্করের বাবা পুলিশের একজন বড় অফিসার। এরা এখানে কিছু করতে না পারলে আমি ওর বাবার সঙ্গে দেখা করব। এই শয়তান শিকারি বাজকে ফাঁসির মঞ্চে আমি তুলবই।"

মা সে কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে চোখের জল মুছে চা করতে বসলেন।

মউ বলল, "আমি দুপুরবেলা তোমার ওখানে যাব। কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে। আর ওদের ফিরে আসার অপেক্ষা না করে এই জিনিটাকেও ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। কাল সন্ধের পর ঘর খোলা রেখে আমি যখন তোমার সঙ্গে বেরিয়ে ছিলাম সেই ফাঁকে ওরা এসে দাদুর ডায়েরি এবং রিভলভারটা চুরি করে নিয়ে গেছে।"

মউ যেন শিউরে উঠল কথাটা শুনে, "সে কী!"

"হ্যাঁ। কাজেই ওই মূর্তির ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে এবার।"

মা এসে চা দিলেন। (ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

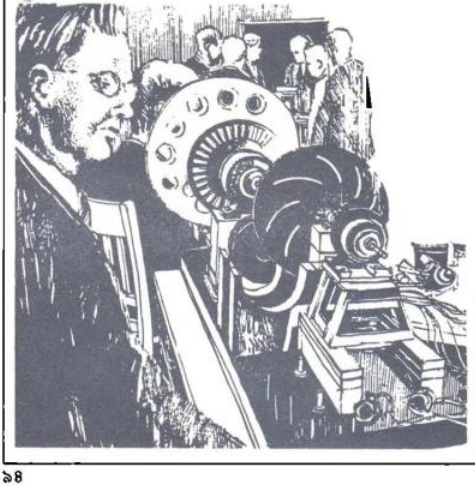

টেলিভিশনে সম্প্রচারিত ছবি

টেলিভিশনে প্রথম সরাসরি ছবি দেখানো হয় ১৯২৬ সালের ২৭ জানুয়ারি, লন্ডনের ফ্রিথ স্ট্রিটের ছোট্ট একটি ঘরে। প্রদর্শক ছিলেন স্কটিশ উদ্ভাবক জন লোগি বেয়ার্ড।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের প্রতিষ্ঠান রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের চল্লিশ জনেরও বেশি সদস্য একে-একে ছোট একটি কম্পমান পরদায় দেখলেন পাশের ঘরে ক্যামেরার সামনে উপবিষ্ট একটি ছেলেকে।

তিন বছর আগে বেয়ার্ড সর্বপ্রথম টেলিভিশন ছবি তৈরি করেন। ছবিটি ছিল ছোট একটি ক্রুসচিহ্নের ছায়া। সাসেক্স-এর হেস্টিংস-এ অস্থায়ী একটি পরীক্ষাগারের মধ্যে কয়েক ফুট দূরে ছবিটি সম্প্রচারিত হয়।

এই পরীক্ষাগারে সামান্য একটি বিস্ফোরণ হলে বাড়িওয়ালা ভয় পেয়ে বেয়ার্ডকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবার পরে পৃষ্ঠপোষকের অভাব এবং দারিদ্র্য সত্ত্বেও বেয়ার্ড জয়ী হলেন। তাঁর যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছিল সাধারণ টুকিটাকি সরঞ্জামকে পরিবর্তিত করে এবং জোড়াতালি দিয়ে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিল না।

সম্প্রচারের জন্য ছবি বিশ্লেষণের যে-যান্ত্রিক পদ্ধতি বেয়ার্ড গ্রহণ করেছিলেন, অচিরেই তা পরিত্যক্ত হয়ে তার বদলে এক প্রতিদ্বন্দ্বী বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

হাসান-হাওয়া

কুয়েত, সৌদি আরব, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ··· সমস্ত এশিয়া মহাদেশ জুড়ে এখন তীব্র, ঝোড়ো হাসান-হাওয়া। গ্রামেগঞ্জে, অলিতে-গলিতে শীত-গ্রীষ্মের পরোয়া না করে সব সময়ই বেজে চলেছে, 'হাওয়া হাওয়া এ হাওয়া খুশবু লুটা দে···'। এই হাওয়ার স্রষ্টা ২৪ বছরের পাকিস্তানি যুবক **হাসান জাহাঙ্গির**।

পপ সঙ্গীতে এক নম্বর হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন হাসান সেই ছেলেবেলা থেকেই।

সময়টা সত্তরের দশক। পাকিস্তানে তখন প্রথম পপ-প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে। হাসান টি ভি-সেটের সামনে বসে চমকে গেলেন। আলমগির! আলমগিরই পাকিস্তানে প্রথম পপ সঙ্গীত নিয়ে আসেন। আলমগিরের গান তো হাসান কতদিন মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন। টি ভির পরদায় সেই আলমগির। তাঁরই মতো রোগা। দু'জনের অঙ্গভঙ্গি, চেহারা, মুখের হাব-ভাবে অদ্ভুত মিল! স্কুলের বন্ধুরা ওইজন্যই তার সঙ্গে রসিকতা করত। বুদ্ধিমান হাসান আলমগিরকে মনে মনে পছন্দ করলেও সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর ভঙ্গি নকল করবেন না।

চুলের স্টাইল, পোশাক, পারফরম্যান্স, প্রেজেন্টেশনের কায়দা সব কিছুতেই হাসান নিজেকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে নিলেন। গানের ভাষা এবং ভঙ্গিতেও নিজেকে করে তুললেন আলাদা। প্রথম রেকর্ড বেরোল ১৯৮৪ সালে—'ইমরান খান ইজ আ সুপারম্যান।' পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ স্পোর্টসম্যানের প্রতি এক তরুণ গায়কের শ্রদ্ধাঞ্জলি! তরুণ প্রজন্ম যে এই তরুণ গায়কের 'ফ্যান' হয়ে উঠবে, আশ্চর্য কী। প্রথম রেকর্ড-ই সুপারহিট!

৮৬-তে বের হল হাসানের দ্বিতীয় অ্যালবাম 'ডিসকো বারবারেলা'।

সমস্ত তরুণ প্রজন্মকে মাতিয়ে তুলল ডিসকো বারবারেলা।' 'হাওয়া হাওয়া'-র অনুকরণে তৈরি হল সিন্ধি, পঞ্জাবি, বালুচি এবং উর্দু গান। 'হাওয়া হাওয়া'-র অনুসরণে ভারতে তৈরি হল আটটা হিন্দি সিনেমার গান, তিনটে অ্যাডফিল্মের গান! পাকিস্তানেও খানপাঁচেক সিনেমার গানে দেখা গেল 'হাওয়া হাওয়া'-র প্রভাব। বেনজির ভুট্টোর নির্বাচনী সঙ্গীতের সুরও দেওয়া হল 'হাওয়া হাওয়া'-র আদলে। এবং 'হাওয়া হাওয়া'-ই এই উপমহাদেশের প্রথম পপ গান, যা ইংরেজিতে নকল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ইউরোপ এবং ব্রিটেনে!

আলিশা চিনাই

ওঁর নাম **আলিশা চিনাই**, যদিও কেউ কেউ বেবি-ডল বলেও ডেকে থাকেন। আলিশার গাওয়া **মাডোনার** গান শুনে স্বয়ং ম্যাডোনাও বলেছেন, মনে হয় যেন হুবহু তাঁর নিজেরই কণ্ঠস্বর। অথচ আলিশা আসলে গুজরাতের মেয়ে, এবং তাঁর আসল নামটি নাকি আলিশাও নয়। এমনকী, তিনি যে এত জনপ্রিয় আধুনিক গানের শিল্পী হবেন সেটা আলিশা নিজেও ভাবেননি। ইচ্ছে ছিল মডেলিং করার। আগে তাই মাঝে-মাঝে বিভিন্ন অডিও-ভিসুয়াল বিজ্ঞাপনে তাঁকে দেখাও যেত। তাঁর যে এমন গানের গলা সেটাও কেউ জানতেন না। কিন্তু বোম্বাইয়ে 'এভিটা' নাটকটিতে একটি ছোট ভূমিকায় তাঁকে গান গাইতে হয়। এবং নাটক দেখতে উপস্থিত ছিলেন রেকর্ড কোম্পানির কিছু কর্তাব্যক্তি। তাঁরা নাটকের চেয়েও আলিশার গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রেকর্ড করার আহ্বান জানান। ব্যস, সেই থেকেই শুরু হয়ে গেল এই নতুন পেশা, এবং ভারতের অন্য সমস্ত পপ গায়িকাকে টেক্কা মেরে আলিশা আজ আধুনিক গানের জগতের শীর্ষে।

বিশাখা ঘোষ

লুঠা মাহাতো

উনিশতম বিশ্ব চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ভারতকে একমাত্র পদক এনে দিয়েছে গ্রিনপার্ক শিক্ষাসদন-এর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র **লুঠা মাহাতো**। তার আঁকা, 'গোট স্যাক্রিফাইস' রুপোর পদক পেয়েছে।

বিশ্ব চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা হল ছয় থেকে ষোলো বছর বয়সী স্কুল-ছাত্রছাত্রীদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় উদ্যোক্তা দেশ ছিল রিপাবলিক অব চায়না বা তাইওয়ান। সারা পৃথিবীতে ষাটটিরও বেশি দেশের থেকে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল।

লুঠাদের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে লুঠাই বড়। ওর বাবা বুধুওয়া মাহাতো শ্রমিক। লুঠাদের বাড়ি থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন হাঁটাপথে মাত্র দশ মিনিটের রাস্তা। লুঠা সেখানে বেড়াতে যেত। মিশনের এক মহারাজের চেষ্টায় লুঠা আশ্রমের শ্রীরামভবনে থাকার সুযোগ পায়।

মিশনের স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পড়াশোনা করে লুঠা ভর্তি হয় গ্রিনপার্ক স্কুলে। স্কুল বদলে গেল, কিন্তু নেশাটা বদলাল না। ছবি আঁকার নেশা! মিশনের যোগানন্দ ভবনে থাকার সময় লুঠা সংবাদপত্রে প্রকাশিত ফোটোগ্রাফ দেখে দেখে ছবি আঁকত। ওর ধারণা, ওগুলো সব আঁকা ছবি!

নিজের চেষ্টাতেই লুঠা শিখেছে ছবি আঁকা, নিজের চেষ্টাতেই প্রমাণ করেছে তার প্রতিভা।

প্রবীর ঘোষ

ধাঁধা

খেয়া পারাপারের সহজ ধাঁধাটা গতবার শুনেছি। ছোটকা বলেছিল, পরে একটা আরও মজার আরও দুরূহ ধাঁধা শোনাবে। সেই ধাঁধাটা নিতেই এসেছি ছোটকার ঘরে। ছোট্‌কারও মনে ছিল কথাটা। তাই কোনওরকম ভণিতা না করেই বলল, "এবারেরটা মজা এই কারণে যে, এতে রাক্ষসের চরিত্র আছে। আর, রামায়ণের কল্যাণে এখন রাক্ষসদের অস্তিত্বে সবাই বিশ্বাস করছে।" আমি জবাবে কী বলতে পারি ছোটকা যেন আগেই অনুমান করে রেখেছে। তাই জবাবের অপেক্ষা না করেই বলল, "বাস্তবে না হোক, গল্পে এখন রাক্ষস চলতে পারে। সে যাক, আমাদের ধাঁধার ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখা দরকার তা হল, দু'জন রাক্ষস একজন সন্ন্যাসীকে আলাদাভাবে পেলে আক্রমণ করবে। কিন্তু একজন রাক্ষস ও একজন সন্ন্যাসী— অর্থাৎ রাক্ষস

ও সন্ন্যাসী সংখ্যায় যখন সমান-সমান— এমন ক্ষেত্রে, সে-ভয় নেই। এবার ধাঁধাটা বলি।
তিনজন সন্ন্যাসী ও তিনটি রাক্ষস নদীপারে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকোয় চেপে তারা ওপারে যাবে। নৌকোটায় মাঝি নেই। নিজেরাই চালিয়ে এপার-ওপার করবে। আর যাতায়াতের জন্য নৌকোয় এক-একবারে বড়জোর দু'জন যাত্রী উঠতে পারে। এই তিনজন সন্ন্যাসী ও তিনজন রাক্ষস কীভাবে নৌকো চেপে ওপারে যাবে? মনে রেখো, কখনও যেন রাক্ষসের সংখ্যা সন্ন্যাসীর সংখ্যার থেকে বেশি হবার সুযোগ না থাকে। কি এপারে, কি ওপারে। এবার বলো, ক'বারে পার হবে, কীভাবে পার হবে? এটাই এবারের **প্রথম ধাঁধা**।"

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বাংলায় কোন্ পদবি শিবের অনুচর?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ দুটো সংখ্যা। যোগ করলে এক ডজন। অথচ পাশাপাশি লিখলে নানারকম। সংখ্যা দুটো কী কী?

গতবারের উত্তর ॥ (১) প্রথমে ওপারে যাবে দুই ছেলে। একজন ওপারে থেকে যাবে, অন্যজন নৌকো নিয়ে ফিরে আসবে এপারে। এবার এপার থেকে বাবা একলা যাবেন ওপারে। তিনি ওপারে থেকে যাবেন। ওপারে থেকে-যাওয়া ছেলেটি নৌকো নিয়ে এপারে আসবে। এবার দুই ভাই একসঙ্গে ওপারে চলে যাবে। (২) $\frac{১৪৮}{২৯৬}+\frac{৩৫}{৭০}=১$। (৩) টেবিল। অন্য সবক'টাই বসার।

সত্যসন্ধ

কত কথা

প্রতীপ মানে বিপরীত বা প্রতিকূল, আবার মহাভারতে শান্তনুর পিতা ও ভীষ্মের পিতামহের নামও প্রতীপ। এই শব্দটির একটিমাত্র অক্ষর পালটে অন্য একটি শব্দ বানাতে হবে। শুধু বানালেই চলবে না, দুটো শব্দই যেন অন্ত্যমিলযুক্ত হয়। যেমন,

'প্রতীপ'-এর প কেটে ক বসিয়ে যদি তুমি 'প্রতীক' কর তা হলে কিন্তু হবে না, কারণ প্রতীপ আর প্রতীক সমিল শব্দ নয়। আরও দুটি শব্দ 'খদ্যোত' ও 'সরণি'—এ-দুটিকেও একই শর্তে অক্ষর পালটে অন্য শব্দ বানাও।

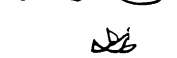

২। 'উপলক্ষণ' শব্দটির মধ্যে পর-পর মোট ক'টি শব্দ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে?
৩। 'বনমানুষ' না লিখে যদি 'বনমানব' লেখা যায় তবে কী হবে?

মজার খেলা

না এবার আর কাঠির খেলা নয়। নয় পয়সার খেলা। কাগজ-কলম নিয়ে খেলতে হয়, এমন কোনও খেলাও নয়। একেবারে কোনও প্রস্তুতি ছাড়া, কোনও উপকরণ ছাড়া যেসব মজার খেলা রয়েছে, তার থেকেই কয়েকটা খেলা শিখব এবার। অনেকেই হয়তো জানে এসব খেলা, সেক্ষেত্রে বলব, এসো, ঝালিয়ে নিই। এটা তো ঠিকই যে, মজার খেলার কোনও সময়-অসময় নেই। বন্ধুদের বোকা বানিয়ে আনন্দ পাওয়া, এর কি কোনও বিশেষ সময় রয়েছে? দেখা হলেই মনে হয়, মজা করি একটু। তাই তার জন্যও খেলা জানা চাই।
তো, কী ধরনের মজা হতে পারে এসব ক্ষেত্রে? একটা সহজ উদাহরণ দিই। ধরো, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল। আড্ডা চলছে। চলতে-চলতে হঠাৎ কেমন একঘেয়েমি এসে গেছে। সেইরকম একটা সময়ে তুমি করলে কী, খুব নিরীহ মুখ করে বন্ধুদের সামনে তুলে ধরলে, সহজ ও মজার একটা প্রশ্ন। প্রায় ধাঁধার মতোই ধাঁধিয়ে দেওয়া একটা প্রশ্ন।
কী প্রশ্ন?
বেশ তো, তুমি জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা বলো তো, ডান হাত দিয়ে ছুঁতে পারি অথচ বাঁ হাত দিয়ে ছুঁতে পারি না, এমন কী জিনিস এই ঘরে রয়েছে?' খেলাটা যদি ঘরের মধ্যে না হয়ে বাইরে কোথাও হয়, তা হলে অবশ্য 'এই ঘরে' শব্দ দুটি বলবে না। সেক্ষেত্রে বলবে, 'আমাদের চারপাশে রয়েছে।'
প্রশ্নটা শুনে বন্ধুরা দেখবে কেমন সন্ধানী চোখে চারপাশে সেই অদ্ভুত জিনিসটি খুঁজে বেড়াচ্ছে, যা কিনা ডান হাতের নাগালে অথচ বাঁ হাতের নয়। প্রশ্নটা শুনে তোমার চারপাশে খুঁজে বেড়াচ্ছ সেই অদ্ভুত বস্তু? অত খুঁজে লাভ নেই। নিজের বাঁ কুইয়ের কথা ভাবো না! ভাবলেই দেখবে, ডান হাত দিয়ে সেটা ছোঁওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বাঁ হাতে? নৈব নৈব চ।

মজারু

কথক

উত্তর : ১। প্রতীপ (প্রদীপ), খদ্যোত (প্রদ্যোত), সরণি, (অরণি)। ২। উপল, পল, লক্ষ, লক্ষণ, ক্ষণ—মোট পাঁচটি শব্দ। ৩। 'বনমানব' শব্দটি উলটো দিক থেকেও পড়া যাবে।

ধাঁধানো ছবি

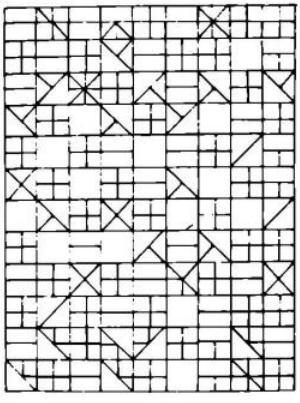

এবারের ছবিটির মজা একেবারে অন্যরকম। ছবিটির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র এবং ত্রিভুজ। গুনে বলতে হবে ক'টি বর্গক্ষেত্র, ক'টি আয়তক্ষেত্র এবং ক'টি ত্রিভুজ আছে।

উত্তর : ১৭২টি বর্গক্ষেত্র, ৪৮টি আয়তক্ষেত্র এবং ১০৮টি ত্রিভুজ।

চিত্রক

হাসিখুশি

পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। দুটি অল্পবয়সী মেয়ের কথোপকথন শোনা গেল। একজন জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তুই অঙ্কে কত পেয়েছিস ?" সে বলল, "৬৮।"
"এঃ মা, মাত্র ৬৮ ? আমি পেয়েছি ১৩।"

ছোট্ট রাজু কাঁদতে-কাঁদতে দৌড়ে এল তার মা'র কাছে। মা তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন তার কী হয়েছে। রাজু কাঁদতে কাঁদতে, "বাবা দেওয়ালের গায়ে একটা ছবি টাঙাচ্ছিলেন, সেটা টাঙাতে গিয়ে বাবার গায়ের উপর পড়ে গেল।"
রাজুর মা আশ্চর্য হয়ে বললেন,

"এতে তোমার কাঁদবার কী হল তা তো বুঝছি না, বরঞ্চ তোমার তো হাসা উচিত।"
রাজু উত্তর দিল, "আমি তো হেসেই ছিলাম মা।"

বাবু : "দ্যাখো মা, ওই ভদ্রলোকের মাথায় একটাও চুল নেই।"
মা : "চুপ, উনি শুনতে পাবেন।"
বাবু : "উনি কি সেকথা জানেন না ?"

মজার খবর

দক্ষিণ মেক্সিকোয় ছেলেমেয়েরা কুকুর বেড়ালের মতো সাপও পোষে। সাপের সঙ্গে খেলা করে। এই সাপেরা নিরামিষাশী। এদের বিষ নেই। স্বভাবচরিত্র এত ভাল যে, ওদের দেখলেই পুষতে ইচ্ছে করে।

জাপানের ছোট-ছোট দ্বীপে যানবাহনের কাজ করে রনপা। এইসব দ্বীপের লোকেরা রনপার সাহায্যে অল্প জলের ওপর দিয়ে, এক দ্বীপ থেকে আর-এক দ্বীপে যাতায়াত করে। এমনকী, ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরাও পাশের দ্বীপের কোনও স্কুলে যেতে হলে রনপা চেপে স্কুলে যায়।

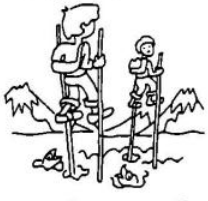

বেলজিয়ামের এক কারিগর একটা মজার সাইকেল তৈরি করেছিলেন। সেই সাইকেলে একসঙ্গে পঁয়ত্রিশজন চড়তে পারে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হয়, যেন একটা ট্রয় ট্রেন চলেছে। পাশকাটাতে বা বাঁক নিতে এই সাইকেলের অসুবিধা হয় না।

হরকরা

আঁকিবুকি

অনেক মজা

এবার দ্যাখো ত্রিভুজ এবং বৃত্ত দিয়ে আঁকার পাতায় ফুটে উঠেছে একাধিক জন্তু। তোমরাও তোমাদের মতো আঁকতে পারো চেষ্টা করলে। অনেক মজাও পাবে।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কম্পিউটার নিয়ে দারুণ বই

হাতে কলমে কম্পিউটার ও বেসিক প্রোগ্রামিং
প্রমথেশ দাস ও অনীশ দেব
শৈবা গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা-৭৩
২৫ টাকা

এই বইটি আদ্যোপান্ত শেষ করে প্রথমেই মনে হল, বইটি অনেক আগে প্রকাশিত হওয়ার দরকার ছিল। 'বেসিক' ভাষায় কম্পিউটার প্রোগ্রামিং নিয়ে ইতিমধ্যে সেমুর হার্শ, রজার হান্ট প্রমুখের বই বেরিয়ে গেছে, কোনও-কোনওটি ইতিমধ্যেই স্কুল-পাঠ্য হিসেবে রীতিমত পরিচিত, দিল্লি ও বম্বে থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর উপর অনেক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বভাবতই বাংলা ভাষায় এই জাতীয় বইয়ের প্রয়োজন আছে।
এই বইয়ের দু'জন লেখকই 'ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারস্ (ইন্ডিয়া)'-এর সভ্য, দু'জনেই ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস লিমিটেড-এর ইনস্ট্রুমেন্টেশন বিভাগে এঞ্জিনিয়ার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে এঁরা স্বচ্ছন্দ ও অনায়াস ভঙ্গিতে বইটি লিখেছেন।
সমগ্র বইটির সর্বমোট সাতটি অধ্যায়। কম্পিউটারের ইতিহাস থেকে শুরু করে বাইনারি সংখ্যাপদ্ধতি, প্রোগ্রামিং, ফ্লো-চার্ট, লাইব্রেরি ফাংশান, সিস্টেম কমান্ড— সবকিছু সম্পর্কে সহজ ভাষায় একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে, কিছু প্রোগ্রামিং করেও দেখানো হয়েছে। বইয়ের গদ্য অত্যন্ত ঝরঝরে ও সাবলীল। এই জাতীয় গদ্য সহজে পাঠককে কম্পিউটারের প্রতি আকৃষ্ট করবে। অনীশবাবু ও প্রমথেশবাবু ফ্লপি ডিস্ককে ফ্লপি ডিস্কই বলেছেন, রিড-রাইট হেড টেপকে রিড-রাইট হেড টেপই বলেছেন। অনর্থক একটি জটিল বাংলা পরিভাষা দেবার চেষ্টা করেননি। এতে পাঠকের সুবিধাই হয়েছে। বইটি পড়তে পড়তে স্বচ্ছন্দে তাঁরা কম্পিউটার ব্যবহারের চেষ্টা করে ফেলবেন।
এঁরা এই বইতে কম্পিউটারের ইতিহাস বলতে গিয়ে সুয়ান পান, সোরোবান, স্কেটি ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। তারপর চার্লস ব্যাবেজ হয়ে চলে এসেছেন 'হার্ভার্ড মার্ক ওয়ান' ও 'ইনিয়াক' কম্পিউটারে। ওঁরা দু-এক কথায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাটা একটু বললেন না কেন ? আধুনিক কম্পিউটার নিয়ে এত গবেষণা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার 'ইনিয়াক' ১৯৪৬ সালে তৈরি হলেও কিন্তু তার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৪২ সালে, ইউ.এস.আর্মি অর্ডন্যান্স ডিপার্টমেন্টের ব্যালিস্টিক রিসার্চ ল্যাবরেটরির সহায়তায়।
কম্পিউটার জেনারেশনকে এঁরা পাঁচভাগে ভাগ করেছেন ঠিকই কিন্তু, উদাহরণগুলি দিলে পাঠকের একটু সুবিধা হত। যেমন, ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারের উদাহরণ IBM 701, সেকেন্ড জেনারেশনের উদাহরণ IBM 700, থার্ড জেনারেশনের উদাহরণ IBM 360 ইত্যাদি। আজকাল তো পার্সোনাল কম্পিউটার হিসেবে IBM আর apple-ই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়!

গৌতম চক্রবর্তী

তবলা শেখার বই

তবলার সহজ পাঠ (প্রথম ভাগ)
প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিবেশক : নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা
২৪ টাকা

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে তবলার নিবিড় সম্পর্ক। না হলে আহমদ জান থেরাকুয়া, কণ্ঠে মহারাজ, শামতাপ্রসাদ, হিরু গাঙ্গুলি, কেরামতুল্লা, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখ তবলার জাদুকরদের এত খ্যাতি হত না।
এই তবলা-শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে আজ পর্যন্ত কম লেখালেখি হয়নি এবং বইও কম

বেরোয়নি। তবলার যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ব্যাকরণ আছে, সেটাও স্বীকৃত। তবে এ-ক্ষেত্রে এতকাল যে অভাবটি থেকেই গিয়েছিল, সেই ক্রিয়াত্মক বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত তবলা শিক্ষার ওপর সার্থক কাজ করলেন ডঃ প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'তবলার সহজ পাঠ' বইটিতে। এটি প্রথম ভাগ। তবলা-শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত দিকটি তুলে ধরে বিদেশের সেলফ-টিউটর পদ্ধতিতে লেখা বইটি।
প্রাথমিক স্তর থেকে সারা ভারতে স্বীকৃত বিভিন্ন সঙ্গীত পরীক্ষক প্রথম বর্ষ পর্যন্ত বিদ্যার্থীদের কথা মনে রেখেই বইটি লেখা। এই বইতে বাঁয়া তবলা কী, তার বিস্তারিত পরিচয় থেকে শিক্ষার আদি মুহূর্তটি, যাকে বলে হাতেখড়ি ; তারপর ধাপে-ধাপে তাল-লয়ে ফেলে। হাত তৈরি করা, কীভাবে তবলা বাজাতে হবে ছবিসহ তার উদাহরণ ইত্যাদি সবই চমৎকারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই কারও সাহায্য না নিয়ে স্বচ্ছন্দেই এই বইটি পড়ে নিজে-নিজে প্রাথমিক স্তরটা তৈরি করা যাবে বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে। বইটির এটাই বড় গুণ, সেদিক থেকে শিক্ষানবিশদের বইটি অপরিহার্য। এ ছাড়া শিক্ষকদের উপকারে তো লাগবেই।

শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

রূপে নয়, গুণে ভারী হতে হবে

আকাশ ভরা সূর্য তারা
মনোজ দত্ত
জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ কলকাতা
১২ টাকা

বাংলা ভাষায় কোনও বই প্রকাশ করার সময় যদি সংশ্লিষ্ট বইয়ের লেখক-লেখিকা মনে রাখেন আমাদের এই ভাষা বড়ই সমৃদ্ধ, এই ভাষায় কম ভাল বই প্রকাশিত হয়নি, তা হলে অপাঠ্য বইয়ে বাজার ভরে যায় না। কথাগুলি বলতে হল 'আকাশভরা সূর্য তারা' বইটি আগাগোড়া পড়ার পর। যত্রতত্র বিজ্ঞানের টুকিটাকি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা থাকলেও বইটি যে আসলে কী হয়েছে বোঝা গেল না। 'ছেলেটি একটু এগিয়ে আসিল।' কিংবা 'শ্যাম রবিকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে তার চারিদিকে খড়ি দিয়ে গণ্ডি কাটিয়া' সাধু ও চলিত ভাষার এইরকম মেলবন্ধন কিশোর কিশোরীদের বিভ্রান্ত করবে না কি ? বইটির ছাপা ভাল।

হিমাংশু জানা

পিওর নিউ উল। আহা কি আরাম।

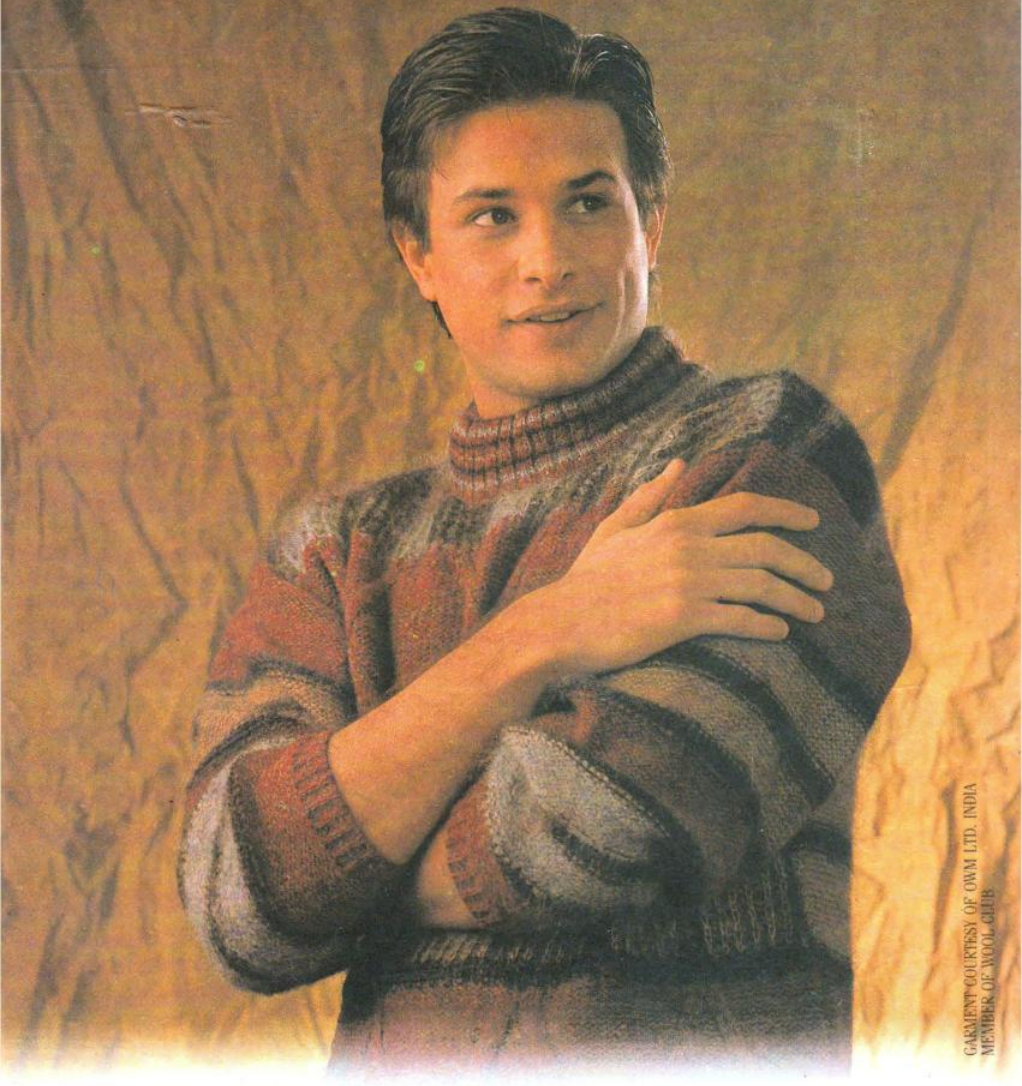

GARMENT COURTESY OF OWM LTD. INDIA
MEMBER OF WOOL CLUB

পিওর নিউ উল-এর তৈরী বস্ত্র বা পোশাকের জুড়ি হয় না। এতে স্বাভাবিক ভাবে হাওয়ার আদান-প্রদান হয় – তাতে গায়ে ঘাম বসে না বা লেপ্‌টে থাকে না – কুঁচকিয়ে যায় না, ভাঁজের দাগ পড়ে না। শীতকালে আরামে রাখে, গ্রীষ্ম কালে স্নিগ্ধ। যে ভাবেই পরবেন ঠিক সেই ভাবেই থাকবে। এবং সবথেকে বড় কথা পিওর নিউ উলের কদর দিন দিন বাড়তেই থাকে।

পিওর নিউ উল। পরেই দেখুন না!

Woolmark
(উলমার্ক)
PURE NEW WOOL

O&M 5540 BEN

ANANDAMELA 10 JANUARY 1990 REGD.NO.
WB/CC/264 MH BY SOUTH 683 TN MS(C) 731

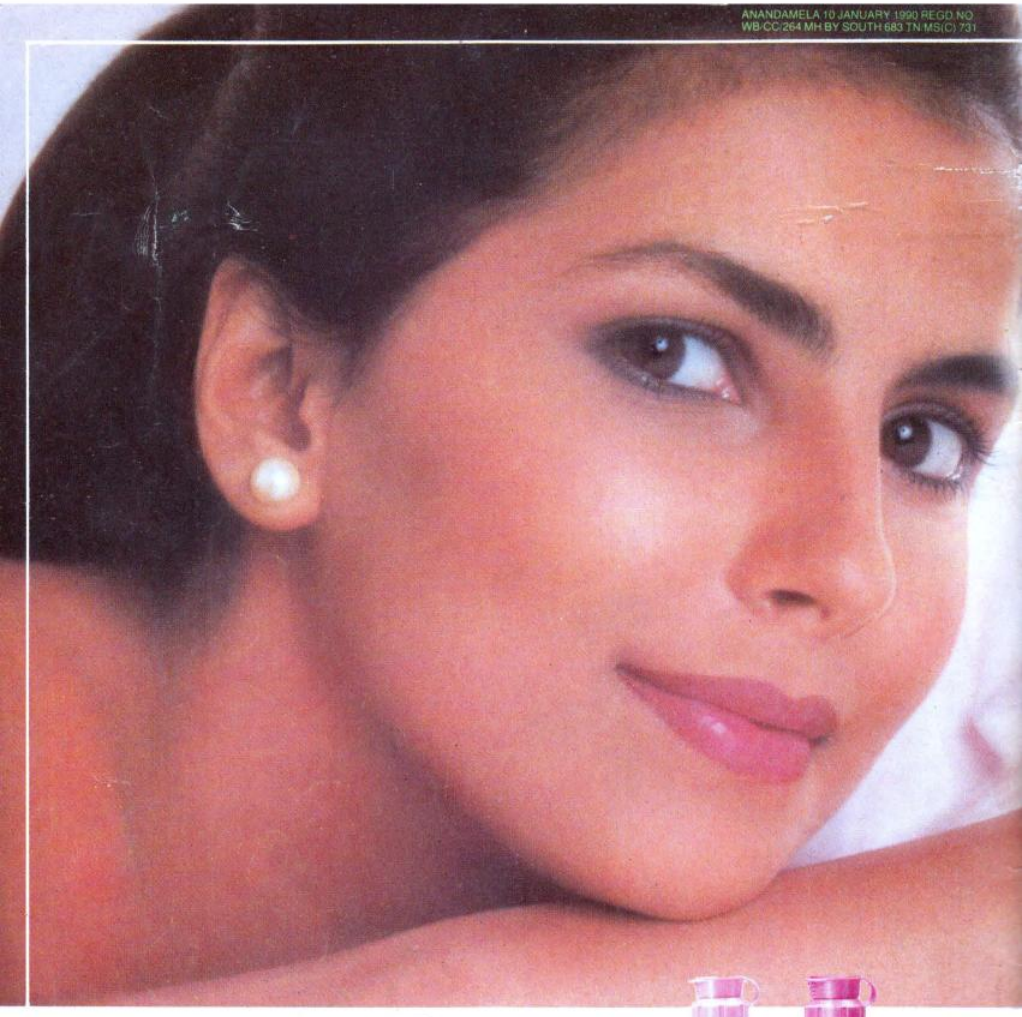

আপনার রঙরূপের বয়েস কি আপনার আসল বয়েসের চেয়েও বেশী দেখাচ্ছে?

আপনার রঙরূপের জৌলুষ কাল কেমন থাকবে, তা নির্ভর করে, আজ আপনি তার কিভাবে দেখাশোনা করছেন, তার ওপর। কারণ, বয়েস বাড়ার সাথে সাথে, ত্বকের আর্দ্রতা কমে যেতে থাকে—তাই, দরকার, জনসন্স বেবী লোশন-এর ময়েশ্চারাইজিং-এর গুণ।
এ পাবেন আপনার বেছে নেওয়ার মত দুটি ফর্মুলেশনে—লোশনটি ত্বকের গভীরে ঢুকে কাজ করে, আর এর বিশেষ ময়েশ্চারাইজিং গুণ ত্বকে পুষ্টি যোগায়—আর, আপনার ত্বক অপূর্ব কোমল ও তরতাজা ক'রে রাখে, ফলে আপনার রঙরূপেও যেন চির-বসন্তের ছোঁওয়া লাগে!

রেগুলার
শুষ্ক ত্বকের জন্যে এক বিশেষ ময়েশ্চারাইজারযুক্ত উপাদানের মিশ্রণ

লো অয়েল
তেলতেলে ত্বকের জন্যে হাল্কা, সূক্ষ্ম ফর্মুলা

জনসন্স বেবী লোশন

কারণ, নরম ও মোলায়েম ত্বক আপনার বয়স গোপন রাখে।

জনসন অ্যান্ড জনসন

OBM/4573 BEN